মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি

কাজী জাফরুল ইসলাম

মধ্যযুগের
মুসলিম শাসকেরাই
বাংলা সাহিত্যের
স্থপতি

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি

কাজী জাফরুল ইসলাম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি

কাজী জাফরুল ইসলাম

প্রকাশক

মুহাম্মদ নুর উল্লাহ

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

৯২২, জুবিলী রোড, নিয়াজ মঞ্জিল, চট্টগ্রাম।

ফোন-৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা,

ফোন-৯৫৬৯২০১।

বিক্রয় কেন্দ্র

১৫০/৫২, নিউ মার্কেট, ঢাকা, ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলা বাজার ঢাকা।

৭৯, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (১ম তলা) চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ বিভাগ

১২৫, মতিঝিল, ঢাকা, ফোন-৯৩৪৬১৫

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯৯

গ্রন্থস্বত্ব

জেবুন নাহার জাফর

কভার ডিজাইন

শাহাবুদ্দিন সরকার

মুদ্রণে

প্রিন্টার্স চেম্বার,

মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মূল্য ১৫০.০০ টাকা।

৫.০০ মার্কিন ডলার।

Maidhya yuger Muslim Shasakerai Bangla Shahityer Sthapati (Muslim Rulers of the Middle Age are the founder of Bengali Literature). By Kazi Zafarul Islam.

Published by Md. Nurullah, Director (Publications),

Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.

Chittagong, Dhaka.

Price: Tk 150.00

$ 5.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এই ভাষার জন্মের প্রশ্ন তুলে অনেকে দাবী করেন যে, বাংলা ভাষা মুসলমানের ভাষা নয়, বাংলা সাহিত্যও মুসলমানের সাহিত্য নয়। কিন্তু এই দাবীকি সঠিক?

বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যকর্ম চর্যাপদ। এর ভাষা কিন্তু সত্যিকার অর্থে বাংলা নয়। দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম বড়ু চন্ডিদাস লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।" এটিই খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় তৃতীয় গ্রন্থ "রামায়ণ।" এটি রচিত হয় বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসক গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪৯০ খৃঃ) আমলে। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস রচনা করেন 'রামায়ণ।' লেখক এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, বৌদ্ধ যুগে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা (চর্যাপদ) শুরু হলেও বাংলায় দীর্ঘস্থায়ী হিন্দুযুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় হাতও দেয়া হয়নি। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনকালে "বাংলার ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল দেব ভাষা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা ছিল শুদ্রের (নীচ) ভাষা।" ব্রাহ্মণগণ এই বলে বাংলা সাহিত্যকে অভিশপ্ত করেছিলেন যে 'যারা অষ্টাদশ পুরান ও রামায়ণ বাংলায় পড়ে তারা রৌরব নামক নরকে যাবে।' বস্তুতঃ নরকে যাবার ভয়ে হোক কিংবা অন্য কারণে হোক, হিন্দু যুগে বাংলা সাহিত্য চর্চা হয়নি।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'রামায়ণ' এর ভিত্তি বাল্মীকির 'রামায়ণ' হলেও বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা করেন বাঙ্গালী মন নিয়ে। তাই রূপে রসে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বাঙ্গালীর মহাকাব্য। পরবর্তীতে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালধর বসু (গুনরাজ খাঁ) রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য (১৪৭৩-৮০ খৃঃ)। এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম অব্রাহ্মণের রচনা।

অতঃপর হোসেন শাহী শাসনামল তথা বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগে এই বংশের শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলা ভাষায় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম অপৌরানিক বিষয়বস্তু নিয়ে বিপ্রদাস রচনা করেন "মনসা বিজয়" কাব্য। এই বংশের শাসনামলে চট্টগ্রামের পরাগলপুরের সামন্ত শাসক পরাগল খার পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস রচনা করেন পরাগলী মহাভারত এবং তাঁর পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী রচনা করেন ছুটিখানী মহাভারত।

www.pathagar.com

হোসেন শাহী বংশের শাসক গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩২-৩৮ খৃঃ) সময়ে শাহ মোহাম্মদ সগীর রচনা করেন রোমান্টিক কাব্য 'ইউসুফ- জোলেখা'। বাংলা ভাষায় মুসলমান রচিত মিশরের কাহিনী ভিত্তিক এই কাব্যে তিনি আরব পারস্যের সাহিত্য -দর্শনের প্রতিফলন ঘটান। সমসাময়িক কালে সাবরিদ খান বাংলার বিষয় নিয়ে রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। উত্তর-পশ্চিম চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক নিজাম শাহের রাজস্ব কর্মকর্তা দৌলত উজীর বাহরাম খাঁন রচনা করেন 'লায়লী- মজনু' । (আরবে কল্পিত বলে কথিত)। মধ্যযুগের সর্বাধিক প্রভাবশালী মুসলিম কবি সুফী সাধক সৈয়দ সুলতান রচনা করেন 'নবীবংশ'। আলোচ্য মুসলিম লেখকগণ বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের খোলসমুক্ত করে তাকে সংস্কৃত, বাংলা, আরব ও পারস্যের বিষয়যুক্ত সাহিত্য করে তোলেন। অতঃপর কাজী দৌলত ও আলাওল এই সাহিত্যে হিন্দীর বিষয়ও যুক্ত করেন। বস্তুতঃ মুসলিম শাসনামলেই বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফার্সী ও হিন্দী সাহিত্যের সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। এ কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ (মধ্যযুগের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি) কবি ভারত চন্দ্র তাঁর সাহিত্যে ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন অবাধে।

কাজী জাফরুল ইসলাম তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যে, মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষারূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ভীত শুধু রচিত নয়, মুসলিম লেখকদের অংশ গ্রহণে এই সাহিত্য বহুমাত্রিক সাহিত্যরূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত স্থপতি।

ভাষা ও সাহিত্য বিতর্কের অবসানে "মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি"- বইটির বহুল প্রচার কাম্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

মুনাওয়ার আহমদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো -অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

২০শে নভেম্বর '৯৯

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাবের মধ্যে দু'টি প্রধান, বাংলা (বাঙ্গালা) নাম এবং বাংলা ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ। প্রাচীন আমলে বাংলার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে মোটামুটিভাবে উত্তর বঙ্গ বরেন্দ্র, ভাগিরথীর পশ্চিম তীর রাঢ়, পূর্ব বাংলা বঙ্গ এবং মেঘনা-পূর্ব এলাকা সমতট নাম ধারণ করত। কিন্তু মুসলমান আমলে চতুর্দশ শতক থেকে সারা বাংলা একত্রীভূত এবং একক শাসনাধীনে এসে বাংলা (বাঙ্গালা) নামের উৎপত্তি হয়। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭) সর্বপ্রথম সারা বাংলার অধীশ্বর হয়ে শাহ-ই-বাঙ্গালা এবং সুলতান-ই-বাঙ্গালা উপাধি গ্রহণ করেন। ইহার পরে সুলতানী আমলে বাংলা নাম চালু থাকে, ইহাই মোগল আমলের সুবা বাংলা, ইংলেজ আমলের বেঙ্গল (বঙ্গ দেশ) এবং বর্তমানে বাংলাদেশ। অল্প কিছুদিন আগে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভা ভারতের ঐ প্রদেশের নাম পশ্চিম বঙ্গের পরিবর্তে বাংলা করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

বাংলার জনগণের ভাষা বাংলা কিন্তু এই ভাষা সাহিত্যের রূপ নিতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। বাংলার আদিরূপ চর্য্যাপদ থেকে চণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পর্যন্ত আসতে কয়েকশত বৎসর অতিবাহিত হয়, সংস্কৃতের দাপটে বাংলার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এই রুদ্ধদ্বার খুলে দেয় মুসলমানেরা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আদি গুরু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর History of the Bengali Language and Literature গ্রন্থে লিখেন, "This elevation of Bengali to a literary status was brought about by several influences, of which the Mahammadan conquest was undoubtedly one of the foremost. If the Hindu kings had continued to enjoy independence, Begali would scarcely have got an opportunity to find its way into the courts of kings." বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলেও হয়তো বাংলা ভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠতো, তবে নিঃসন্দেহে ইহা আরো অনেকদিন বিলম্বিত হতো। মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক। প্রাচীনকালে বাংলায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল ছিল এবং মুসলমানদের পূর্বে যারা এই দেশে রাজত্ব করে সেই সেন রাজাদের দরবারে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম, তারাই ছিল পণ্ডিত এবং শিক্ষিত শ্রেণী, দরবারের ভাষাও ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত দেব-ভাষা, এই ভাষায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হত। দেব-ভাষা বা দেব-গ্রন্থে শূদ্র বা জনগণের কোন অধিকার ছিলনা। সংস্কৃত ছাড়া অন্য অদেব-ভাষায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণদের কড়া নজর ছিল। এমতাবস্থায় অদেব বাংলা ভাষার উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত ভাষা তার পূর্ব মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পূর্ব মর্যাদাও লোপ পায়। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের আশঙ্কা করে নদীয়ার ব্রাহ্মণ তথা শিক্ষিত শ্রেণী নদীয়া ছেড়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরে মুসলমান শাসনের প্রতি হিন্দুদের আস্থা ফিরে আসে। ইলিয়াস শাহী আমলে হিন্দুরা সর্বপ্রথম উচ্চ রাজপদ লাভ করতে থাকে। এইরূপ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর এবং সাহিত্য সৃষ্টি শুরুও হয়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এই আমলেই রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ অবদান হল দেশী ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। মুসলমানদের মধ্যে যে কোন ভাষা শিক্ষা বা বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-

www.pathagar.com

বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে কোন হীনমন্যতা ছিল না। বাংলাদেশে এসে তারা দেশী ভাষা শিক্ষা করেন, রাজা এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় উৎসাহ দিতেন, কবিদের নানাভাবে পোষকতা করতেন। ধীরে ধীরে মুসলমানেরা নিজেরোও বাংলা কাব্য রচনা করেন।

সাংবাদিক, সুলেখক, স্নেহভাজন কাজী জাফরুল ইসলাম তাঁর "মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি" গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করেছেন। তিনি 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর তথা মধ্যযুগের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-কর্ম পর্যন্ত পর্যালোচনা করে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে বাংলার মুসলিম শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ফারসী প্রবর্তন করলেও দরবারে মহাভারত পুরাণ পাঠে উৎসাহিত করতেন এবং সাথে সাথে দেশী জনগণের মুখের ভাষা বাংলা চর্চাও উৎসাহিত করতেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে বাংলার পূর্ববর্তী শাসকদের সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ রাজা এবং রাজদরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত অথচ সাধারণ মানুষের ভাষা বাংলা। তাই রাজার কাছে প্রজার ভাষা যেমন দূর্বোধ্য, প্রজার নিকট রাজা ও রাজপুরুষদের ভাষাও ছিল দূর্বোধ্য। এই কারণে লক্ষণ সেনের পতনে জনগণের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, হিন্দু শাসনের স্থলে মুসলিম শাসন স্থাপিত হওয়ায় জনগণ ভাবে ইহা শুধু রাজা বা শাসক বদল। মুসলিম বিজয়ীরা উপলব্ধি করেন যে বিজেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে, তাদের আশা-আকাঙ্খার কথা জেনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে না। এই লক্ষ্যে বিজিতদের সঙ্গে বিজয়ীদের মেলামেশা অবাধ ও সহজ করার জন্য মুসলিম শাসকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা উৎসাহিত করতে শুরু করেন। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই অনেক কবি শাসকদের পোষকতা লাভ করেন এবং অনেক মুসলমানও কাব্য রচনা করে মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

ঊনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় হিন্দু মুসলিম কবির লিখিত অনেক কাব্যের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। হিন্দুরা যে বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন তা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়, মুসলমানদের সাহিতকর্ম সম্পর্কে যা সন্দেহ ছিল, আবদুর করিম সাহিত্য বিশারদের বিশাল পুঁথি সংগ্রহ সেই সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর করে। এখন সকলেই জানে যে হিন্দুরা মুসলমান সকলে বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদানের অপূর্ব স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বস্তুতঃ লেখক কাজী জাফরুল ইসলাম মধ্যযুগের হিন্দু মুসলমান কবিদের সাহিতকর্ম পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম শাসকদের অবদান। তিনি অত্যন্ত সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে সাবলীল ভাষায় তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করেছেন। আমার বিশ্বাস গ্রন্থখানি ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক এবং সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

২২.১১.৯৯

ডঃ আবদুল করিম

প্রাক্তন উপাচার্য,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

অভিমত

সাহিত্য জাতির অন্দর মহলের ইতিহাস। ইতিহাসের বর্হিমহলে থাকে রাজা-রাজরা, সিপাহী-শান্ত্রী, অন্দর মহলে থাকেন জনগণ। জনগণের ইতিহাসই জাতির ইতিহাস।সহকর্মী কাজী জাফরুল ইসলাম বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সাহিত্য সৃজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষে আমাদের বাঙালী জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ইতিহাস ব্যাখ্যাকালে প্রতিপন্ন বিষয় যেমন অনড় নয় তেমনই অ-বিতর্কিতও নয়। কিন্তু তাঁরা জাতির ঐতিহ্য উত্তরাধিকারের শিকড় ধরে যে টানটি দেন তাতেই জাতি এগোয়। জাফরুল ইসলাম সেই মহৎ কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। আমার মনে হয়েছে জাফর সাহেবের বইটি আমাদের জাতি-সত্তা অন্বেষণে তিমির ভেদী একটি আলোক রশ্মি। গ্রন্থটি আমাদের ভাবায়।

মোহাম্মদ খালেদ
সম্পাদক,
দৈনিক আজাদী,
চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছরের বেশী নয়। সন্ধ্যা ভাষায় যে সাহিত্যের সূচনা সেই সাহিত্য আজ একটি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত সাহিত্য। আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ তথা সংস্কৃত ছিল যে সাহিত্যের ভিত সে সাহিত্য আজ সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী, হিন্দি এবং ইউরোপীয় ভাষা, ভাব ও বিষয়বস্তুর সংমিশ্রিত বহুজাতিক সাহিত্য। বহুভাষার শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ ভাষা ও ভাবসম্পদে আজকের বাংলা সাহিত্য একটি জীবন্ত সাহিত্য।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট প্রাকৃতই বাংলা ভাষার জননী এবং তাই প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট বাংলা সাহিত্য ছিল স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতজ সাহিত্য।

বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। এই সাহিত্যের প্রাচীনতম এবং একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। এর ভাষা সন্ধ্যা ভাষা। অর্ধেক বোঝা যায় অর্ধেক বোঝা যায় না। সত্যিকারভাবে বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। (১৪৫০ থেকে ১৫২০ সালের মধ্যে অনুলিখিত)। এই কাব্যের ভাষা বোধগম্য বাংলা ভাষা। এই কাব্যের বুনিয়াদ সংস্কৃত হলেও এতে শ্রীকৃষ্ণের যে বিশেষ কাহিনী স্থান লাভ করেছে তা ভাগবতে পুরাণে নেই এবং তা হচ্ছে বাঙালী কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ' হচ্ছে বাঙালীর প্রথম জাতীয় কাব্য। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় রচিত এই তৃতীয় গ্রন্থটি কৃত্তিবাস রচনা করেছেন বাঙালীর মন নিয়ে। বাল্মীকির মহাকাব্য এর ভিত্তি হলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভারতীয় মহাকাব্য নয়, রূপে রসে বাঙালীর কাব্য। রাম, সীতা, লক্ষণ, দশরথ কিংবা রাবন, মন্দোদরী, বিভীষণ এর চরিত্রগুলো কৃত্তিবাসের হাতে পরিণত হয়েছে বাঙালীর ঘরোয়া আদর্শের চরিত্রে। রাম বীর হলেও বাঙালী বীর, স্নেহে, মমতায়, কোমলতায় সজল। তিনি বাঙালী ঘরের আদর্শপুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী। তেমনি সীতা, লক্ষণ, দশরথ, কৈকেয়ী থেকে মন্থরা, শুর্পনখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ বাঙালী আদর্শের প্রলেপে পুনর্গঠিত।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, পরাগলী মহাভারত, ছুটিখানী মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে চন্ডীদাশ, কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু (গুনারাজ খাঁ), কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্য অনুসরণে কাব্য রচনা করলেও তাতে Matter of Bengal বা বাংলার বিষয় সংযুক্ত করতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এই সময় বহিরাগত যুদ্ধ বিজয়ী শাসক শ্রেণী নিজেরা এবং তাঁদের সাথে আগত ফার্সী ভাষীরা এই উপমহাদেশের ভাষা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভে উৎসুক হন। তাই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ইসলামী তাত্ত্বিক কাজী রুকন উদ্দিন সমরকন্দী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু যোগ শাস্ত্র 'অমৃতকুন্ড' প্রথমে ফার্সী এবং পরে আরবীতে অনুবাদ করেন। অতঃপর মুসলিম লেখকেরা এগিয়ে আসেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায়। বাঙালীদের, বিশেষ করে পুরুষানুক্রমে বাংলায় বসবাসকারী বাংলা ভাষী

www.pathagar.com

জনগণকে আরব পারস্যের সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৫৩২ থেকে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পারস্য কবি ফেরদৌসী, জামী, আনসারী প্রমুখ বর্ণিত নবী ইউসুফ-জোলেখার প্রেম সম্পর্কিত একটি মিশরীয় কাহিনী ভিত্তিতে রচনা করেন 'ইউসুফ-জোলেখা-প্রণয়োপাখ্যান'। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য। আলোচ্য সময়ে বাংলার স্থানীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্য প্রবহমান ছিল। তাই মুসলিম লেখক শাহ মোহাম্মদ সগীর বাংগালী পাঠকের মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে বাংলা সংস্কৃতির আদলেই বাংলার বারো মাসের অনুসরণে জোলেখার বারমাসী লিখেন। এই কাব্যের বিধুপ্রভা বাঙালী মেয়ে, চৌদুল মিশরের নয় বাংলার এবং পান চিবানো বাংলারই ঐতিহ্য। অর্থাৎ এই কাব্যে তিনি মিশরীয় কাহিনীকে বাংলার চাঁচে ঢেলে পরিবেশন করে Matter of Bengal বা বাংলার বিষয় যোগ করে বাংলারই কাব্য করে তোলেন। শাহ মোহাম্মদ সগীরের আগে কিংবা সমসাময়িককালে অথবা স্বল্পকাল পরে সাবরিদ খান রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য বাংলারই একটি প্রণয়োপাখ্যান। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তিনি দ্বিতীয় এবং প্রথম মুসলিম কবি। (প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর)। সাববিদ খাঁন Matter of Bengal বা বাংলার বিষয়কে ভিত্তি করেই এই কাব্য রচনা করেন অর্থাৎ মুসলিম লেখকের হাতে Matter of Bengal সাহিত্যের বিষয় হয়। তাই ভারতচন্দ্রের পূর্বেকার বিদ্যাসুন্দরের কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সারবিদ খান বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন। উল্লেখ্য যে, সারবিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী প্রায় অভিন্ন।

দৌলত উজীর বাহরাম খানের লায়লী-মজনু একটি প্রণয় কাহিনী। আরবে কল্পিত হলেও কোন আরব দেশে এই কিংবদন্তী চালু নেই। এছাড়া আরবে কল্পিত দেখালেও কবি এই কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ পরিহার করে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন সচেতনতার সাথে এবং আরবের পাহাড় 'নজদ' এর নাম করলেও সে পাহাড়ের যে সব ফলের নাম উল্লেখ করেছেন সে সব আরবের নয়, বাংলার ফল। লায়লীর পিতৃগৃহের বাগানের ফুলের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে সব ফুলের নাম করেছেন তাও বাংলারই ফুল। আরবের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশেরই রূপ বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ দৌলত উজীর বাহরাম খানের লায়লী মজনুর ভিত্তি Matter of Bengal, নায়ক-নায়িকার নাম ভিনদেশী হলেও।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান। তিনি ছিলেন একজন পীর। কিন্তু তিনি রামায়ণ, মহাভারত, বেদপুরাণ আত্মস্থ করে তার ভিত্তিতে নবী বংশ রচনা করেন। অমুসলমানদের ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে, কোরান কিতাব সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা এবং জ্ঞানদান করার লক্ষ্যেই তিনি হরিবংশ পুরাণ অনুসরণ করে নবী বংশ লিখেন। তাই তাঁর কাব্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং কৃষ্ণও নবী। বৈষ্ণব পদাবলীর লেখক সৈয়দ সুলতান ছিলেন সুফী সাধক এবং পদাবলী গায়কও। তিনি তাঁর কাব্যে আদমের স্বর্গ অংশে স্বর্গের যে দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তা বাংলাদেশরই বসন্ত কালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা। বস্তুতঃ সৈয়দ সুলতানের লেখাতেই প্রথম Matter of Sanskrit, Matter of Arab, Matter of Persia এবং Matter of Bengal এর সুমন্বয় ঘটে। পীর ও সুফি সাধক এবং পদাবলী গায়ক

www.pathagar.com

সৈয়দ সুলতানের সাহিত্য কর্মই হিন্দু মুসলমান সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খান ও অন্যান্যরা বাংলা সাহিত্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনকালে 'বাংলার ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল দেবভাষা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা ছিল শুদ্রের (নীচ) ভাষা। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্মীয় বই লেখা নিষিদ্ধ ছিল এবং শুদ্রদের ধর্মীয় বই ছুঁতেও দেয়া হত না।' এছাড়া ব্রাহ্মণরা বাংলা সাহিত্যকে এই বলে অভিশপ্ত করতেন যে, 'যারা অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে তারা রৌরব নামক নরকে যাবে।' এ কারণে চর্যাপদের পর সুদীর্ঘ কাল, হিন্দুরাজত্বের সময়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা হয়নি। মুসলিম শাসনামলেই বাংলায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। (খাঁটি বাংলা ভাষায় চন্ডীদাশ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচনাকালে বাংলায় [গৌড়ে] ছিল মুসলিম শাসন)। হোসেন শাহের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরোক্ষ সাহায্যে এবং শ্রী চৈতন্যের দুঃসাহসী উৎসাহে অব্রাহ্মণেরাও বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন, এগিয়ে আসেন মুসলমান লেখকেরাও। তাই ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যেই অসংখ্য হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁদের হাতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এবং Matter of Arab ও Matter of Persia এর সাথে হিন্দু লেখকদেরও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যের সপ্তদশ শতাব্দীর দুজন শ্রেষ্ঠ কবিই হচ্ছেন মুসলমান। তাঁরা হলেন কাজী দৌলত ও আলাওল। তাঁদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র কিন্তু বাংলাদেশ ছিল না, ছিল আরাকান। সুলতানী আমলে শাসেকরা, এমনকি স্থানীয় সামন্ত শাসকেরাও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সুলতানী শাসনের পতনের যুগে বহুসংখ্যক আমীর ওমরাহ, সুফী সাধক ভাটি অঞ্চলে, সিলেট ও চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পরে সিলেট-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু মুসলমান আরাকানে গিয়ে রাজ অমাত্যের স্থান দখল করেন। বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর যাঁরা মোগল শাসক হিসেবে বাংলায় আসতেন তাঁরা সময় শেষে ফিরে যেতেন, বসতি স্থাপন করতেন না। তাই বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এমন কি নজরও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সময় বহুসংখ্যক সাহিত্যিক নিজস্ব উদ্যোগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। চট্টগ্রাম-সিলেটের যে সব ব্যক্তি রোসাঙ্গ রাজ অমাত্য হয়েছিলেন তাঁদের উৎসাহে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র। সেখানেই কাজী দৌলত ও আলাওলের উদ্ভব ঘটে। এই দুই কবি বাংলা সাহিত্যে Matter of Sanskrit, Matter of Bengal, Matter of Arabia, Matter of Persia, Matter of Hind সুসঙ্গত ভাবে যুক্ত করেন। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে এই পাঁচের সমন্বিত সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত এই দুই কবির প্রভাবে এই পাঁচের মহামিলন অব্যাহত থাকে। আলোচ্য মুসলিম সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যে আরবী, ফার্সী, হিন্দি শব্দ ব্যবহারের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র সাহসিকতার সাথে ওই ভাষার শব্দ ও সম্পদ গ্রহণ করেছেন দু'হাতে।

ভারতচন্দ্রে এসে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এর সমাপ্তি ঘটে। অতঃপর শুরু হয় বাংলায় ইউরোপীয় শাসন। সূচনা হয় আধুনিক যুগের। তাই একথা সঙ্গতভাবে বলা যায় যে,

www.pathagar.com

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্য চর্চার দ্বার সকলের জন্যেই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং মুসলিম লেখকরা বাংলা সাহিত্যে Matter of Sanskrit ও Matter of Bengal এর সাথে Matter of Arab, Matter of Persia ও Matter of Hind সুসঙ্গতভাবে যুক্ত করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে বহুজাতিক সাহিত্য করে তুলেছিলেন। ফলে মধ্যযুগেই বাংলা সাহিত্য হয়ে গিয়েছিল একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য। বস্তুত আলোচ্য তথ্যাদি এই সত্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে যে মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও লেখকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি।

পক্ষান্তরে, আধুনিক যুগে এসে ইউরোপীয় তথা বিদেশী ও ভিন্নধর্মী শাসনের প্রতি ঘৃণা ও বৈরিতার কারণে কিছু সংখ্যক অদূরদর্শী মুসলিম নেতার প্রেরণায় মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে। হিন্দুরা সময়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে যায়। ফলে মুসলমানেরা রাজকাজে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হয়ে বিদেশাগত শাসক ইংরেজ নয়, হিন্দুরাই শত্রু, এরূপ অযৌক্তিক মনোভাব গ্রহণ করে নিজেদেরকে আলাদাজাত, বাঙালী নয়, মুসলমানরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে অপ্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দে কন্টকটিত করে ইসলামী সাহিত্যের নামে এক দুর্বোধ্য বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়। কিন্তু উদারমনা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারমুক্ত মুসলিম সাহিত্যকেরা বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী সাহিত্য রচনা অব্যাহত রাখেন। কিছু সংখ্যক অদূরদর্শী ব্যক্তির বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিতৃষ্ণা এবং প্রত্যক্ষ বাধা স্বত্বেও বাংলার ভুমিপত্র হিন্দু-মুসলমানের যুগল প্রচেষ্টায় আজকের আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটি যুগোপযোগী সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য, সচল ও জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্য। তবে এই সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনকারী মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও লেখকেরা, একথা স্বীকার্য। তাই ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো তাঁর বাংলার ইতিহাস-এর (সুলতানী আমল) ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন"..... মুসলিম অধিকারের পূর্বে দেশ হিসাবে বাংলাদেশ, জাতি হিসাবে বাঙালী এবং ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। সুলতানী আমলের শেষ পর্যায়ে এক দেশ একজাতি এবং একভাষা নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হইয়া যায়। ..... সুলতানী আমলেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি এবং দ্রুতগতিতে বিবর্তিত হইয়া আধুনিক ভাষার রূপ লাভ করে। ......"

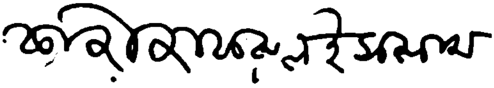

কাজী জাফরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম

৩০/১১/৯৯

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলনে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আত্মাহুতিদানকারী বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক, শফিক

এবং

বৃটিশ আসার আগে স্বাধীন হিড়ম্ব রাজ্য নামে পরিচিত যে রাজ্যের রাজভাষা ছিল বাংলা এবং যা আজকের ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জের বরাক উপত্যকা এবং যেখানে বাংলা ভাষার জন্যে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে আত্মাহুতি দানকারী কমল ভট্টাচার্য, হীতেশ বিশ্বাস, তরুণী দেবনাথ, শচীন্দ্র সূত্র ধর, সত্যেন্দ্র দেব সহ ১১ তরুণ ও একই দাবীতে ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই আত্মাহুতি দানকারী জ্ঞান ও যিশুর

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে,

ভাষা বিতর্কের চির অবসানের লক্ষ্যে রচিত 'মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি' বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করায় বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির চেয়ারম্যান মুনাওয়ার আহমদ, পরিচালক, প্রকাশনা মুহাম্মদ নূর উল্লাহ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে,

বইটি মুদ্রণের ব্যাপারে সহৃদয় সহযোগিতার জন্যে সাপ্তাহিক চট্টলার প্রধান সম্পাদক আবু সুফিয়ান, সম্পাদক জি. এম. শাহাবুদ্দিন ও কম্পিউটার বিভাগের আলী আসগর খান, দৈনিক আজাদীর প্রচার বিভাগের প্রধান মইনুল আলম বাদল ও কম্পিউটার বিভাগের মোঃ রকিবুল হক, শৈলী প্রকাশনের রাশেদ রউফ, যারা সকলেই আমার অনুজ প্রতীম বন্ধু তাই

কৃতজ্ঞতা নয়, ঋণ স্বীকার করে,

সেই তরুণ বয়স থেকেই যিনি আমার লেখালেখিতে উৎসাহ দিয়েছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, দৈনিক আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক, দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম. এ. মালেককে

গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আবদুল করিম অত্যন্ত কষ্টস্বীকার করে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত পাঠপূর্বক সহৃদয়তার সাথে 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করায় তাঁর প্রতি

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে

আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা কাজী কোববাদ আহমদ ও মরহুমা মাতা রহিজা বেগম চৌধুরীর রুহের

মাগফেরাত কামনায় উৎসর্গীত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ও বিভাগের ধারা ১১

২। দ্বিতীয় অধ্যায়

মসুলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় সূচনা ১২

৩। তৃতীয় অধ্যায়

হোসেন শাহী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ব্যাপক প্রসার, পরাগলপুরে, কাব্য রচনা। ৪৩

৪। চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্য সাহিত্য বিকাশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হোসেন শাহ। ৬৯

৫। পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মসুলিম কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর ও তাঁর কাব্য ইউসুফ - জোলেখা। ৭৭

৬। ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যা সুন্দর কাব্য রচনার প্রথম মসলিম কবি সাবরিদ খান। ৮৬

৭। সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের সর্বাধিক প্রভাব শালী কবি ছিলেন পরাগলপুরের সৈয়দ সুলতান। ৯১

৮। অষ্ঠম অধ্যায়

মধ্যযুগের আর এক প্রতিভা মোহাম্মদ খান ও তাঁর কাব্য। ১০৪

৯। নবম অধ্যায়

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় প্রণয় কাহিনী বাহরাম খানের লায়লী-মজনু। ১১৮

১০। দশম অধ্যায়

সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ও তাঁদের কাব্য। ১৩২

১১। একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অন্যান কবি ও তাঁদের কাব্য। ১৪০

www.pathagar.com

১২। দ্বাদশ অধ্যায়
আরাকানের রাজ সভায়ই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ঠি লাভ করে। ১৫৯

১৩। ত্রয়োদশ অধ্যায়
বাংলা ভাষায় সংস্কৃতজ মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ। ১৮০

১৪। চতুর্দশ অধ্যায়
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, মনসা, চন্ডী, ধর্ম, রায়, গাজী ও অন্যান্য মঙ্গল। ২০০

১৫। পঞ্চদশ অধ্যায়
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পীরগাঁথা ও সত্যনারায়ণ পাঁচালী। ২৩৭

১৬। ষষ্ঠদশ অধ্যায়
মধ্যযুগের অন্যান্য কাবি ও তাঁদের কাব্য। ২৫২

১৭। সপ্তদশ অধ্যায়
মধ্যযুগে ত্রিপুরায় রাজ সভায় সাহিত্য চর্চা, রাজ মালা, চম্পক বিজয় ও কৃষ্ণ মালা কাব্য। ২৬৩

১৮। অষ্ঠাদশ অধ্যায়
বিদ্যাপতি, কুৎবন, রামাইপণ্ডিত এবং তাঁদের সাহিত্য কর্ম। ২৭৮

১৯। উনবিংশ অধ্যায়
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভীত মধ্যযুগের সাহিত্য কর্ম। ২৮৯

২০। বিংশ অধ্যায়
মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সাহিত্য আজ বাঙলার ভূমি পুত্র, হিন্দু মুসলমানের সাহিত্য। ২৯১

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশের ধারা

মুখের বুলি বিচারে আজকের বিশ্বের অষ্টম ভাষা বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশের সংবিধানের তিন নম্বর ধারায় বাংলা'কে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে এখন বাংলাভাষা জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত প্রজাতন্ত্রের একটি রাজ্যে (প্রদেশে), পশ্চিম বঙ্গে বাংলাভাষা এখন সরকারী ভাষা, সরকারের দাপ্তরিক কাজ ৩১ শে মার্চ, '৯৬ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে বাংলায়।

কলকাতা হাইকোর্টে বাংলা ভাষা চালু করার দাবীতে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় বিরোধীদল কংগ্রেস আনীত একটি প্রস্তাব সম্প্রতি (১৯৯৮) ক্ষমতাসীন সিপিআইএমসহ সকল দলের সমর্থনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। ভারতের কয়েকটি রাজ্যের হাইকোর্টে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দি ইতোপূর্বে চালু হয়েছে বিধায় কলকাতা হাইকোর্টেও বাংলা ভাষা চালু এখন নিশ্চিত।

একদা যে ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হতো বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড, পশ্চিম বঙ্গ ও 'ত্রিপুরারাজ্য ছাড়াও নেপালের রাজসভা, বিশেষ করে কাঠমন্ডু, ভাতগাঁও ও পাটন রাজ্যে, কামরূপ-কামতা ও কোচবিহারের রাজসভায়, মনিপুর রাজ্যে, আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজদরবারে এবং যে ভাষাটি 'ইংরেজ শাসনামলেও রাষ্ট্রভাষা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের (১-পৃষ্ঠা-১৪২ থেকে ১৪৯), সেই বাংলা ভাষাই আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিম বঙ্গের দাপ্তরিক ভাষা।

বাংলা ভাষা শুধুমাত্র বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ এবং ত্রিপুরার আপামর জনগণের মুখের ভাষা নয়, দার্জিলিং, শিলং, কাছাড় এর জনগণও এই ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য চর্চা করে। এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জের বারাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালের ১৯শে মে বাংলা ভাষার জন্যে আন্দোলন হয়, যাতে গুলীতে প্রাণ দেয় কমলা ভট্টাচার্য্য, হীতেশ বিশ্বাস, তরুনী দেবনাথ, শচীন্দ্র সূত্রধর, সত্যেন্দ্র কুমার দেবসহ ১১ জন। একই দাবীতে সৃষ্ট আন্দোলনে ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই প্রাণ দেয় জ্ঞান ও যিশু নামে দুই তরুণ। উল্লেখ্য যে, বৃটিশ আসার আগে করিমগঞ্জের নাম ছিল হিড়ম্ব এবং ঐ রাজ্যের রাজভাষা ছিল বাংলা। এসব স্থান ছাড়াও যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে বাংলায় সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

বাংলা আজকের যুগের একটি সপ্রাণ, সজীব, সচল, সমৃদ্ধ, সম্পদশালী ও শক্তিশালী ভাষা, প্রাণবন্ত ও জীবন্ত ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যও প্রাণবন্ত, সচল ও জীবন্ত সাহিত্য। বিশ্বের যে কোন ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ ও আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়। সাহিত্য সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী হয় অন্য সাহিত্যের উপকরণ ও সম্পদ আহরণ ও আত্মীকরণের মাধ্যমে। বাংলা ভাষাও সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, পর্তুগীজ, ফ্রেন্স, ইংরেজী, ডয়েস (জার্মান) প্রভৃতি সুপ্রাচীন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ ও আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এসব ভাষার সাহিত্যোপকরণ, দর্শনতত্ত্ব প্রভৃতি আহরণ ও নিজদেহে আত্মীকরণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যও প্রাণবন্ত, সচল, জীবন্ত ও সমৃদ্ধ সাহিত্য রূপে বিশ্ব সাহিত্যাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। বস্তুতঃ বাংলা ভাষা আজকের বিশ্বের একটি প্রাণবন্ত ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য একটি জীবন্ত সাহিত্য। আজকের বাংলা ভাষা যেমন সমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যও সম্পদশালী।

কিন্তু একথা আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে আজকের পর্যায়ে পৌছুতে বহু চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে, বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে এবং এই ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে রক্তও দিতে হয়েছে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষ শুধু এই ভাষায় কথা বলে না, এই ভাষায় সাহিত্য চর্চাও করে, এই ভাষাই তাদের সংস্কৃতির বাহন। ত্রিপুরার কিছু মানুষ বোদো ভাষায় কথা বললেও অতীতের মতো সেখানেও আজো বাংলায় সাহিত্য চর্চা হয়, সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। শিলং, দার্জিলিং, কাছাড়ের কিছু মানুষ অহমিয়া ভাষায় কথা বললেও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, শিলং, দার্জিলিং, কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টানের মুখের ভাষা বাংলা। বস্তুতঃ বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাহিত্য হয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু একথাও আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয় এবং মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা সাহিত্য স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে আজ একথা দাবী করা সঙ্গত যে, আজকের বাংলা ভাষা মুসলমানী পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ ভাষা। সুতরাং এই ভাষা মুসলমানেরই ভাষা। জন্ম যেথা থেকেই হোক না কেন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে এই অঞ্চলকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণকারী তুর্কী, মোগল, পাঠান এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে বাংলার ভূমি পুত্র হিসেবে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করে এই ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বে

www.pathagar.com

মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে বিধায় এই ভাষা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের ভূমিপুত্র হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ও খৃষ্টানের তথা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ভাষা।

বাংলা কিভাবে মুসলমানের ভাষা হল তা বুঝতে হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনা করা অপরিহার্য। অন্যদিকে জন্মগতভাবে প্রাণসমৃদ্ধ ও সচল ভাষাকে দুর্বোধ্য শব্দ সম্ভারে কন্টকিত করে দুর্বোধ্য, অচল ও নিস্প্রাণ করে তোলার যে ষড়যন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল তা এখনো রয়েছে সূক্ষ্মভাবে অব্যাহত। জন্ম ও ক্রমাগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করা না গেলে, ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা না গেলে এই ভাষা ও সাহিত্যের অবাধ গতি ও সচল ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবার আশংকাও অমূলক নয়।

'সংস্কৃত, ইংরেজী, ফারসী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা তেমন প্রাচীন নয়। এখন হইতে এক সহস্রাধিক বৎসরকাল পূর্বে মগধে প্রচলিত পূর্বী প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ হইতে ইহার উদ্ভব। খৃষ্টীয় ৯৫০ সালের দিকে ইহা বিশিষ্টরূপ ধারণ করে। ইহার প্রায় পাঁচশত বৎসর পর হইতে এই নবজাত বঙ্গ ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার যথারীতি আরম্ভ হয়। (২ পৃষ্ঠা-২)।

'আদি ইন্দোইউরোপীয় ভাষার পূর্বতম শাখা ইন্দো-ইরানীয় ভাষা সম্প্রদায় থেকে আধুনিক বাংলা ভাষার উদ্ভব। সংস্কৃত ভাষাজাত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার একটি বিশেষ উপশাখা বাংলার জননী'....... বস্তুত 'বাংলা মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে উদ্ভূত।' (৩ পৃষ্ঠা ১ ও ৩)।

প্রাকৃত ভাষার উপশাখা 'বাংলা দশম শতাব্দীর আগেই নির্গত হয়েছিল।.......বাংলাভাষা বিকাশের ক্রমে যে স্তর গুলির মধ্যদিয়ে চলে এসেছে তা আদ্য ও মধ্য এই দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। বর্তমান কাল আধুনিক পর্ব। আনুমানিক ৯৫০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়কে আদ্য পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। আনুমানিক ১৩৫০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত মধ্যপর্ব (তবে মধ্য পর্বে আবার দুটি অনুপর্ব, ১৩৫০ থেকে ১৫৫০ পর্যন্ত আদিমধ্য ও ১৫৫০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত অন্ত্যমধ্যপর্ব, লক্ষ্য করা যায়)। ১৭৫০ সাল হতে আধুনিক পর্বের শুরু। (৩ পৃষ্ঠা-৪)।

'নবম শতাব্দীতে পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর বাংলা, আসাম, সংলগ্ন উড়িষ্যা, পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তর বিহারের কিয়দংশ মিলে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সত্তারূপে চিহ্নিত হল। এইই হল বাংলাদেশের প্রথম প্রায় স্বতন্ত্র রূপ।' (৩ পৃষ্ঠা-১৩)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে, পাল সাম্রাজ্য, সেনবংশ এবং এমনকি মোগল সম্রাট আকবরের সময়েও সমগ্র বাংলাভাষাভাষী ভূখন্ড এক রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। অতীতে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল ছিল গৌঢ়, পুণ্ড্র, রাঢ়, সূম্ম প্রভৃতি বহুসংখ্যক সামন্তরাজ্যে বিভক্ত। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চট্টগ্রাম বিজয়ের পরই সমগ্র বাংলা

ভাষাভাষী অঞ্চল একরাজ্যের সীমানায় আবদ্ধ হয়, এক পতাকার তলে মাথানত করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত বৌদ্ধ গান ও দোহাই (চর্যাপদ) প্রাচীণ যুগ বা আদ্যপর্বের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নমুনা। 'বাংলাদেশে লৌকিক কবিতার উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন যোগী ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্যেরা, যাঁরা এদেশে সর্ব প্রথম নব্য ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বাংলা ভাষায় গান রচনা করেছিলেন। (৩ পৃষ্ঠা-১৩)।

চর্যা-গীতি লুই, সরহ, কাহ্ন, জয় নন্দী, তাড়ক, কঙ্কন, আজদেব, ভূসুকু ইত্যাদি প্রায় বিশজন সিদ্ধাচার্য কবির রচিত।...........ভাষা দুর্বোধ্য, কেননা প্রাকৃত হইতে সদ্যোজাত।.....ভুসুকুর রচনার নমুনাঃ-

বাজ-নাব পাড়ী পঁউআ-খালে বাহিউ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চন্ডাল লেলী।
দহিঅ পঞ্চ পাটন ইন্দি-বিষয়া ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা।
সোণ রূঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
ণিঅ পরিবারে মহাসুহে বুড়িউ।
চউকোড়ি ভন্ডার মোর লই আশেষ
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।।

আধুনিক কালের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এই রকম হইবেঃ-

বাজ-নাও পাড়ি (দিয়া) পদ্মা-খালে বাহিল,
র্নিদয় ডাঙ্গালিয়া দেশ লুটিল।
আজ ভুসুকু (তুই) বাঙ্গালী হইলি
[তোর] নিজ-গৃহিণীকে চাঁড়ালে লইল।
দহিল পাঁচ পাটন, ইন্দ্রের বিষয় নষ্ট (হইল)
না জানি চিত্ত মোর কোথায় গিয়া প্রবিষ্ঠ (হইয়াছে)।
সোনা রূপা মোর কিছুই থাকিল না
নিজ পরিবারে (আমি) মহাসুখে ডুবিলাম।
চারিকোটি (মূল্যের) ভাঁড়ার মোর লইল অশেষ
জীবনে মরণে নাই প্রার্থক্য।

বাহ্য অর্থে বিষয় হইতেছে দেশে জলদস্যুর হানায় কবি সর্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে নিঃস্বতার নিশ্চিন্ততায় নিমগ্ন হইয়াছেন।
(৩ক পৃষ্ঠা-৪৩৫)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে বৌদ্ধগান ও দোহা (চর্যাপদ) উদ্ধার করেন। সম্পাদনাকালে তিনি বলেছেন, বৌদ্ধ গান ও দোহার (চর্যাপদ) ভাষা 'সন্ধ্যা ভাষা, সন্ধ্যা ভাষা মানে আলো আঁধারী ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যেমন-

www.pathagar.com

ভবনদী গহন গম্ভীর বেসেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহা।।
ধর্মার্থে চাটিল সাঙ্কম গটর্থ।
পারগামী লোঅ নিভর তারই।।
ফাডিডঅ মোহতরা পটি জেড়িঅ।
সাঙ্গমত চড়িলে দহিন বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহা।
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব গরগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অন্তর সামী।

অর্থ-ভবনদী গভীর ও তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উভয় তীর পিচ্ছিল ও মধ্যস্থলে থই পাওয়া যায় না। ধর্মার্থে-চাটেল, তদুপরি সেতুগঠন করিলেন। পারগামী লোকেরা নির্ভয়ে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতেছে। মোহতরু ফাড়িয়া উহার পাটা (তক্তা) সংযুক্ত করিয়া অদ্বৈতের কুঠারের আঘাতে উহাকে দৃঢ় করা হইয়াছে। এই সেতুতে চড়িয়া দক্ষিণে বা বামে হেলিও না, বোধি (পরম জ্ঞান) নিকটেই রহিয়াছে। দূরে যাইতে হইবে না। হে মানব, যদি তুমি পদগামী হইতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে অনুত্তর স্বামী চাটিলের শরণ লও।' (২ পৃষ্ঠা-১২-১৩)।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের-দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের একমাত্র বাংলা সাহিত্যকর্ম-বৌদ্ধ গান ও দোহা (চর্যাপদ)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত (কিন্তু) বড়ু চন্ডিদাস লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। বিশেষজ্ঞদের মতে (এটি) ১৪৫০ থেকে ১৫২০ সালের মধ্যে অনুলিখিত হয়। (৪ পৃষ্ঠা-৪)।
শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনে বলা হয়েছেঃ-

কে না বাঁশী বাড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বা এ গোট গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর ব্যাকুল মন।
বাঁশীর শব্দে মো আউ নাইলোঁ বান্দন।।'

মদন মোহনের মধুর বেনুরবে তাঁহার (রাধার) সমগ্র দেহ মন ব্যাকুল হয়, তাহার গৃহকর্ম বিশৃংখল হইয়া যায়।'
অভিসার খন্ডে চন্ডিদাস লিখেছেনঃ-

নব অনুরাগিণী রাধা।
নাহি কিছু মানত বাধা।।
একলি কএল পরাণ।
পথ বিপথ নাহি মান।।
যামিনী ঘন আঁধিয়ার।

যার অর্থ নব অনুরাগিণী রাধা কোন বাধাই মানবেনা, সে একাকী প্রস্থান করিল, পথ বিপথ মানিল না, রজনী ঘোর অন্ধকার। (২ পৃষ্ঠা-৩২)।
চন্ডীদাস লিখেছেন,

www.pathagar.com

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে।।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।।
(৯ পৃষ্ঠা-২৩৭/২৩৮) প্রথম খন্ড

চন্ডীদাস আরো লিখেছেন,

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ;
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান।।
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন-পূজন।
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়।।
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ।।
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চন্ডীদাস, পাপ পূণ্য মম তোমার চরণ মানি।।
(৯ পৃষ্ঠা-২২৮)।

লক্ষ্যণীয় যে, বাংলা ভাষায় রচিত এই দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাষা অনেক সহজ হয়ে এসেছে। এই গ্রন্থে (পুথি) ভাষা আর সন্ধ্যা ভাষা বা আলো আঁধারি ভাষা নয়। এটি পাঠক'শ্রোতার কাছে সহজবোধ্য ভাষা। যেমনঃ-

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্ব তলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।।
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে।।
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সেই চাঁদ বদনে।
ইষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে।
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রাতি আশোয়াসে

www.pathagar.com

দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চন্ডীদাসে।।
(৫ পৃষ্ঠা-১৫৮)।

অথবা- তোরমুখে সুনী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবন।।
অহোনিশি দহে সকল পরান
আর থীর নহে মন।। (৫ পৃষ্ঠা-৭)।

অথবা-------------

রাধিকা থাকিলী বসি আপনার ঘরে।
তোক্ষে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।
আসি যাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ুচন্ডীদাস বাসলীগণে।।
(৫ পৃষ্ঠা-১৫৭)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদ যখন রচিত হয় তখন বাংলায় ছিল পাল বংশের শাসন বা বৌদ্ধ শাসন। পাল বংশের পর বাংলায় আসে দীর্ঘস্থায়ী সেন বংশের শাসন বা হিন্দু শাসন। হিন্দু শাসনামলে রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। বৌদ্ধ গান ও দোহা রচয়িতারা তাদের সাহিত্য চর্চায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল বলে যেমন কোন প্রমাণ নেই ঠিক তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি বলেও কোন প্রমাণ নেই। তবে হিন্দু শাসনামলে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ, তখন রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত। এছাড়া, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী যখন নদীয়া (বাংলা) আক্রমণ ও দখল করেন তখন বাংলার (গৌড়ের) রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন (১১৭৯-১২০৬ খৃষ্টাব্দ)। তবে নদীয়া বা গৌড় বর্তমান বাংলাদেশের অংশ নয়, পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত। আলোচ্য সময়ে 'বাংলা' নামে কোন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিলনা, ছিল নদীয়া, গৌড়, লক্ষ্মৌতি, বঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। বখতিয়ার খিলজী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড় তথা পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায় সোনারগাঁ ও ময়মনসিং বিজয়ের পর। তবে সত্যিকার অর্থে আজকের সমগ্র বাংলাদেশ ভূখন্ডে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে। এ সময়েই পান্ডুয়ার (ফিরোজাবাদ) সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (হাজী ইলিয়াস) সোনারগাঁও এর শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে আজকের বাংলাদেশ ভূখন্ড দখল করে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে একক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সময়ে উল্লিখিত সকল সামন্ত রাজ্যের, গৌড়, পাণ্ডুয়া, বঙ্গ, সোনারগাঁ এর সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল 'বাংলা'।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, উমাপতি ধর, জয়দের প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন। জয়দেব সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় 'গীত গোবিন্দ' নামক রাধা কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক একটি অমর কাব্য রচনা করেন। (২ পৃষ্ঠা-১০)। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে লক্ষণ সেন সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনায় জয়দেবকে উৎসাহিত করেছিলেন।

শেষ পাল রাজাদের সময়ে রাজদরবারে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাভারত পাঠের রেওয়াজ ছিল (৩ পৃষ্ঠা-৬৯)। সুতরাং এটা ধারণা করা সঙ্গত যে, পরবর্তী সেন বংশের রাজাদের সময়েও রাজদরবারে সাহিত্য পাঠ অব্যাহত ছিল। লক্ষণ সেনের আমলে গীত গোবিন্দ রচনা এই রেওয়াজেরই সমর্থক এবং 'হুসেন শাহার আমলে প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের নিজস্ব দরবারেও এ রীতি দেখা দিয়েছে (৩ পৃষ্ঠা-৬৯) মন্তব্য তৎকালীন রাজদরবারে সাহিত্য পাঠ ও বিশেষ করে পুরাণ, মহাভারত পাঠের রেওয়াজ যে অব্যাহত ছিল তার সত্যতাই প্রমাণ করে।

বস্তুতঃ একথা আজ ঐতিহাসিক-ভাবে সত্য প্রমাণিত যে, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংস্কৃতের পরিবর্তে ফারসী প্রতিষ্ঠা করলেও রাজদরবারে মহাভারত পুরাণ পাঠ উৎসাহিত করতেন এবং সাথে সাথে স্থানীয় লোকদের মুখের ভাষা 'বাংলা' চর্চাও উৎসাহিত করতেন। কারণ, বিজয়ীরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই দেশে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী করতে হলে শাসকদের জনসাধারণের সাথে মিশতে হবে এবং তাদের সাথে মিশতে হলে তাদের ভাষা বুঝতে হবে, জানতে হবে। স্থানীয় জনগণের ভাষা না জানলে তাদের সাথে সহজে মেলামেশা করা যাবেনা। বিজিতদের সাথে মিশতে না পারলে তাদের সাথে ভাব বিনিময় করা এবং সমস্যা বোঝা যাবে না, তাদের আশা আকাংখার কথা জানা যাবেনা এবং তা জানা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে না। রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে বহিরাগত মুসলিম বিজয়ীরা এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাংলার শাসকদের সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। রাজদরবারের ভাষা সংস্কৃত, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। সুতরাং সাধারণ মানুষ বা প্রজার কাছে রাজার এবং রাজকর্মচারীদের ভাষা দুর্বোধ্য এবং অন্যদিকে প্রজার ভাষা রাজা বা রাজকর্মচারীদের কাছে অবোধ্য। এ কারণে লক্ষণ সেনের পতনে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষ হিন্দু শাসনের স্থলে মুসলিম শাসনকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ রাজার পরিবর্তন যেন ছিল তাদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা।

বাংলাদেশে ক্ষমতা পরিবর্তনে প্রজামনে এবং এমনকি রাজ-সভাসদদের মধ্যেও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। এটা লক্ষ্য করে বাবর লিখেছেন, "বাংলাদেশে এ ধরণের একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করা খুব কমই হয়ে থাকে।

রাজার জন্য নির্দিষ্ট করা একটি সিংহাসন রয়েছে এবং একইভাবে প্রত্যেক আমির, উজীর ও মনসবদারের জন্য পদ বা আসন স্থির করা আছে। কেবল এ সিংহাসন এবং

www.pathagar.com

আসনগুলো বাংলার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। যখনই রাজা কাউকে বরখাস্ত করেন কিংবা নিযুক্ত করতে চান, তখন যে কাউকে তিনি অপসারিত ব্যক্তির স্থলে বসান, তাঁর প্রতি সকল অধীনস্থ কর্মচারী ও অনুচরবৃন্দ আনুগত্য প্রদর্শণ করে থাকে। শুধু তাই নয়, এ প্রথা এমনকি রাজার বেলায়ও সমান ভাবে প্রচলিত দেখা যায়। যে কেহ রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন তাঁকেই সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীদের পক্ষ থেকে রাজা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়, সমস্ত আমির ওমরাহ, সৈন্য ও প্রজাগণ তৎক্ষণাৎ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁকে মান্য করে থাকে। পূর্ববর্তী রাজার মতই তাঁকে তারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে ও দ্বিধাহীনভাবে তাঁর আদেশ মান্য করে চলে। "বাংলার অধিবাসীরা বলে থাকে, "আমরা সিংহাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; যিনিই সিংহাসন দখল করুন, আমরা তাঁর একান্ত অনুগত ও বাধ্য (৬ পৃষ্ঠা-৪৮)। বাবরের এই বর্ণনা সমর্থন করে নিজাম উদ্দিন আহমদ বখশী লিখেছেন, "বাংলাতে একটা রীতি প্রচলিত ছিল যে, যে কেউ রাজাকে হত্যাকরে সিংহাসন অধিকার করত, সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করত। (৭ পৃষ্ঠা-২৬৮)।

বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহীর আক্রমণ প্রতিরোধ না করে লক্ষণ সেন কেন নদীয়া থেকে বিক্রমপুর পালিয়ে গিয়ে ছিলেন? কারণ, 'হিন্দু শাসকরা এমন একটা সমাজ গড়ে তুলেছিলেন যা ছিল অভিজাত ব্রাহ্মণ শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই শাসক শ্রেণীর সাথে শাসিত জনগণের কোন যোগাযোগ ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন হিন্দু সমাজের জীবনী শক্তিই নষ্ট করে দিয়েছিল। সুতরাং শাসক পরিবর্তনে জনগণের কোন মাথাব্যথা ছিল না। ধারনাটা ছিল যেন এরূপ যে, শাসকরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করবে অথবা বৃহৎ শক্তি দ্বারা তারা বিতাড়িত হবে। (৮ পৃষ্ঠা-৩৮)।

ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণের লোক এবং বৌদ্ধদের উপর কি ধরনের নির্যাতন চালাত তা শূন্য পূরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। নিরঞ্জনের রুষ্মা অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ-----------

জাজপুর পুরবাদি　　　　সোল সঅ ঘর বেদি
বেদিলয় কেবোল দুর্জন।
দখিণ্যা মাগিতে জাএ　　　　জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভূবন।
মালদহে লাগে কর　　　　না চিনে আপন পর
জালের নাগ্রিক দিক পাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়　　　　দশ বিশ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে কর এ বিনাস।
বেদ করে উচ্চারণ　　　　বেরা্যা অ অগ্নি ঘণে ঘণ
দেখিয়া সভাই কম্পনমান।
মনেত পাইয়া মম্ম　　　　সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম

www.pathagar.com

তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার
বৈকুণ্ঠে ডাকিয়া ধর্ম মনেত পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার।।
ধর্ম হৈল্যা জবন রূপি মাথা এত কাল টুপি
তাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপি আ উত্তম হয় ত্রিভুবণে লাগে ভয়।
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।।
ব্রহ্মা হৈল্যা মঁহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈলা সুলপানি।
গণেশ হইলা গাজী কার্ত্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি।।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হৈল্য সেক
পুরন্দর হইল মলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা।।
আপুনি চন্ডিকা দেবী তিঁহু হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নুর।
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিরয়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া পা এ রামাঞি পণ্ডিত গা এ
ই বড় বিষম গণ্ডগোল

(৮ পৃষ্ঠা-১৮৭-১৮৮) চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বাংলা ১৩৩৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত শূন্যপূরাণ থেকে উধৃত)। (এটি অবশ্য সপ্তদশ/অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের রচনা)।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খন্ড, বাঙলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০।

২। দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা, ১৯৫৯ খৃঃ।

৩। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। সাহিত্য একাডেমীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৬৫ খৃঃ।

৩ক। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৫। বড়ু চন্ডীদাস লিখিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লব সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলিকাতা। ১৩৮০।

৬। বাবর নামা-ইলিয়ট-সুশীল পাবলিকেসন্স। (Tr. by A.S. Beveridge) New Delhi, 1989.

৭। তাবাকাত-ই-আকবরী, তৃতীয় খন্ড।

৮। Dr. A. Karim-Social History of the Muslims in Bengal (Down to 1538 AD) Baitussharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1988.

৯। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা,১৯৯১।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য চর্চার সূচনা

মুসলিম শাসন প্রবর্তনকালে 'বাংলার ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল দেব ভাষা এবং বাংলাসহ অন্যান্য সকল ভাষা ছিল শুদ্রের (নীচ) ভাষা। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্মীয় বই লেখা নিষিদ্ধ ছিল এবং শুদ্রদের ধর্মীয় বই ছুঁতেও দেয়া হত না। (১ পৃষ্ঠা-১০৫)। ব্রাহ্মণগণ এই বলে বাংলা সাহিত্যকে অভিশপ্ত করেছিলেন যে, "যারা অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে, তারা রৌরব নামক নরকে যাবে। (২ পৃষ্ঠা-১)। বস্তুতঃ এ কারণে বৌদ্ধ যুগে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূচনা হলেও দীর্ঘস্থায়ী হিন্দু যুগে বাংলা সাহিত্য রচনার অগ্রগতিতো দূরের কথা রচনায় হাতও দেয়া হয়নি।

বিজয়ী মুসলমনেরা বাংলায় নিয়ে এসেছিল ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী এবং সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে ফারসী। এ'দুটি ভাষাই স্থানীয় বাংগালীদের কাছে অপরিচিত ছিল। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয় তারা সংস্কৃতের স্থলে আরবীকে ধর্মীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করলেও এইভাষা তাদের কাছে বোধগম্য ছিলনা। অন্য দিকে ফার্সী রাজভাষা হওয়ায় স্থানীয়সহ সকল রাজকর্মচারী এই ভাষা শিখতে বাধ্য হয়।

মুসলমানদের যে কোন ভাষায় শিক্ষা কিংবা জ্ঞানার্জনে বাধা নেই। তাই মুসলমানেরা ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী অনুসরণ করলেও অন্য যে কোন ভাষা শিক্ষা করে এবং যে কোন ভাষায় জ্ঞান চর্চা করতে ইতস্ততঃ করে না। বাংলায়ও (নদীয়া-গৌড়) মুসলমান শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ফার্সী চালু করলেও দরবারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারত-পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা চালু রাখেন এবং পরে মহাভারত পুরাণের কাহিনী স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহদান শুরু করেন। মুসলমানদের কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্রে কোন ভেদাভেদ ছিলনা। শাসকরা এটা বুঝে ছিলেন যে, স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ছাড়া শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী করা যাবে না। তাই তাঁরা স্থানীয় ভাষা নিজেরা শিখতে উদ্যোগী হন এবং স্থানীয় ভাষায় সাহিত্য চর্চা উৎসাহিত করতে শুরু করেন।
রাজভাষা ফার্সী হওয়ায় রাজকাজ গ্রহণে ইচ্ছুকদের ফারসী শিক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ফলে স্থানীয় লোকেরা ফার্সী শিখতে শুরু করে। এর ফলে স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া এ সময়

www.pathagar.com

বাংলাভাষা চর্চায় ব্রাহ্মণদের 'বেদের ভাষা'র মতো কোন বাধা ছিল না বিধায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসে। তাই মুসলিম শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন, "......মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামন্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেরাৎ (শবেবরাত) প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতুহল হইল।...... মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগনের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহবান পড়িয়াছিল। (২৪ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১২৯ ও ১৩১)।

দুইখানি পাঞ্চালী কাব্য গৌড়-সুলতানের দরবারে সম্মানিত দুই কবির রচনা। একজন কৃত্তিবাস ওঝা (পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপনকারী নরসিংহ ওঝার বংশধর)। তিনি বাঙলা ভাষায় সবার আগে রামায়ণ কাব্য লিখিয়াছিলেন।......... কৃত্তিবাসের রামকথা বাঙালীর প্রথম জাতীয় কাব্য। (৩ পৃষ্ঠা-৮-৯)।

কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, কিন্তু রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে এবং রাজসভাসদদের নাম হইতে মনে হয় যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দুভাবাপন্ন রাজা ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস (গণেশ) ও তৎপুত্র যদু (পরে জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ) ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজা কংস অর্থাৎ গণেশের অথবা যদুর সভায় সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন-এই অনুমান অনেকে করেন। (৩ পৃষ্ঠা-১০)।

কৃত্তিবাস রামায়ণ কাব্যে যে আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন তা পর্যালোচনা করলে তিনি যে রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন সে রাজদরবার সম্পর্কে ধারণা করা, সত্যিকার অর্থে কোন রাজা বা শাসক কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন,

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁর পাত্র ছিল নাম নরসিংহ ওঝা।।
বঙ্গদেশে× প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা এল গঙ্গাতীর।।
সুখভোগ আশে ওঝা ফিরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে।।

www.pathagar.com

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইলে ওঝা শুইল তথায়।।
পোহাইতে আছে যবে দন্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি।।
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে দৈববাণী শুনিবারে পায়।।
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা।।
গ্রামরত্ন ফুলিয়া সে জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী।।
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল ওঝার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি।।
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি গোবিন্দ সূর্য্য তাহার তনয়।।
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত।।
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব।।
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্ম চর্চা-রত সদা মহান্ত যে মানী।।
মদনরহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
নার্কন্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।।
সুশীল ভগবান্ তথায় বনমালী।
বিবাহ করিল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী।।
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার।।
কুলেশীলে ঠাকুরালে গোঁসাই-প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র বাড়য়ে সম্পদে।।
পতিব্রতা মাতৃযশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।।
সংসারেতে হৃষ্টমতি সদা কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস।।
শান্তিমাধব সহোদর সর্ব্বলোকে ঘুষি।
আর ভাই শ্রীধর সে নিত্য উপবাসী।।
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।

www.pathagar.com

আর এক ভগ্নী হৈল সতাই-উদর।।
মালিনী নামেতে মাতা, পিতা বনমালী।
ছয় ভাই জন্মিলাম অতি গুণশালী।।
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে।।
সূর্য্য-পন্ডিতের পুত্র নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনি পন্ডিত বাপের সোসর।।
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে তাহার।।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল তারে এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া।।
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর।।
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী অবধি কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁর।।
মুখটী বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার।।
কুলেশীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে।।
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
ভাল বস্ত্র দিয়া পিতা মোরে লৈলা কোলে।।
দক্ষিণে যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ।।
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেনু উত্তর দেশ।।
বৃহস্পতিবারে উষা শেষে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেনু বড় গঙ্গা পার।।
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা আমি যাই তথা বিদ্যার প্রচার।।
সরস্বতী অধিষ্ঠান কন্ঠের উপরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনি স্ফুরে।।
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গৃহেতে গমন।।

www.pathagar.com

ব্যাস ও বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরু ঠাঞি মোর বিদ্যা সমাপন।।
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উষ্মাকার।
হেন গুরু ঠাঞি মোর বিদ্যার উদ্ধার।।
মেলানি লইনু মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ-বিশেষে।।
রাজপন্ডিত হৈব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।।
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারে রহিলাম।।
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধাই এল দ্বারী হাতে স্বর্ন লাঠি।।
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ।।
নয় দেউড়ী পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে।।
রাজার ডা'নে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন।।
গন্ধর্ব্ব রায় বসে গন্ধবর্ব-অবতার।
রাজসভা পূজিত সে গৌরব অপার।।
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্র ল'য়ে রাজা আছে পরিহাসে।।
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে রমণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী।।
মুকুন্দ রাজার প্রধান পন্ডিত সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর।।
রাজার সে সভা যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার।।
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
বহু লোক দান্ডাইয়া রাজার সম্মুখে।।
চারিদিকে নৃত্যগীত সব লোক হাসে।
চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি নৃপের আবাসে।।
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা সে মাজুরি।

www.pathagar.com

তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি।।
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় গৌড়েশ্বর।।
দান্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে।।
রাজার আদেশ পাত্র কৈল উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে।।
নৃপ ঠাঁই দান্ডাইনু হাত চারি দূরে।
সপ্ত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে।।
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
বাণীর প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে।।
নানাছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়।।
নানামতে নানা শ্লোক পড়িনু রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল।।
কেদার খাঁ শিরে দেয় চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।।
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান।।
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বরে রাজা।
গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার।।
যত যত মহা পন্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে।।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন প্রবোধ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।।
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
কৌতুহলী লোক যায় মোরে দেখিবারে।।
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
বলে সবে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পন্ডিত।।
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পন্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহাগুণী।।
পিতামাতা আশীর্বাদে, গুরু-আজ্ঞা দান।

www.pathagar.com

রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্ত কান্ড গান।।
সাত কান্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পন্ডিত।।
রঘুবংশ-কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে।।

(৬ পৃষ্ঠা-১৭-১৮)। × বঙ্গদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশ বুঝিয়েছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম শাসকেরাই সভাসদদের এবং কবি সাহিত্যিকদের খাঁ উপাধি দিতেন। কেদার খাঁও ছিলেন সেরূপ উপাধি প্রাপ্ত একজন সভাসদ। যাঁরা ধারণা করেন যে, রাজা গণেশের আদেশে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন তাঁদের ধারণা ভুল। কারণ, রাজা গণেশ মুসলিম শাসন উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং ক্ষমতা দখল করেই মুসলিম আমীর ওমরাহ্দের, ফকির দরবেশদের উপর নির্যাতন শুরু করেছিলেন বিধায় ইব্রাহিম শর্কী গৌড় আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছিলেন। এই সময় গণেশ নিজ পুত্র যদুকে মুসলমান বানিয়ে এবং সিংহাসনে বসিয়ে আত্মরক্ষা করে ছিলেন। পরে শর্কী ফিরে গেলে তিনি যদুকে আবার হিন্দু বানান এবং নিজে ক্ষমতা দখল করেন। গণেশের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র ক্ষমতা দখল করলে যদু ঐ পুত্রকে হত্যা করে জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ হিসাবে ক্ষমতা পূনঃদখল ও শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে মুসলমান আমীর ওমরাহ্রা পূর্ব মর্যাদা ফিরে পেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সময়েই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন বলে অনেকে ধারনা করেন। কিন্তু ধারনা ইতিহাস নয়।

কিন্তু রাজা যদি হিন্দু না হন তবে কৃত্তিবাসের সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইবে....পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো ধরনের হইবার কথা। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে গায়কের মুখে মুখে ভাষা বদলাইতে বদলাইতে একেবারে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ভেজালও যথেষ্ট ঢুকিয়াছে। কৃত্তিবাসের মূল রচনার কিছুই আমরা অবিকৃত ভাবে পাই নাই। (৩ পৃষ্ঠা-১০)।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা খৃঃ ১৮০২-১৮০৩ এ লোকপ্রিয় গ্রন্থ হিসাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমগ্র বাংলায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তখন থেকেই লোকে মনে করল, বাল্মীকি যেমন সংস্কৃতের আদিকবি কৃত্তিবাসও তেমনি বাংলার আদিকবি। (৭ পৃষ্ঠা-৫২/৫৩)। কৃত্তিবাসের কাল নিয়ে তর্ক রয়েছে। আরও বেশী তর্ক থাকবে তাঁর রচনা কোনটি, কোনটি নয় তা নিয়ে। যা নিয়ে তর্ক নেই তা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। এই কাব্যকে অনুবাদ না বলে রচনা বলাই শ্রেয়ঃ। (৭ পৃষ্ঠা-৫২)।

কৃত্তিবাসের কাল নিয়ে এবং কোন গৌড়েশ্বরের আদেশে তিনি 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন তা' নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আগেই বলেছি যে, অনুমান বা ধারণা ইতিহাস নয়। কৃত্তিবাস তাঁর রচনায় রচনার কাল উল্লেখ করেননি এবং

www.pathagar.com

গৌড়েশ্বরের নাম ও (যে দরবারে তিনি সংবর্ধিত হয়েছিলেন এবং রামায়ণ রচনার আদেশ পেয়েছিলেন) উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল পন্ডিতই একথা স্বীকার করেন যে, 'কৃত্তিবাস সম্পর্কে আলোচনা তাঁর আত্মকথার উপর নির্ভরশীল। (৮ পৃষ্ঠা-১)। কারণ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এর (কৃত্তিবাসের আত্মকথার) অকৃত্রিমতা প্রমাণ করেছেন। (৯ পৃষ্ঠা-৯০)।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় বা আত্মকথার উল্লেখযোগ্য সূত্রগুলো হচ্ছেঃ-

১) কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশের রাজা 'বেদানুজ' এর পাত্র ছিলেন।

২) 'বঙ্গদেশে প্রমাদ' পড়িলে নরসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরে (ভাগীরথী তীরে) আশ্রয় নেন এবং ফুলিয়ায় বসবাস স্থাপন করেন।

৩) নরসিংহ ওঝার বংশে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়, কৃত্তিবাস নরসিংহ ওঝা থেকে অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ-নরসিংহ গার্ভেশ্বর-মুরাবী-বনমালী-কৃত্তিবাস। (অর্থাৎ কৃত্তিবাস নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর এর প্রপৌত্র)।

৪) এগার বৎসর পার হওয়ার পর বার বৎসরের প্রারম্ভে কৃত্তিবাস বড়গঙ্গা (অর্থাৎ পদ্মা) পার হয়ে বরেন্দ্রে বিদ্যাশিক্ষা করতে যান।

৫) বিদ্যা শিক্ষা শেষ হওয়ার পর কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের দরবারে যান এবং গৌড়েশ্বর তাঁকে রামায়ণ রচনা করার আদেশ দেন।

.... উল্লিখিত সূত্রগুলো যথাযথভবে আলোচনা করলে কৃত্তিবাসের সময় ও কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব। (৮ পৃষ্ঠা-৫)।

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীর একটি বিশেষ দিকে আমি পন্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। একমাত্র ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া সূত্রটি প্রায় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশের কোন এক রাজার পাত্র ছিলেন। কৃত্তিবাসের নিজের সাক্ষ্যে রাজার নাম "বেদানুজ"। নামটির কোন পাঠান্তর নাই এবং কোন অর্থও হয় না।'বেদানুজ' নামটি 'দনুজের' বিকৃত লিপি বলে সকলেই স্বীকার করেন। (ঐ পৃষ্ঠা-৯)।

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা রাজা গণেশের পাত্র ছিলেন। কারণ গনেশ দনুজমর্দনদেব উপাধি বিশিষ্ট মুদ্রা প্রচলন করেন। এই সূত্রে ডঃ সেন কৃত্তিবাসের সময় পঞ্চদশ (খৃষ্টীয়) শতকের শেষ পাদে নির্ণয় করেন। (১০ পৃষ্ঠা-৯৭)। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী প্রকাশ হওয়ার পর প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে, কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেউ নন। (১১ পৃষ্ঠা-১১৫)। কারণ গৌড়েশ্বরের সভার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি (কৃত্তিবাস) বেশ কয়েকজন হিন্দু সভাসদের নাম করেছেন, অথচ কোনো মুসলমান সভাসদের নাম করেন নাই; অন্যপক্ষে মুসলমান আমলে একমাত্র গনেশ ব্যতীত অন্য কোনো হিন্দু রাজা গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলেন বলে প্রমাণ নাই। (৮ পৃষ্ঠা-৬)। একথা অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বাংলায়

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনামলে একমাত্র রাজা গনেশই গৌড়ের (পান্ডুয়া) সিংহাসন দখল করেছিলেন। গণেশ এবং তাঁর বংশের এই শাসন কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য তাঁর চতুর্থ সংস্করণে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেনঃ- রাজসভার বর্ণনায় ও সভাসদদের নামের যদি কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে তবে উহা কোনো হিন্দু রাজা-জমিদারের এবং হোসেন শাহার রাজ্য লাভের অনতিদূরকালের। হোসেন খাঁ সৈয়দ সামান্য অবস্থা হইতে সিংহাসনে উঠিয়া হোসেন শাহ্‌া হন। তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য

করিয়াছিলেন সুবুদ্ধি রায় প্রভৃতি। এই সুবুদ্ধিরায় (বা সুবুদ্ধি মিত্র) "গৌড়ের অধিকারী" (অর্থাৎ গৌড় শহরের কোতোয়াল) ছিলেন। তাঁহার অধীনে সামান্য দারোগা ছিলেন হোসেন খাঁ। হয়ত সুবুদ্ধি রায়ের নিজস্ব দরবারে (Miniature Court) কৃত্তিবাস হাজির হয়েছিলেন। আরও বেশী সম্ভব, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের সন্ধিকালে কোনো সময়ে উত্তরবঙ্গের কোনো রাজা- জমিদারের সংবর্ধনা পাইয়াছিলেন। (১১ পৃষ্ঠা-১০-১৮)।

ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত প্রসঙ্গে ডাঃ আবদুল করিম বলেছেন, "প্রথমত ডঃ সেন নরসিংহ ওঝার পোষ্টা বেদানুজকে দনুজমর্দনদেবের (রাজা গনেশের) সংগে অভিন্ন মনে করেছেন, অথচ কি ভিত্তিতে তিনি এরূপ অনুমান করেছেন, তার কোনো উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ সুবুদ্ধি রায় বা অন্য কোনো রাজা-জমিদারকে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর বলার হেতু উল্লেখ করেন নি। (৮ পৃষ্ঠা-৬)।

ডঃ আবদুল করিম আরো বলেছেন, সেকালে বঙ্গদেশ বলতে পূর্ব বাংলাকে বুঝাত এবং সেখানে 'দনুজ' নামক রাজার অভাব ছিল না। (৮ পৃষ্ঠা-৯)। ১৩৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত জিয়া-উদ-দীন বরনীর তরিখ-ই-ফিরুজ শাহী হতে জানা যায় যে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন (দিল্লীর সুলতান) যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখন অর্থাৎ ১২৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এ দনুজ রায় নামে একজন রাজা ছিলেন এবং বলবন দনুজ রায়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন (১২ পৃষ্ঠা -৮৭)। আবার আর একজন দনুজমর্দন দেব ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৯-৪০ শকাব্দে) চাটিগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম এবং পান্ডুনগর টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন (১৬ পৃষ্ঠা-১১৮-২০)। চন্দ্রদ্বীপেও একজন দনুজ রাজা রাজত্ব করতেন বলে জানা যায় (২৪ পৃষ্ঠা-৩৭০)। কৃত্তিবাস বর্ণিত দনুজমহারাজা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ পতি দনুজরাজা ছিলেন কায়স্থগোষ্ঠীপতি। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজ কৃত্তিবাস বর্ণিত দনুজের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না। (৮ পৃষ্ঠা-১০)।
কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন-

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁর পাত্র ছিল নাম নরসিংহ ওঝা।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা এল গঙ্গাতীর।।

www.pathagar.com

এখন বেদানুজ বা দনুজ রাজার পরিচয় উদ্ধার করতে হলে বঙ্গদেশে 'প্রমাদ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা উদ্ধার করা প্রয়োজন।

ডঃ আবদুল করিম জানতে চেয়েছেন, বঙ্গদেশে "প্রমাদ" দেখা দেওয়ার মানে কি? তিনি নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন, "প্রমাদ" নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, প্রমাদ মানে রাজনৈতিক প্রমাদ এবং স্পষ্টত মুসলমান আক্রমণ। দনুজমর্দনদেবের সময়ে, অর্থাৎ ১৪১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মুসলমান আক্রমনের কোন প্রশ্নই উঠেনা, কারণ দনুজমর্দন

দেব নিজেই মুসলমানদের বিতাড়িত করে সিংহাসনে বসেন। তাছাড়া এই দনুজমর্দন দেবের রাজধানী ছিল পান্ডুয়ায়, বাংলাদেশের (পূর্ব বাংলার) কোন অঞ্চলে নয়। সুতরাং কৃত্তিবাসের দনুজ ১৪১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের দনুজমর্দনদেব একই ব্যক্তি নন। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেনের উক্তি "কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ (আসলে প্রপিতামহের পিতা) নরসিংহ ওঝা যে বেদানুজ মহারাজের পাত্র ছিলেন তিনি দনুজমর্দন ছাড়া আর কেহ নহেন" (৩ পৃষ্ঠা-৯৭) কথাটা গ্রহণ যোগ্য নয়। (৮ পৃষ্ঠা-১০)।

ইতিহাস আমাদের সামনে যে সত্যগুলো তুলে ধরছে সেগুলো হচ্ছে (১) বাংলায় মুসলিম শাসনামলে গনেশই একমাত্র হিন্দুরাজা, যিনি গৌড়ের (পান্ডুয়ার) সিংহাসন দখল করেছিলেন। (২) রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়া পরগনার জমিদার গণেশ ইলিয়াস শাহী শাসক গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০ খৃষ্টাব্দ) মন্ত্রী ছিলেন। (৩) গণেশের ষড়যন্ত্রে ১৪১০ খৃষ্টাব্দে আজম শাহ নিহত হলে গণেশ আজম শাহের পুত্র সাইফুদ্দিন হামজা শাহকে সিংহাসনে বসান। স্বল্পকাল পর হামজা শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে একজন দাস, সিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহকে ১৪১১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসান। কিছুদিন পর বায়জিদ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে বায়জিদ শাহের পুত্র, আলাউদ্দিন ফিরোজশাহকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকেও ক্ষমতাচ্যুত করে রাজা গণেশ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে ধনুজমর্দনদেব উপাধি ধারণ করে গৌড়ের (পাণ্ডুয়ার) সিংহাসন বসেন (১ পৃষ্ঠা-৪৯-৫০)। বস্তুতঃ ১৪১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে তিনজনকে পান্ডুয়ার সিংহাসনে বসানো হয়েছিল তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজা গণেশের হাতের পুতুল। (১৫ পৃষ্ঠা ১২৬)।

রাজা গণেশের পান্ডুয়ার ক্ষমতা দখল সম্পর্কে ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেছেন, "..... পান্ডুয়ার সিংহাসন লাভ করিতে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ উলেমা সম্প্রদায়ের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সুলতান তাঁহার গুরুপুত্র এবং সহপাঠী নুর কুতুব আলমকে তাঁহার প্রধান উপদেষ্টার পদ দান করেন। উলেমা সম্প্রদায় প্রশাসনিক বিভাগকে ইসলামীকরণ নীতি গ্রহণের জন্য সুলতানকে পরামর্শ দিলেন। প্রধানত তাঁহাদের পরামর্শে সুলতান অমুসলমানদের দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে পর্যায়ক্রমে অপসারণের নির্দেশ দেন। ইহার ফলে রাজা গণেশ প্রমুখ প্রভাবশালী অমাত্যরা রাজসভা হইতে বহিস্কৃত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে রাজা গণেশের নেতৃত্বে সুলতানের বিপক্ষীয়রা সংগঠিত হইতে আরম্ভ করে।........... রাজা গণেশের নেতৃত্বে বিক্ষুব্দরা শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ এবং তাঁহার বংশধরদের পর্যায়ক্রমে উৎখাত করিয়া রাজপদ দখল করে। (১৬ পৃষ্ঠা-১২৩ ও ১২৭)।

উপরোক্ত আলোচনায় ডঃ আবদুল করিম ও ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো রাজা গণেশের গৌড়ের (পান্ডুয়া) সিংহাসন দখলের সহজ সমাধান উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, রাজা গণেশ যখন ক্ষমতা দখল করেন তখন বাংলায় মুসলিম শাসনের দু'শ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ফলে এই সময়ের মধ্যে বাংলায় একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মুসলিম শাসকেরা বাংলার সাধারণ মানুষের ভাষা বাংলা শিখেছিল এবং বাংলা শিক্ষায় উৎসাহ দিতে শুরু করেছিল। ফলে ইতোপূর্বে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা কমে গিয়েছিল। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে দিল্লীর আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষার লক্ষ্যে ইলিয়াস শাহী শাসকেরা স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেছিল। ফলে বহিরাক্রমণ (দিল্লীর) মোকাবেলায় বাংলার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু একথা সত্য যে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ক্ষমতা দখলে উলেমা সম্প্রদায়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। উলেমা সম্প্রদায় অবশ্যই অমুসলমানদের উচ্চপদ দানের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তার দ্বারা রাজা গণেশের রাজসভা থেকে বহিস্কৃত হওয়া প্রমাণ করে না। পক্ষান্তরে রাজা গণেশই ১৪১০ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনজনকে পুতুল হিসেবে সরকার পরিচালনায় নিয়োগ করেছিলেন এবং পরে নিজেই ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাজদরবারে গণেশের পূর্ণ-ক্ষমতা ছিল। সুতরাং ডঃ সুনীতি কানুনগোর ধারণা সঠিক নয়। কিন্তু গণেশের ক্ষমতা দখল মুসলিম আমির ওমরাহরা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালে গণেশ বহুসংখ্যক আমির উমরাহ ও উলেমাকে হত্যা করেছিলেন ক্ষমতা নিষ্কন্টক করার জন্যে। শয়খ আনোয়ার ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হয়, এ বিষয় কোন দ্বিমত নাই। (৮ পৃষ্ঠা-৫৪)। উল্লেখ্য যে, শয়খ আনোয়ার ছিলেন নুর কুতুব আলমের পৌত্র এবং শয়খ আলাওল হকের পুত্র। অর্থাৎ ইব্রাহিম শর্কীকে গণেশের রাজ্য আক্রমণে আমন্ত্রণকারী নুর কুতুব আলমের পৌত্র।

মুসলিম আমীর উমরাহ ও উলেমাদের উপর রাজা গণেশের অত্যাচার সম্পর্কে 'রিয়াজ' ও বুকাননের উধৃতি দিয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, গণেশ সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেঁধে ওঠে। গণেশ কঠোর হাতে দরবেশদের দমন করেন। কীভাবে এই বিরোধ চরমে উঠল, সে সম্বন্ধে রিয়াজ উস-সালাতীনে পাওয়া যায় গণেশ একদিন সভায় বসেছিলেন, এমন সময় বদর-উল-ইসলাম নামে একজন দরবেশ সেখানে এসে তাঁকে অভিবাদন না করেই বসে পড়েন। গণেশ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বদর-উল-ইসলাম বলেন, শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করেন না। গণেশ সেদিনকার মত তাঁকে কিছু বলেন না, কিন্তু আরও একদিন বদর-উল-ইসলাম তাঁকে অপমান করাতে তিনি তাঁকে (বদর-উল-ইসলামকে) হত্যা করেন। সেই দিনই পান্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ এবং উলেমাকে তাঁর (গণেশের) আদেশে জলে ডুবিয়ে

www.pathagar.com

বধ করা হয়।। (১৯ চতুর্থ অধ্যায় পৃষ্ঠা-১০৮)। সুখময় বাবুসহ কোন কোন পন্ডিত এসব বিবরণের সত্যতা অস্বীকার করে 'হিন্দু জমিদারদের অন্যতম গণেশ অসামান্য সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং 'অমিত শক্তিধর গণেশের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার করা মোটেই কঠিন হয়নি, বলে মন্তব্য করে মুসলমান আমির ওমরাহ এবং দরবেশদের উপর তাঁর (গণেশের) অত্যাচারের ঘটনা এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ ইব্রাহিম শর্কীর বাংলা অভিযানের পথে মিথিলায় (ত্রিহুতে) বাধা প্রাপ্ত হয়ে মিথিলার রাজা শিবসিংহকে পরাজিত, বন্দী ও রাজ্য চ্যুত করার (২৫ পৃষ্ঠা-৩৬) ঘটনা প্রমাণ করে যে, শর্কী শুধুমাত্র বাংলার মুসলিম সিংহাসন উদ্ধার করতেই যুদ্ধাভিযান করেন নি, মুসলিম আমির উমরাহদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়াও এই অভিযানের উদ্দেশ্যে ছিল এবং এই জন্যেই তিনি নুর কুতুব আলমের অনুরোধে বাংলা অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, গণেশ একজন জন্মগত প্রতিভা সম্পন্ন কুশাগ্রবুদ্ধি কূটনীতিক ছিলেন। ইব্রাহিম শর্কী যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করলেন তখন তিনি প্রতিরোধ নিস্ফল বুঝে নিজের অধিকার ছেড়ে সরে দাড়ালেন, তাঁর পুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু ইব্রাহিম চলে গেলেই তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করে পুত্রের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন। (১৯ চতুর্থ অধ্যায় পৃষ্ঠা-১৪২)।

১৪১৮ খৃষ্টাব্দে গণেশের মৃত্যু ঘটলে তাঁর অপর পুত্র মহেন্দ্রদেব ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু যদু তাঁকে হত্যা করে ক্ষমতাদখল পূর্বক জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ হিসেবে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শাসন কাজ চালাতে থাকেন। বস্তুতঃ গণেশের শাসন ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী এবং গোলযোগপূর্ণ। কিন্তু এই সময় কোন যুদ্ধ হয়নি বিধায় বাংলাদেশে (যদিও বাংলাদেশ গণেশের অধীন ছিলনা) প্রমাদের প্রশ্ন অবান্তর। অন্যদিকে গণেশের রাজধানী বাংলাদেশে ছিল না, ছিল পাণ্ডুয়ায়। সুতরাং তাঁর দরবারে নরসিংহ ওঝার পাত্র হওয়ার কল্পনা কল্পনা প্রসূত।

কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে, ডঃ সুকুমার সেনের যুক্তি সত্য বলে স্বীকার করা হয় তাহলে কৃত্তিবাসের সময়কাল কখন হয়? কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কৃত্তিবাস নরসিংহ ওঝার পুত্র গর্ভেশ্বরের প্রপৌত্র। সে হিসেবে নরসিংহ-গর্ভেশ্বর-মুয়ারী-বনমালী এবং তাঁর পুত্র হয় কৃত্তিবাস। বাবা-পুত্রের বয়সের ব্যবধান গড়ে ৩০ বছর ধরলে নরসিংহ থেকে কৃত্তিবাস পর্যন্ত বয়সের সমষ্টি হয় ৩০+৩০+৩০+৩০+=১২০ বছর। অর্থাৎ গর্ভেশ্বরের জন্মদিন থেকে কৃত্তিবাসের জন্মদিনের ব্যবধান ১২০ বছর। গণেশের শাসনকাল ১৪১৪-১৮ খৃষ্টাব্দ বলে প্রমানিত। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম সাল হবে ১৪১৮+১২০=১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ। আত্মপরিচয়ে কৃত্তিবাস বলেছেন যে, ১১ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা লাভ করতে গুরু গৃহে গিয়েছিলেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে পাঠ সম্পন্ন করিতে গুরুগৃহে তার ১২ বৎসর কাটিয়াছিল। শিক্ষা লাভে ১২ বছর সময় লাগলে ২৩ বছর বয়সের আগে তাঁর পক্ষে গৌড় দরবারে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং জন্ম

www.pathagar.com

সালের সাথে ২৩ বছর যোগ করলে হয় ১৫৩৮+২৩=১৫৬১ খৃষ্টাব্দ। এখন দেখা যাক ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে বা সমসাময়িক কালে গৌড়ের সিংহাসনে কে ছিলেন।

১৪১৮ খৃষ্টাব্দে গণেশের পুত্র যদু তার ভাই মহেন্দ্রদেবকে হত্যা করে গৌড়ের (পান্ডুয়ার) সিংহাসন দখল করেন এবং জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ হিসেবে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সামসুদ্দিন আহমদ শাহ ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে সুলতান হন। কিন্তু ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন দাসের হাতে নিহত হলে শাহী বংশের অমাত্যরা ইলিয়াস শাহী বংশের একজন দূরতম আত্মীয় নাসিরুদ্দিনকে গৌড়ের সিংহাসনে বসান।

নাসিরুদ্দিনের পর তাঁর পুত্র রুকন উদ্দিন বারবাক শাহ ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সুলতান ছিলেন। অতঃ পর বারবাক পুত্র ও পৌত্র ইউসুফ শাহ ও জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন। ১৪৮৬-১৪৯৩ পর্যন্ত গৌড়ে ছিল হাবসী শাসন। ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত ছিল হোসেন শাহী শাসন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে আসে আফগান শাসন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কুররানী শাসন এবং এই বংশের সুলেমান কররানী ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ডঃ সুকুমার সেনের হিসেব সত্য মনে করলে কৃত্তিবাসের গৌড়ে উপস্থিতির কাল হয় কররানী আমলে যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

উল্লেখ্য যে বারবাক শাহ ও পুত্র ইউসুফ শাহের উৎসাহে মালাধর বসু ১৪৭৩-১৪৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রকৃিষ্ণ বিজয় রচনা করেন।

কোন কোন পন্ডিত' কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরকে তাহিরপুরের জমিদার কংশ নারায়ণের সংগে অভিন্ন মনে করেছেন। (১৮ পৃষ্ঠা ১৬৯)। কিন্তু জমিদার কংশনারায়ণের তারিখও জানা নাই। "কেহ বলেন কংশনারায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, অপরে বলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের। (১০ পৃষ্ঠা-৯৭)। তাঁরা তাহিরপুরের জমিদার কংশনারায়ণকে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। চাটুকারিতা করে জমিদারকে রাজা বলা যায়, কিন্তু গৌড়েশ্বর বলার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। (৮ পৃষ্ঠা-৬)। সুতরাং তাহিরপুরের জমিদার কংশনারায়ণের দরবারই কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরের দরবার, এ দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ডঃ সুকুমার সেনের কৃত্তিবাস সম্পর্কিত আলোচনা বেশ খুঁটিয়ে বিচার করে নানা ভুল-ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা বের করেছেন (৯ পৃষ্ঠা-৩৪৮)।.... তিনি কৃত্তিবাসের সময় নিরুপণ করে কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরকে সুলতান রুকন উদ্দিন বারবাক শাহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তাঁর মতের পক্ষে তিনি নিম্নরূপ দুটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেনঃ-

১) আনুমানিক ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে হরিদাস যখন ফুলিয়া ত্যাগ করে নীলাচলে যান, তখন কৃত্তিবাসের পৌত্র স্থানীয় সুষেণ পন্ডিত জীবিত ছিলেন, একথা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়। জয়ানন্দের উক্তি নিম্নরূপঃ-

শুনিঞা শ্রী হরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুল্যার স্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়্যা চঞ্চল।।
হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পন্ডিত।

www.pathagar.com

মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত।।
দুর্গাবর মনোহর মহা কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পন্ডিত প্রবীণ।।
কৃত্তিবাসের বংশ লতিকা নিম্নরূপঃ-

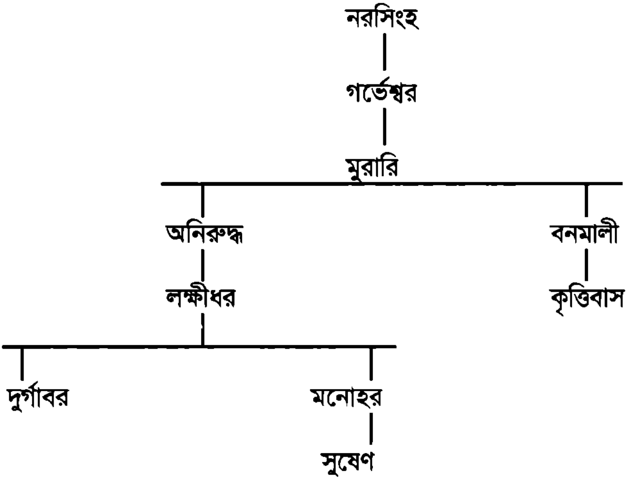

সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'পিতামহের সঙ্গে পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর। ঐ হিসাবে ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে আমরা কৃত্তিবাসকে জবিত পাই। তখন বারবাক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন।

২) সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ তাঁর সভাসদ কেদার রায়কে ত্রিহুতে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। (১৯ পৃষ্ঠা-১৯৫-৯৬)।

ডঃ আবদুল করিম বলেন, সুখময় বাবু এখানে কৃত্তিবাস সমস্যার সোজা সমাধান করেছেন। তিনি অবশ্য ঠিকই বলেছেন যে পিতামহ ও পৌত্রের সময়ের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর। এর মানে হচ্ছে যে পিতামহের ৫০ বছর বয়সে পৌত্রের জন্ম হওয়া সম্ভব। কিন্তু সুখময় বাবু লক্ষ্য করেন নি যে, উপরোক্ত উধৃতিতে জয়ানন্দ পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, হরিদাস নীলাচলে যাওয়ার সময় সুষেণ পন্ডিত প্রবীন ছিলেন। অন্ততঃ ৬০ বৎসর বয়স না হলে প্রবীণতা আসেনা সুতরাং প্রবীণ পন্ডিত সুষেণের জন্ম হয় ১৫১৬-৬০=১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে। পিতা পুত্রের বয়সের ব্যবধান ৩০ বছর ধরে নিলে সুষেণের পিতা মনোহরের জন্ম হয় ১৪৫৬-৩০=১৪২৬ খৃষ্টাব্দে। এই সূত্র অনুসারে কৃত্তিবাসের জন্মকাল ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দ বা তৎনিকটবর্তী সময়ে নির্ধারন করা যায়। (৮ পৃষ্ঠা-৭-৮)।

উপরোক্ত হিসেব মতে কৃত্তিবাসের গৌড়দরবারে হাজির হওয়ার কথা ১৩৯৬+২৩=১৪১৯ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন জালাল উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ। অথচ সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে কৃত্তিবাস বারবাক শাহের

(১৪৫৯-৭৬ খৃঃ) আদেশে রামায়ণ রচনা করেছেন। কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দাবী তথ্য ও যুক্তিদ্বারা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেনা। অবশ্য বারবাক শাহের উৎসাহে মালাধর বসু (গুনরাজ খাঁ) যে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লিখেছিলেন তা প্রমাণিত।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "কৃত্তিবাসের পৌত্র স্থানীয় সুষেণ পন্ডিত আনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল হইবে ১৫১৫-৫৬ =১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার পিতার ১৪২৫ এবং পিতামহের

১৩৯৫ খৃষ্টাব্দ, পিতামহ স্থানীয় কৃত্তিবাসের জন্মকাল ইহার নিকটবর্তী সময় হইবে। (১৭ পৃষ্ঠা-৯১)।

ডঃ শহীদুল্লাহর মতে জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩২) কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন (১১ পৃষ্ঠা ৯২/৯৩) তাঁর হিসেবে ১৩৯৯ কিংবা ১৪০০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম। সুতরাং এই সালের সাথে ১১+১২=২৩ বছর যোগ করলে হয় ১৪২২ কিংবা ১৪২৩ খৃষ্টাব্দ। আলোচ্য সময়ে জালাল উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ গৌড়ের (পান্ডুয়ার) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস তাঁরই দরবারে গিয়েছিলেন। এটি একটি সহজ সমাধান।

কিন্তু আসলে কৃত্তিবাস কোন্ গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর উদ্ধার করতে হলে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ে উল্লেখিত 'বেদানুজ' এবং 'প্রমাদ' শব্দের সঠিক তাৎপর্য উদ্ধার করা অপরিহার্য। বেদানুজ বা দনুজ সমস্যা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই বেদানুজ বা দনুজ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য গ্রহণ যোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডঃ আবদুল করিম বলেন, এখন দেখা যাক বঙ্গদেশে (পূর্ব বাংলায়) মুসলমান আক্রমণের 'প্রমাদ' কখন দেখা দেয়। মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরীতে জানা যায় যে, সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইওজ খিলজী (পূর্ব নাম হুসামুদ্দিন ইওজ খিলজী-১২১২-১২২৭) ১২২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে সর্ব প্রথম পূর্ব বাংলা (বঙ্গ) আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারেননি। কারণ ওদিকে দিল্লীর সুলতান কর্তৃক তাঁর রাজধানী লখনৌতি আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি রাজধানী রক্ষার্থে অগ্রসর হন এবং সেখানে যুদ্ধে নিহত হন। (২০ পৃষ্ঠা-৭৫-১০ এর পৃষ্ঠা ৩৫)।

এরপর দিল্লীর সুলতানদের দূর্বলতা এবং লখনৌতির গভর্ণরদের মধ্যে গৃহ বিবাদের ফলে অনেকদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা বঙ্গ বা পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন নি। দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের পৌত্র, লখনৌতির স্বাধীন সুলতান রুকন উদ্দীন কাইকাউস 'বঙ্গে' সংগৃহীত রাজস্বের দ্বারা সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রচলিত কোন কোন মুদ্রায় "জবরে হাজিহিল ফিজ্জতে লখনৌতি মিন খেরাজে-বঙ্গ" 'বা' "এই রৌপ্যমুদ্রা বঙ্গের (পূর্ব বাংলার) রাজস্ব দ্বারা লখনৌতি টাকশাল থেকে জারীকৃত" কথা খোদিত আছে। (২১ পৃষ্ঠা-২৫)। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, ১২৯০ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ

www.pathagar.com

এক বৎসর আগে অর্থাৎ ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে রুকন উদ্দীন কাইকাউস বঙ্গদেশ বা পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন। তারিখ-ই-ফিরুজ শাহীর উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন কর্তৃক ১২৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ আক্রমণকালে সোনারগাঁ-এ দনুজ রায় নামে একজন রাজা ছিলেন এবং বলবন দনুজ রায় এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগোর ভাষায় পলায়নপর তুঘ্রলের সন্ধান লাভের আশায় তিনি (গিয়াসুদ্দিন বলবন) বিক্রমপুরের রাজা দনুজমাধবের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। (১৬ পৃষ্ঠা-৫২-৫৩)। এই চুক্তির ফলে বলবন বাহিনীর পক্ষে পূর্ব বাংলার সর্বত্র তুঘ্রলের সন্ধান করা এবং পরে তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাসের বর্ণনা ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যায়। অতএব ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে রুকন উদ-দীন কাইকাউস কর্তৃক পূর্ব বাংলা আক্রমণকেই কৃত্তিবাস "বঙ্গদেশে প্রমাদ" বলেছেন এবং নরসিংহ ওঝা ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ ছেড়ে গঙ্গাতীরে আশ্রয় নেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "১৩০১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২ খৃষ্টাব্দে- ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগোর মতে ১৩০০-১৩২৭ খৃঃ) পূর্ববঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে। (১৭ পৃষ্ঠা-৯০)। মুদ্রার সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে রুকন উদ্দীন কাইকাউসের রাজত্বকালে পূর্ববঙ্গ বিজয় শুরু হয়। অবশ্য শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সিলেটসহ সারা পূর্ব বাংলা মুসলমানদের অধিকারে আসে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছেড়ে গঙ্গাতীরে আশ্রয় নেন। ঐ সময় নরসিংহ ওঝার বয়স কত ছিল তা, নির্ধারন করার উপায় নাই। বয়স যাই হোক না কেন, (হয়ত বয়স কিছু বেশীই হবে, কারণ তিনি রাজার পাত্র ছিলেন) তিনি যে গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় নতুনভাবে বসতি স্থাপন করেন তার প্রমাণ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের ভাষায়ঃ-

ফুলিয়া চাপিয়া হৈল ওঝার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্রেপৌত্রে বাড়-এ সন্ততি।।
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য গোবিন্দ তাহার তনয়। ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের উক্তি থেকেই বুঝা যায় যে, গঙ্গাতীরে, ফুলিয়াতে নরসিংহ ওঝার পুত্র গর্ভেশ্বরের জন্ম হয়। সুতরাং ১২৮৯ খৃষ্টাব্দের দু'এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্য গর্ভেশ্বরের জন্ম হয়। পিতা-পুত্রের ব্যবধান ৩০ বছর ধরে নিলে মুরারীর জন্ম হয় ১২৯১+৩০=১৩২১ খৃষ্টাব্দে, বনমালীর জন্ম হয় ১৩২১+৩০= ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে এবং কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৫১+৩০= ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে। এগার বছর বয়সে কৃত্তিবাসের বরেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণে গমনের কথা এবং ডঃ শহীদুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে শিক্ষা গ্রহনে ১২ বছর সময় লাগার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা সমাপনান্তে

www.pathagar.com

কৃত্তিবাসের বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। ঐ সময় অর্থাৎ ১৩৮১+২৩= ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের দরবারে যান। ঐ সময় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ পান্ডুয়ায় রাজত্ব করতেন এবং তিনিই ছিলেন গৌড়েশ্বর। এখানে গৌড়েশ্বর সমস্যা সমাধানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, 'রাজধানী পান্ডুয়ায় থাকলেও সেকালে বাংলা সাহিত্যে বাংলার সুলতানদের গৌড়েশ্বর বলা হত। রাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী বিক্রমপুরে হলেও তাঁকেও গৌড়েশ্বর বলা হত। (২২ পৃষ্ঠা-২১৮)। সমসাময়িকসূত্রে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ নিজে বিদ্ধ্যান ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষায় কবিতা (গজল) লিখতেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রন করে পাঠান। (১৫ পৃষ্ঠা-১১৭)। তাঁর দরবারে অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্তির কুফল বর্ণনা করে বিহারের বিখ্যাত সুফী মুজফফর শামস বলখী তাঁকে সাবধান করে তাঁর কাছে চিঠিও লিখেন। (২৩ পৃষ্ঠা-১০/১১)। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ এর রাজ্য শাসন নীতিতে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, সমসাময়িক উলেমা সম্প্রদায়ের নিকট তিনি অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। সুফি ধর্মগুরুদের দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এবং উলেমা সম্প্রদায়ের অনুরোধে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ পবিত্র আরব ভূমিতে বহু অর্থব্যয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জলাধার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইব্ন হুজর, আল সুখাভি, তকি আল ফাসি, কুতুবুদ্দিন হানাফী প্রমুখ লেখকগণ সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের বদান্যতার উল্লেখ করিয়াছেন।..... মক্কা এবং মদিনার মাদ্রাসাদ্বয় মাদ্রাসাৎঅল 'বাঙ্গালিয়া' নামে অভিহিত হইত।... গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ বিদ্ধান, কাব্যামোদী এবং বিদ্বজ্জনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (১৬ পৃষ্ঠা ২৯,৩০)। ....সুতরাং তাঁর পক্ষে কৃত্তিবাসের সমাদর করা অসম্ভব নয়। ....(তাই) আমি মনে করি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। (৮ পৃষ্ঠা-১০,১১ ও ১২)।

কৃত্তিবাস কিন্তু তাঁর কাব্যে (রামায়ণে) গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। কেন করেননি? এই প্রশ্রের উত্তর ডঃ করিম দিয়েছেন এভাবে-কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ না করার দুটি সম্ভাবনা আমার মনে আসছে। প্রথমত পূণ্য লাভের আশায় গায়েনরা ধর্মপুস্তক রামায়ণ পাঞ্চালী গাইত এবং শ্রোতারা শুনত। সুতরাং ধর্মকাজে 'যবন'মুসলমান সুলতানের নাম উচ্চারণ করা যায় কি ভাবে? হয়ত সে কারণেই কৃত্তিবাস নিজে গৌড়েশ্বরের নাম করেননি বা কৃত্তিবাস উল্লেখ করে থাকলেও গায়েনরা বা লিপিকাররা তা বাদ দিয়েছে।....দ্বিতীয়তঃ আজম শাহের রাজত্বকালেই হিন্দুরা ক্ষমতাবান হয়ে তাকে হত্যা করে (১৫ পৃষ্ঠা-১১৯) এবং শীঘ্রই তাঁর বংশও উৎখাত করে। তিনি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিলেও তাঁর জীবৎকালে রামায়ণ সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ওলট-পালট যখন অত্যাসন্ন, তখন কৃত্তিবাস কোন সাহসে তাঁর নাম উল্লেখ করবেন? সুতরাং এই দুই সম্ভাবনা মনে রেখে সুখময় বাবু প্রদত্ত

www.pathagar.com

সুষেণ পন্ডিতের সূত্র ও আমাদের আলোচিত বঙ্গদেশে প্রমাদ এর সূত্রের সাহায্যে নিরূপিত কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ প্রায় মিলে যাওয়ায় আমরা গিয়াস উদ-দীন আজম শাহকেই কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর বলে মনে করি। (৮ পৃষ্ঠা-১২-১৩)।

কৃত্তিবাসের রাজসভার বর্ণনা সম্পর্কেও ডঃ আবদুল করিম কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, কৃত্তিবাস প্রদত্ত রাজসভার বিবরণে কয়েকজন সভাসদের নাম ছাড়া দরবারের প্রকৃত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় রয়েছে-'রাজার ডা'নে আছে পাত্র জগদানন্দ। তার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।।' তার পর কৃত্তিবাস বলেছেন, 'বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণকে।' প্রশ্ন হয় কেদার খাঁ কার বামে এবং নারায়ণ কার ডাইনে? কেদার খাঁকে যদি রাজার বামে রাখা যায় তাহলে নারায়ণ কার ডাইনে বসান যায়? নারায়ণ কেদার খাঁর ডাইনে বসতে পারে না, কারণ কেদার খাঁর ডাইনে রাজা স্বয়ং। সুতরাং নারায়ণের জায়গা হয়না।...... অতএব মনে হয় যে, কৃত্তিবাস প্রদত্ত রাজসভার বর্ণনায় ভুল রয়েছে। দ্বিতীয়ত কৃত্তিবাস একজন পন্ডিত। সবে পাঠ শেষ করে দরবারে এসেছেন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। মন তাঁর আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান। তিনি কি করে দেখামাত্রই রাজদরবারের সভাসদদের চিনতে পারলেন? তৃতীয়ত কৃত্তিবাস কি করে রাজদরবারে প্রবেশাধিকার পেলেন? সেকালে রাজদরবারে প্রবেশাধিকার কি এতই সোজা ছিল যে, মাত্র কয়েকটি শ্লোক পাঠিয়েই দরবারে প্রবেশের অনুমতি পেলেন? চতুর্থত কৃত্তিবাস শ্লোকগুলি কার মাধ্যমে রাজার কাছে পাঠালেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন গৌড়েশ্বরের আদেশে এবং গৌড়েশ্বরের আদেশ পাওয়ার পরে। তিনি রামায়ণ রচনা করতে নিশ্চয়ই কয়েক বৎসর সময় নিয়েছিলেন। (পরবর্তীকালে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচনা করতে সাত বছর সময় নিয়ে ছিলেন)।.....সুতরাং কাব্য রচনা করতে গিয়ে কৃত্তিবাস নিশ্চয়ই কবি সুলভ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজের পান্ডিত্য এবং বংশ গৌরব জাহির করা। তাঁর গৌড়েশ্বরের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গৌড়েশ্বরও তাঁর পান্ডিত্যে মুগ্ধ, একথা দেখানো। এই জন্যে তিনি 'পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা" বলেও গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, সভাসদদের নামের উপর ভিত্তি করে কৃত্তিবাসের সময় নিরূপণের চেষ্টা সমীচীন নয়। (৮ পৃষ্ঠা ৮, ৯)।

সম্প্রতি সুখময় মুখোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন যে, কৃত্তিবাস গুরুর আজ্ঞায় রামায়ণ রচনা করেন এবং গৌড়েশ্বরের দরবারে যাওয়ার আগেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা শুরু করেন। (৯ পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯)। এই বিষয়ে আমরা ডঃ শহীদুল্লাহর মন্তব্যই সমীচীন মনে করি এবং তাঁর মন্তব্য নীচে তুলে দিচ্ছিঃ-
যে যুগে-

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"

www.pathagar.com

শ্লোক প্রসিদ্ধ ছিল এবং পরবর্তী সময়েও কৃত্তিবাসের শিরে রামায়ণ রচনার জন্য- "কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্বনেশে"-এই কটুক্তি বর্ষিত হয়েছিল, সেই যুগে রামায়ণ রচনা করিতে গুরু আজ্ঞাদান কিংবা হিন্দু রাজার আজ্ঞাদান সম্পূর্ণ অসম্ভব। কৃত্তিবাসের কলঙ্ক স্খালনের জন্য এই "গুরু আজ্ঞাদান" প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান গৌড়েশ্বরের নাম উহ্য রাখা হইয়াছে। এই কারণেই রাজাজ্ঞার কথাও লোপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। (১৭ পৃষ্ঠা-৯৬)।

ডঃ আবদুল করিম কিভাবে কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণ করেছেন এবং কেন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে রামায়ণ রচনার আদেশ দাতা বলেছেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা ডঃ করিমের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়া বলতে চাই যে, ঐতিহাসিক ডঃ আবদুল করিম নির্ধারিত কৃত্তিবাসের কাল যেমন সঠিক ঠিক তেমনি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের আদেশে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, এই সিদ্ধান্তও সঠিক।

কৃত্তিবাসের কাল এবং রামায়ণ রচনার আদেষ্টা গৌড়েশ্বর সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ডঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে আমরা বলতে চাই-"বাংলাদেশে প্রমাদ" বলতে ১২৮৯ সালে লখনৌতির সুলতান কাইকাউস কর্তৃক বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) আক্রমনকেই বোঝায় এবং সমসাময়িক খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এ (রাজধানী বিক্রমপুরেও হতে পারে) দনুজ রায় (দনুজমাধব) নামক একজন শাসক ছিলেন, এটিও ঐতিহাসিক সত্য। সুকুমার সেন, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ডঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখের যুক্তি খন্ডন করে আমাদের যুক্তি ও প্রমাণাদি আমরা ইতোপূর্বেই উপস্থাপন করেছি। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের "১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে আমরা কৃত্তিবাসকে জীবিত দেখতে পাই" মন্তব্য ও সত্য। কারন, ৮০ বছরের বেশী বয়স পর্যন্ত কৃত্তিবাসের বেঁচে থাকা অস্বাভাবিক নয়। সে হিসেবে কৃত্তিবাসের জন্ম কাল হয় ১৪৬৬-৮০= ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ। এই হিসাব ডঃ করিমের হিসেবের প্রায় কাছাকাছি।

বস্তুতঃ আমাদের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হচ্ছে-কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময়ে এবং তাঁরই আদেশে।

আমাদের উপরোক্ত সহজ সমাধান নিয়ে কেহ কেহ বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন- আক্রান্ত পূর্ববঙ্গের নরসিংহ আক্রমণকারী কাইকাউসের রাজ্য এলাকার গঙ্গাতীরে আশ্রয় নিলেন কেন? উত্তর হচ্ছে আক্রমণকারী রাজা বা সুলতান অন্যরাজ্য আক্রমণ করে আক্রান্ত রাজ্যে লুটতরাজ, বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন, কিন্তু একই সময়ে নিজ শাসিত রাজ্যে শান্তি রক্ষা করেন দৃঢ় ভাবে। দ্বিতীয়তঃ উৎপীড়িত এলাকার সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে এবং এই দ্বিতীয় কারণেই নরসিংহ নিজ গৃহ ছেড়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে গঙ্গাতীরে (ভাগীরথী) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তবে একথা ঠিক যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় এমন কি সনসা বিজয় থেকেও সহজ।

www.pathagar.com

একথা বোঝার জন্য নিম্নে কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকান্ডের একটি অংশ, "রাম নামে রত্নাকরের পাপক্ষয়" অংশ উধৃত করা হলঃ---

মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন।
মম পাপভাগী তুমি হও একজন।।
পুত্রের বচন শুনি কহিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন।।
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ, কে কহে তোমারে।
পুত্রকৃত পাপ-ভাগ লাগিবে পিতারে।।
অজ্ঞান বালক, তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা।।
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি।।
যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তোমা করিনু পালন।।
যত পাপ করিয়াছি আপনি সংসারে।
সে-সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে।।
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্রতুল্য আমি।
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি।।
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি-কারণ।।
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে।।
সত্য করি আমারে গো কহিবে জননী।
আমার পাপের ভাগী নহে কি আপনি।।
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার।।
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র, না লাগে আমায়।।
শুনিয়া মায়ের বাক্য হেঁট কৈল মাথা।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা।।
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে, সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও।।
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু, শুন গুণমণি।।
বিধাতা করিল মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী।

www.pathagar.com

অন্যপাপ নিতে পারি এ-পাপ তেয়াগি।।
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবে মম রক্ষণ-পোষণ।।
আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে।।
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি, তুমি পালিবে আমায়।।
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্মাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ-পাপ-সাগরে।।
ডুবিনু পাপেতে, মোর কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল দস্যু ভাবিয়া দুস্কৃতি।।
লোহার মুদগর নিজ-মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভুমেতে এবে অচেতন হৈয়া।।
উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে।।
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দন্ডবৎ হৈয়া।।
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপ-ভাগী কেহ নাহিক সংসারে।।
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এ সকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ।।
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে।।
শুনিয়া চলিল তবে সরোবর-পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্র জল বাষ্প হৈয়া উড়ে।।
শুষ্ক স্থলে মরে মীন মকর কুম্ভীর।
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর।।
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্র জল রহিল অন্তরে।।
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ, তরিবে কেমনে।।
কমন্ডলু-জল ছিল, দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়।।
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কাণে।
একবার রাম-নাম বল রে বদনে।।

www.pathagar.com

পাপে জড় জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে।
কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে।।
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রাম-নাম এ-মুখে কেমনে।।
ম-কার কহিলে আগে রা কহিলে শেষে।
তবে বা পাপীর মুখে রাম-নাম আসে।
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া।।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্মাকর।
মৃত মনুষ্যেরে 'মড়া' বলে সব নর।।
'মড়া' নয় 'মরা' বলি জপ অবিরাম।
তব মুখে বাহিরিবে তবে রাম-নাম।।
শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে।।
বহুক্ষণে রত্মাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে 'মরা' কাষ্ঠখান।।
'মরা মরা' বলিতে আইল রাম-নাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু পরিত্রাণ।।
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভষ্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্ব্ব-পাপ-ক্ষয়।।
রত্মাকর তুল্য পাপী তখন না ছিল।
রামনাম উচ্চারণে পাপ-মুক্ত হৈল।।
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকান্ড গাইল পন্ডিত কৃত্তিবাস।।
(৬ পৃষ্ঠা-২৩-২৪)।

অথবা ব্রহ্মা কর্তৃক রত্মাকরকে রামায়ণ রচনা করার বরদান পর্ব। যেমনঃ---

ব্রহ্মা বলে, শুনহ নারদ তপোধন।
যে কহিল, মিথ্যা নহে শিবের বচন।।
রাম-নাম ব্রহ্মা-স্থানে পেয়ে রত্মাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর।।
একনাম জপে এক স্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে।।
মাংস খেয়ে পিন্ড তার করিল সোসর।
হইল কন্টক কুশ তাহার উপর।।
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।

www.pathagar.com

বল্মীকের মধ্যে মুনি রাম-নাম ডাকে।।
ব্রহ্মার মুহূর্ত ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর।।
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক, কিন্তু রাম-নাম হয়।।
রাম-নাম শুনে মাত্র পিন্ডের ভিতর।
বুঝিল ইহার মধ্যে আছে রত্মকার।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে।
সাতদিন বৃষ্টি কর পিন্ডের উপরে।।
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল।।
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহবান।
চৈতন্য পাইয়া মুনি উঠিয়া দাঁড়ান।।
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রাম-নাম।।
ব্রহ্মা বলে, তব নাম রত্মাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম 'বাল্মীকি' হইল।।
বল্মীকেতে ছিলা যেই, তেঁই এ বিধান।
সপ্তকান্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।।
যেই রাম-নাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র।।
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
কেমনে হইবে গ্রন্থ, কেমন পুরাণ।।
কেমন কবিতা ছন্দ, আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তারে কহিছেন বাণী।।
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহবাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে।।
শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা।।
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন ভবন।
আদিকান্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।।
(৬ পৃষ্ঠা-২৪/২৫)।

তবে একথা ঠিক যে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের কৃত্তিবাস বাংলার আদি কবি না হলেও তাঁর রামায়ণ বা শ্রীরাম পাঁচালী ছিল এক সময় বাংলার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ। প্রথম না হোক, কৃত্তিবাস চৈতন্য পূর্ব যুগেরই কবি। (১ পৃষ্ঠা-৫১)।

"......বাঙ্গালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। "(১০ পৃষ্ঠা-১৩৮)।

www.pathagar.com

সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময় রামায়ণ রচিত হয়, এটি প্রমাণিত হয়েছে বিধায় রামায়ণ বাংলা ভাষায় রচিত তৃতীয় এবং মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ।

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়ে চর্তুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'বাঙালী কর্মচারীদের আগ্রহে লেখাপড়ার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হইল। আগের কালের মত একালেও প্রধানতঃ রাজসভাই সাহিত্যসংস্কৃতির পোষকতা করিতে লাগিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনচারিজন সুলতান এবং ষোড়শ শতাব্দীতেও তিনচারিজন সুলতান আর কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্তা নিজেদের সভায় বাঙ্গালী কবিকে কাব্য ও কবিতা রচনা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। (৩ পৃষ্ঠা-৬)'।

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ বর্ধমান জেলার কুলিন গ্রাম নিবাসী কবি মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন। বারবাক শাহেব পুত্র ও উত্তরাধিকারী সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-১৪৮১) ছিলেন বিদ্যেৎসাহী শাসক। বারবাক শাহ ও ইউসুফ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ সময়ে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্যের সূচনায় তিনি লিখেছেনঃ----

তেরশ পাঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।

চতুর্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন।।
বাবা ভগীরথ মাতা ইন্দুমতি।
যাহার পূণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্র মতি।।

গুণ নাহি অধম মুক্তি নাহি জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলিন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন।।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধদ্বয় অবলম্বন করে এই কাব্য রচনা করা হয়। (৪ পৃষ্ঠা-৬৮)।

মালাধর বসু লিখেছেন

"সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণুদ্বারে গোপীচিত্ত আনিলে হরিয়া।।
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন।
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন।।
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্তনে।

www.pathagar.com

গরুজন সমাধান করে কোহ্ন জনে।।
ভোজন করএ কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ্ন জন।
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবারে যায়।
তৈল দেহী কোহ্নজন গুরুজন পায়।।
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে।।
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে।

এখানে গোপাঙ্গনাগণ গান শুনিবামাত্র সব কিছু ত্যাগ করে চলল বলে বলা হয়েছে।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন, (কিন্তু) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরুপ অনুগৃহীত করেন প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলটল করিতেছে তখন-

"কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে গোপনারী।" ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন এবং তজ্জন্য যে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দ এইরূপঃ-

কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরনে নুপুর দিমু বলে কোহ্নজন।।
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখী বলে।।
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহ্নজন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন।।
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ।।
কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।
মকর কুন্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে।।
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ।
কপুর তাম্বুল সমে জোগাইব পান।।

শ্রীকৃষ্ণ এসব কিছুই চান না। তিনি বলেন,

"প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।"

ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গুঢ় চিত্ত সংযোগ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্তু।

(২৪ পৃষ্ঠা ১৭৬ থেকে ১৭৯)

www.pathagar.com

এটি বাংলা ভাষায় রচিত চতুর্থ গ্রন্থ এবং মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ।

বাংলাভাষায় সবচেয়ে পুরানো পুরাণাশ্রিত আখ্যাণ কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়। কায়স্থ মালাধর বসুর রচনা। (৫ পৃষ্ঠা-৬৯)। এটি ভাগবত ও বিষ্ণু পূরাণ অবলম্বনে লেখা। বইটি সমাপ্ত করতে সাত বছর (১৪৭৩-১৪৮০ খৃষ্টাব্দ) লেগেছিল।.....শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মধ্যে রামায়ণের গল্পও মালাধর বসু জুড়ে দিয়েছেন। (৫ পৃষ্ঠা ৫৯)।

বস্তুতঃ মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয় এর ভাষা পূর্বাপেক্ষা আরো সহজ।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় সহজ ও সুললিত রচনা। কাব্যটির খুব সমাদর হইয়াছিল। মালাধরের দুইপুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দ যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথমবার মিলিত হন, তখন মহাপ্রভু (শ্রীচৈতন্য) তাহাদের পিতার রচিত কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ অনুসারে চৈতন্য সত্যরাজ খানকে এই কথা বলিয়াছেন---

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়
তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় বাঙ্গালায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রথম কাব্য। (৩ পৃষ্ঠা ১১)।

তবে এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক ব্যাপার আছে। কারণ এই পুথিটি হচ্ছে একজন অব্রাহ্মণের রচনা। এতদিন পর্যন্ত জ্ঞান চর্চা, শিক্ষাদান ও সাহিত্য চর্চায় ছিল ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার, অব্রাহ্মণের জ্ঞান চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। সুতরাং সাহিত্য চর্চা ছিল অকল্পনীয়। মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) এই কাব্য রচনা করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেদেন। এটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিপ্লব।

হোসেনশাহী শাসনকে বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বর্নযুগ বলা হয়। এই বংশের চারজন শাসক ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ খৃষ্ঠাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। এই বংশের শাসকেরা শুধু সুশাসক ছিলেন না, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি উৎসাহিত করেছেন।

বাংলাদেশের রাজশক্তির সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল হুসেন শাহ (খৃষ্টঃ ১৪৯৮-১৫১৯) ও নুসরৎ শাহের (খৃষ্টঃ ১৫১৯-১৫৩২) আমলে। সেই রাজ শক্তি ছিল অনেকাংশে বাঙালী ভাবাপন্ন, আর দেশেও তাঁরা শান্তিস্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদের সহানুভূতিতে তখন বাংলা সাহিত্যও যথেষ্ঠ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। (৭ পৃষ্ঠা-৭০)। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতায় বিপ্রদাস রচনা করেন "মনসা বিজয়"। 'অপৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বর্ণনামূলক বড় কাব্যগুলির মধ্যে 'মনসা বিজয়' প্রাচীনতম।.....সূচনায় বিপ্রদাস তাঁর নিজের ও নিজবংশের পরিচয় দিয়ে কাব্য রচনার হেতু ও তারিখ নির্দেশ করেছেনঃ----

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কইলা উপদেশে।
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ
সেই যে ভরসা আর না জানি বিশেষ।
কবি গুরু-ধীরজনে করি পরিহার
রচিলা পদ্মার গীত শাস্ত্র-অনুসার।
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।
(অর্থাৎ ১৪১৭ শক অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ)।
(৫ পৃষ্ঠা-৬৮)।

মনসাবিজয় বাংলা ভাষায় পঞ্চম এবং মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত তৃতীয় বাংলা গ্রন্থ।

বিপ্রদাসের কাব্য অলংকৃত নয়, বর্ণনাময়। ইহাতে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় অনেক মুল্যবান তথ্য নিহিত আছে। যেমনঃ---

ছত্রিশ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর
বৈসে যত দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সভে দেবে ভক্তি অতি প্রতিঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদে
আনন্দে বাজায় বাদ্যি শঙ্খ ঘন্টা মৃদঙ্গাদি
দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে।
নিবসে যবন যত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম
সৈয়দ মোল্লা কাজী কেতাব কোরান রাজি
দুই ওক্ত করে তসলিম।
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম নমাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্যলোকে
বন্দিয়া মনসাদেবী কহে বিপ্রদাস কবি
উদ্ধারিহ ভকত সেবকে।
(৩ পৃষ্ঠা-২১-২২)।

www.pathagar.com

কাব্যের এই অংশে হোসেন শাহের শাসনকালে জনগণ যে শান্তিতে ছিল, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য ছিল তাই প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্যনীয় ব্যাপার যে, বিপ্রদাস তাঁর মনসা-বিজয় কাব্যে আরবী ও ফার্সী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। যেমন ঃ---

হাসান হুকুম পাই সাদিয়া গুলাম ধাই
যেথাই মজলিস করে কাজী।
তথা রুজু সর্বজনে লস্কর (লস্কর) পারদল সনে
সবে পাহলোয়ানী মর্দ গাজী।
কাজী, মোল্লা, খাজাগন মজলিশে সর্বজন
শুনিয়া এতেক হকীকত।

অর্থাৎ হাসানের আদেশে সাদিয়া নামক ক্রীতদাস ত্বরা করে কাজী যেখানে বসে সভা করছিলেন, সেস্থানে গেল। সেখানে সকলেই সৈন্য-সামন্ত ও অনুচরদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন ছিল। তাদের সকলেই সাহসী যোদ্ধা ছিল। কাজী, মোল্লা, খাজা ও অন্যান্যেরা সভায় উপস্থিত থেকে অবস্থার কথা শুনল। (৮ পৃষ্ঠা-৬৬)।

হোসেন শাহের এক কর্মচারী, শ্রীখন্ড নিবাসী যশোরাজ খান, বাঙ্গালায় কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের একটি ব্রজবুলি পদের ভনিতায় কবি সগৌরবে হোসেন শাহের নাম করিয়াছেন। (৩ পৃষ্ঠা-১৭)।

শ্রীযুক্ত হুসেন জগত ভূষণ
লেহি এহি রস জানে।
প্রভু গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান।
(৪ পৃষ্ঠা-১১৬/১১৭)।

এটি বাংলাভাষায় ৬ষ্ঠ ও মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত চতুর্থ গ্রন্থ।

এই শতাব্দীর শেষ দশকে মনসাদেবীর বিষয়ে আরও একটি কাব্য লেখা হয়েছিল বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন। এ হল বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল। কিন্তু এ গ্রন্থটি যে ১৪১৬ শকে (১৪৯৮-খৃষ্টাব্দে) লেখা হয়েছিল তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের আগে লেখা কোন পুঁথির দ্বারা সমর্থিত নয়।........ভাষা বেশ আধুনিক। তবে কয়েকটি ঘটনা প্রাচীন কোন আদর্শ থেকে সংগৃহীত বলে মনে হয়। বিজয় গুপ্ত পূর্ব বঙ্গের নিম্নতটের (বরিশাল অঞ্চলের) অধিবাসী ছিলেন। (৫ পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯)।

তবে মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কানা হরিদত্ত নামক জনৈক কবি রচনা করেন। কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাই তিনি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেনঃ-

মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

www.pathagar.com

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।

ভাসান গান সম্পর্কে বিজয়গুপ্ত লিখেছেনঃ-

"হেন মতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ।।
নাগরথে ছাড়ি দেবী গেল নিজ দেশ।।
স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে।
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া গোবিন্দে।।
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।
স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা।।
হরি নারায়ণে স্মরি নির্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত।।
....

অন্যত্র-

সনাতন তনয় রুক্মিনী গর্ভজাত
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ তব পদ সাত।।
(২৪ পৃষ্ঠা-১৯২,১৯৩ ও ১৯৪)।

সুতরাং মনসামঙ্গলকে বাংলা ভাষায় ৭ম গ্রন্থ বলে দাবী করা যায় না। তবে এটি মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতার পঞ্চম গ্রন্থ।

মুসলমান লেখকদের প্রভাবে বিজয় গুপ্তও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর মনসামঙ্গলে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ----

তকাই নামে মুল্লা কিতাব ভাল জানে
কাজীর মেজবান হৈলে আগে তারে আনে
কাছা খুলিয়া মুল্লা ফরমায় অনেক।

অর্থাৎ 'তকী নামে একজন মোল্লা ধর্মীয় গ্রন্থাদি ভাল জানেন। কাজী কোন ভোজের আয়োজন করলে তিনি সকলের আগে মোল্লাকে নিমন্ত্রণ করেন। মোল্লা তার পোষাকের প্রান্ত আলগা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা বলেন।"

অথবা---
কাজী বলে আরে, বেটা ভুতের গোলাম।
পীর থাকিতে কেন ভুতেরে সালাম।
কাজী বলে আহাম্মক জওয়াব দাও কেনে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ "বেটা ভুতের গোলাম কোথাকার, ধর্মীয় শিক্ষক, পীর-দরবেশ থাকতে কেন তুমি ভুতেরে ভক্তি কর? কাজী লোকটিকে আহাম্মক বলে অভিহিত করেন এবং তাকে তর্ক করতে নিষেধ করেন।" (৯ পৃষ্ঠা ৫৮/৫৯)।

হোসেন শাহের আরও দুই একজন কর্মচারী গীতি কবিতা লিখিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর 'উদ্ধব সন্দেশ" কাব্য এবং সংস্কৃত পদাবলী এইখানে থাকিতেই লেখা হইয়াছিল। (৩ পৃষ্ঠা-১৭)।

তথ্য পঞ্জী

1. Dr. A. Karim-Social History of the Muslims in Bengal (Down to AD1538), Baitussharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1988.
2. Dr. Mohammad Shahidullah-The Influence of Urdu- Hindi on Bengali Language and Literature. Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. VII Chapter-I.

৩। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

৪। দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ-প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঞ্জল ইতিহাস।-মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ কলিকাতা, ১৯৫৯ খৃঃ।

৫। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্য একাডেমীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৬৫ খৃঃ।

৬। কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ-সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৭১ খৃঃ।

৭। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপ রেখা-১ম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ,মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০ খৃঃ।

৮। ডঃ আবদুল করিম- বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। বাংলা একাডেমী। ঢাকা, ১৯৯৪, খৃঃ।

৯। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, ভারতী বুক ষ্টল কলিকাতা ১৯৫৮ খৃঃ।

১০। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ ১৯৪৮, খৃঃ।

১১। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সংস্করণ। ১৯৬৪ খৃঃ।

১২। জিয়া-উদ-দীন বরনী-তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী, মূল ফার্সি।

১৩। N. K. Bhattashali-Coins and Cronology of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge, 1922.

১৪। নগেন্দ্র নাথ বসু-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কান্ড।

১৫। J. N. Sarker (Editor) History of Bengal. Vol-II , Dhaka University, 1948 .

www.pathagar.com

১৬। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো-বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬,খৃঃ।
১৭। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্-বাঙলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ, ঢাকা, ১৩৭১।
১৮। Dr, Dinesh Chandra Sen-History of the Bengali Language and Literature, Calcutta, 1904.
১৯। সুখময় মুখোপাধ্যায়-বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৬ খৃঃ।
২০। তবকাত-ই-নাসিরী, মূল ফার্সি, লাহোর থেকে প্রকাশিত।
২১। Dr. Abdul Karim-Corpus of the Muslim Coins of Bengal, Dhaka, 1960
২২। Dr. R.C. Majumdar (Editor)-History of Bengal, Vol-I, Dhaka, 1943.
২৩। Journal of the Bihar Research Society, Vol XII, Part II, 1956.
২৪। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খন্ড)-অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১ খৃঃ।
২৫। Bengal, Past and Present, Vol. Lxvll, 1948.

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হোসেনশাহী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ব্যাপক প্রসার, পরাগলপুরে কাব্য রচনা

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আলো আঁধারী ভাষায় চর্যাগীতি রচনার পর বাংলা সাহিত্যচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীতে বড়ু চন্ডিদাশ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' রচনার মাধ্যমে এই স্তব্দতা ভঙ্গ করেন এবং চন্ডিদাসের এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ হলেও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। (চন্ডিদাসের রচনার নমুনা প্রথম অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে)।

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময়ে উত্তর বঙ্গের সামন্তরাজ গণেশ গৌড় সরকারের সামরিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্র করে ইলিয়াসশাহী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে চারবছর ধরে আজম শাহের পুত্র হামজা শাহ এবং পরে দাস শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ ও তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে ক্ষমতায় রাখেন। অতঃপর ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে গণেশ নিজেই সিংহাসন দখল করেন। ইতোমধ্যে বাংলায় মুসলিম শাসনের দু'শ বছর পূর্ণ হয়েছে বিধায় এখানে একটি শক্তিশালী মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাই মুসলিম আমীর ওমরাহরা গণেশের শাসন মেনে না নেয়ায় গণেশ বহুসংখ্যক আমীর ওমরাহ ও সুফীদরবেশকে হত্যা করে রাজ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয় এবং জৌপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা অভিযানের আমন্ত্রণ জানায়। শর্কী বাংলায় অভিযানে এগিয়ে এলে গণেশ সংকট উপলব্ধি করে ভীত হয়ে নিজপুত্র যদুকে মুসলমান বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে আপোষ করেন। শর্কী ফিরে গেলে গণেশ যদুকে পুণরায় ধর্মান্তরিত করেন। অতঃপর নিজে এবং অপর পুত্র মহেন্দ্রদেব স্বল্পকাল বাংলা শাসন করেন। কিন্তু যদু ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করেন এবং আবার মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারন করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। যদু বা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ ক্ষমতা হারা মুসলমান আমীর ওমরাহদের পূর্বমর্যাদা ফিরিয়ে দেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী পন্ডিত ব্যক্তিদের সম্মান দিতেন। .

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকেরা পুণরায় গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। এই বংশের শাসক সুলতান রুকন উদ্দিন বারবাক শাহ কবি মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। বারবাক শাহ ও তাঁরপুত্র ইউসুফ শাহের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় গুণরাজ খাঁ ১৪৭৩-১৪৮০ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনা করেন। এটি বাংলা ভাষায় রচিত চতুর্থ এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত দ্বিতীয়

www.pathagar.com

বাংলা গ্রন্থ। কারণ গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের আদেশেই কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ রচনা করেন, এই সত্য প্রমানিত বিধায় রামায়ণ বাংলা ভাষায় তৃতীয় ও মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। ('শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের রচনার নমুনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। রামায়ণের ভাষার নমুনাও একই অধ্যায়ে রয়েছে)।

অতঃপর হোসেন শাহী আমলে বাংলাদেশে একদিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় পূর্ণ শান্তি এবং স্থিতিশীলতা এবং অপর দিকে এই বংশের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় বাংলা ভাষায় ব্যাপক সাহিত্যচর্চা। হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বিপ্রদাস রচনা করেন অপৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক কাব্য মনসা বিজয়, হোসেন শাহের কর্মচারী যশোরাজ খান রচনা করেন কৃষ্ণ লীলা কাব্য, বিজয় গুপ্ত রচনা করেন 'মনসা মঙ্গলকাব্য', রূপ গোস্বামী রচনা করেন উদ্ধব সন্দেশ কাব্য।

সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করেছেন তার প্রমাণ মেলে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে, বিপ্রদাসের কাব্যে, শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের গৌরীমঙ্গলে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মহাভারতে, যশোরাজ খানের কবিতায়।

বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ। তিনি লিখেছেন,

যেই মতে পদ্মাবতী করিল সম্বিধান।
সেই মতে করে সব গীতের নির্মাণ।।
ঋতু শশী (শূন্য) বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।।
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেবাদ বাঙ্গরোড়া তকসীম।।
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পন্ডিত নগর।।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়।।
(১৩ পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭০)।

ফতেয়াবাদ মুল্লুকস্থ ঘাগরা ও ঘন্টেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির জন্ম। ফুল্লশ্রী বর্তমান বরিশাল জেলার গৈলাগ্রামের একটি পল্লী।.....ঋতু শশী বেদ শশী দ্বারা ১৪৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই তারিখ মেনে নিলে বলতে হয় কবি (বিজয় গুপ্ত) আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম দিকে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।... কবি হোসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক', 'সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা' ' নিজ বাহু বলে শাসিল পৃথিবী' এবং 'রাজার পালনে প্রজা সুখ ভূঞ্জে নিত' রূপে প্রশংসা করেছেন। (১৪ পৃষ্ঠা-১৬)।

www.pathagar.com

কিন্তু কোন কোন পন্ডিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (পদ্মপুরাণ) এর রচনাকাল নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ সুকুমার সেন এবং অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতামত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গিক।

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অষ্টাদশ শতকের (খৃষ্টীয়) আগে রচিত হয় নি। কারণ বইটি প্রাচীন মাল-মশলা নিয়ে আধুনিককালে নির্মিত। তিনি মনে করেন যে, কালজ্ঞাপক ভনিতাটি প্রক্ষিপ্ত। (১৫ পৃষ্ঠা-১৮৮-৮৯)।"...... অনেকের ধারণা আছে যে, বিজয় গুপ্তের কাব্যটি পুরানো রচনা।... তাঁহার জীবৎকাল কখন, সে সম্বন্ধে ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। আধুনিক জনশ্রুতি অনুসারে বরিশাল জেলার মধ্যে অবস্থিত ফুল্লশ্রী গ্রামের এক বৈদ্যঘরে বিজয় গুপ্তের জন্ম হইয়াছিল।..... কোন এক শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা-পঞ্চমীর রাত্রে কবি স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী মনসা তাঁহাকে মনসামঙ্গল পাঁচালী রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে কাব্যটি রচিত হয়।" (১৬ পৃষ্ঠা-২১)।

ডঃ সেন বিজয় গুপ্তের কাল নির্ধারণ করেন নি। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বিজয় গুপ্ত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯) নয়, জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের সময়ে (১৪৮১-৮৬) ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ঋতু শূন্য বেদ শশী, ঋতু শশী বেদ শশী নয়, পাঠ সমীচীন মনে করেন। এই ঋতু শূন্য বেদ শশী হয় ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ফতেহ শাহ হোসেন শাহ নামে জনপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং বিজয় গুপ্ত বর্ণিত হোসেন শাহ এবং জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ অভিন্ন ব্যক্তি। (১৭ পৃষ্ঠা-১১৬-১১৮)।

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের উপরোক্ত যুক্তির উৎস নিম্নরূপঃ ফতেহ শাহের কিছু সংখ্যক মুদ্রায় "মজ্জুদা-ল্লাহ্-ল-ফতেহ,"। "আল হোসেন শাহী" এবং "সৈয়দ শাহী" কথাগুলি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ সর্বপ্রথম "আল হোসেন শাহী" কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩২-১৫৩৮খৃঃ) "বদরশাহী" মুদ্রায় যেমন তাঁর জনপ্রিয় নাম আবদুল বদরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি ফতেহ শাহের "আল হোসেন শাহী" মুদ্রায় ফতেহ শাহের জনপ্রিয় নাম হোসেন শাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলতে 'গেলে ফতেহ শাহের জনপ্রিয় নাম বা সিংহাসন প্রাপ্তির আগের নাম ছিল হোসেন শাহ। (১৮ পৃষ্ঠা ১৩৬)। অধ্যাপক আলী আহমদ বাহরাম খান রচিত 'ইমাম বিজয়' কাব্য সম্পাদনা করতে গিয়ে বাংলা কাব্যের হোসেন শাহ ও ফতেহ শাহকে অভিন্ন মনে করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন যে, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যেখানে হোসেন শাহের কীর্তি গাওয়া হয়েছে, সেই সকল কীর্তি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামে আরোপিত না হয়ে জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের নামে আরোপিত হওয়া উচিৎ। (১৭ পৃষ্ঠা-১১৬-১১৮)।

www.pathagar.com

ডঃ আবদুল করিম বলেন, উপর্যুক্ত পন্ডিতেরা শুধু "আল-হোসেন শাহী" কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, অন্য দুইটি কথা অর্থাৎ "মজ্জদা-ল্লাহু-ল-ফতেহ" এবং "সৈয়দ শাহী" কথার কোন ব্যাখ্যা দেন নি। 'হোসেন শাহী' যদি জনপ্রিয় নামের ইঙ্গিত দেয়, তাহলে "সৈয়দ শাহীও জনপ্রিয় নামের ইঙ্গিত করতে পারে। অবশ্য এখানে "মজ্জদা-ল্লাহু-ল-ফতেহ" কথাটি বাদ দিলাম। কারণ ইহা নাম বলে মনে হয় না। তাহলে বলতে হয় ফতেহ শাহের একাধিক জনপ্রিয় নাম ছিল। ইহা অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক। মুসলমান সুলতানেরা সিংহাসন অধিকারের পরে একটি রাজকীয় নাম গ্রহণ করতেন, কিন্তু প্রায় সময় রাজকীয় নামের সঙ্গে পূর্ব নাম (বা জনপ্রিয় নাম) মিলিয়ে নিতেন। যেমন, ইলতুৎমিশ সিংহাসন আরোহণ করে শামসুদ্দিন রাজকীয় নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্ব নাম ইলতুৎমিশও যোগ করেন। অনুরূপ ভাবে বলবন, গিয়াসুদ্দিন বলবন, ইওজ, গিয়াসুদ্দিন ইওজ, ইলিয়াস, শামসুদ্দিন ইলিয়াস, বারবাক, রুকনুদ্দিন বারবাক ইত্যাদি নাম গ্রহণ করেন। এই হিসাবে বলতে গেলে ফতেহ শাহের পূর্ব নাম (বা জনপ্রিয় নাম) ফতেহ ছিল এবং রাজকীয় নাম হয় জালালুদ্দিন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ নাম গ্রহণ করেন। সুতরাং "হোসেন" ফতেহ শাহের জনপ্রিয় (বা পূর্ব) নাম কিনা সন্দেহের ব্যাপারে। তাছাড়া হোসেন' কে ফতেহ শাহের জনপ্রিয় নাম বলার আগে দুইটি কথা যথা "সৈয়দ শাহী" এবং "মজ্জদা-ল্লাহু-ল-ফতেহ" এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। (১৪ পৃষ্ঠা-১৭-১৮)।

সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক অমাত্যের সহযোগিতায় একটি দল গঠন করেন এবং তাঁদের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন দখল করেন; (১৯ পৃষ্ঠা-২৭৩)। তাঁর দলে কে কে যোগদান করেন তার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সমসাময়িক শিলালিপি পরীক্ষা করলে খান মুয়াজ্জম আশরাফ খান এবং সৈয়দ রাহতের পুত্র সৈয়দ আজম ও সৈয়দ দস্তুর নামক দুজন আমাত্যের নাম পাওয়া যায়। (২০ পৃষ্ঠা-১৯৬-২১২)। তাহা ছাড়া সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বাল্য জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সিংহাসন লাভের অনেক পূর্ব থেকে বাংলার রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। (২১ পৃষ্ঠা -১৩৩-১৩৯)। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি, বেরস বলেন যে, পর্তুগীজরা চট্টগ্রামে আসার একশত বছর আগে একজন আরব বণিক দুইশত জন লোকসহ এডেন বন্দর থেকে চট্টগ্রাম আসেন। পরে তিনি ব্যবসা চালাবার নামে আরও তিনশত জন লোক নিয়ে আসেন। এই বণিক পরে গৌড়ের সুলতানের সাথে পরিচিত হন এবং উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গৌড়ের সুলতানকে সাহায্য করেন। এই আরব বণিকই পরে গৌড়ের সুলতানকে হত্যা করে নিজে সিংহাসন দখল করেন। (২২ পৃষ্ঠা-২৮৭)।

ফতেহশাহ বাংলার সুলতানের পুত্র বা উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেছিলেন। এই দখল কাজে সৈয়দ আল হোসাইনীর পুত্র আলাউদ্দিন হোসেনের ভূমিকা ছিল। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেছেন,

www.pathagar.com

সোলতান হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িত ছিলেন ইহা ঠিক এবং তিনি যে জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ এর পক্ষাবলম্বী ছিলেন ইহাও ঠিক। (২৩ পৃষ্ঠা-১৮৪)। তাই তিনি মুদ্রায় সৈয়দ পরিবারের সদস্যদের সন্তুষ্টির জন্য 'সৈয়দ শাহী' এবং 'হোসেন শাহী' উৎকীর্ণ করেছিলেন বলে ধারণা করা সঙ্গত। কারন ফতেহ শাহ যেসব আমীর নিয়ে দল গঠন করেছিলেন হোসেন শাহ ছিলেন তাদের অন্যতম এবং তাঁর বংশ ছিল সৈয়দ বংশ।

ডঃ আবদুল করিম বলেন, মুদ্রায় মজ্জদ্দা-ল্লাহু-ল-ফতেহ এর অর্থ আল্লাহ তাঁহাকে (ফতেহ শাহকে) জয়যুক্ত করুক। ইহা দ্বারা ফতেহ শাহের রাজ্যলাভে বিপর্যয়েরই ইঙ্গিত বোঝায়। সুতরাং 'হোসেন' ফতেহ শাহের জনপ্রিয় নাম, এই কথা সঠিক নয়। তাই এই সূত্রের উপর নির্ভর করে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের "ঋতু শশী বেদ শশী এর স্থলে "ঋতু শূন্য বেদ শশী" পাঠগ্রহণ যুক্তি সম্মত নয়। (১৪ পৃষ্ঠা-১৯)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় আরো বলেছেন, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যদি ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দেই রচিত হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে-আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাহলে বিজয় গুপ্ত রাজা হিসাবে হোসেন সাহার যে প্রশংসা করেছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন রাজা এতখানি যোগ্যতার পরিচয় দেবেন এবং সুদুর ফতেহাবাদ অঞ্চলে সে কথা ছড়িয়ে পড়বে বলে ভাবা যায় না। কিন্তু বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করে থাকলে এই প্রশ্ন ওঠেনা, কারণ জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ তার কয়েক বছর আগে থাকতেই (১৪৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের সব অঞ্চলের লোকেরাই ইতিমধ্যে (ইতোমধ্যে) তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন। এ থেকেও বলা যায় বিজয় গুপ্ত কর্তৃক উল্লিখিত হোসেন সাহা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নন, জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ। সুতরাং বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যে ১৪৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দেই রচিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (১১ পৃষ্ঠা-৩)।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ৮৯৯ হিজরিতে অর্থাৎ ১৪৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে ফতেহাবাদ (বিজয় গুপ্তের ফতেয়াবাদ) টাকশাল থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। (২৪ পৃষ্ঠা-১১১)।

সুতরাং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শৌর্যবীর্যের কাহিনী ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচারিত হয় এবং তাই বিজয় গুপ্তের পক্ষে হোসেন শাহের প্রশংসা করা সম্ভব হয়। 'নৃপতি তিলক' অবশ্যই কবির কল্পনায়; হোসেন শাহের মতো শক্তিধর রাজা না হলেও কবির কল্পনায় সব রাজাই 'নৃপতি তিলক'। সেই যুগে কবির কল্পনায় জমিদারকে রাজা মহারাজায় পরিণত করার রেওয়াজ দেখা যায়।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সুখময় বাবুর সিদ্ধান্ত নির্ভুল নয় এবং বিজয় গুপ্ত বর্ণিত হোসেন শাহকে জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের সংগে অভিন্ন মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যদি প্রাচীনই হয় তাহা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্ব কালে ১৪৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। (১৪ পৃষ্ঠা-১৯-২০)।

আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং বিজয়গুপ্ত সম্পর্কে ডঃ আবদুল করিমের মতামতই ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে যে হোসেন শাহের প্রসংশা করেছেন তিনি সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

এখানে আমাদের কিছু সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন এবং চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। একথা প্রায় সকল পন্ডিতই স্বীকার করেন।

কিন্তু তা সত্তেও সুখময় মুখোপাধ্যায় বিজয় গুপ্তের কাল নির্ধারণ করতে গিয়ে হোসেন শাহকে সাম্প্রদায়িক এবং ফতেহশাহকে অসাম্প্রদায়িক রূপে চিহ্নিত করেছেন। এ কারণেই তিনি বিজয় গুপ্তের প্রশংসাকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহরে প্রশংসা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের ১৮২ পৃষ্ঠায় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, (এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) একই ব্যক্তি সম্পর্কে (আলাউদ্দিন হোসেন শাহ) বর্তমান সিদ্ধান্ত তার পরিপন্থী।

বিপ্রদাস পিপলাই এবং তাঁর রচনা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিপ্রদাসের লেখায় হোসেন শাহের প্রশংসা রয়েছে। প্রশংসিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টার।

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেনীর নিকটবর্তী বালান্ডা গ্রামের কবি কবিচন্দ্র শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র লিখেছেন গৌরীমঙ্গল (চন্ডীমঙ্গল) কাব্য। শঙ্করকিঙ্কর লিখেছেন,

পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম।
নৃপতি হুসেন সাহা কলিযুগে রাম।।
খাণ্ডাএ প্রচন্ড রাজা প্রতাপে তপন।
জার ভয়ে কম্পিত সকল নৃপগণ।।
গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম মহাপূন্যস্থান।
ত্রিবেনীর তীরে সপ্তঋষির বিশ্রাম।।
তথা সপ্ত মুনি তপ কৈল সুখে।

www.pathagar.com

তে কারণে সপ্তগ্রাম বলে লোক মুখে।।
সেই সপ্তগ্রাম মধ্যে বালান্ডা নামে পুরী।
পূর্ব্বে জার যমুনা পশ্চিমে সুরেশ্বরী।।
উত্তরেত চক্রতীর্থ নাম পূণ্যস্থান।
দেব চক্রপাণি তথা নিত্য অধিষ্ঠান।।
দক্ষিণে পবিত্র জল নাম বিদ্যাধরী।
জার জল পরসিলে সকল পাপে তরি।।
অনেক পন্ডিত (ত) থা অনেক মহাজন।
কূলে শীলে তপের নিধান দ্বিজগণ।।
সবর্ব শাস্ত্রে পন্ডিত নৃপতি পূজিত।
ক্ষেত্রি বৈদ্য বৈসে অতি সুচারী বৈশ্য।।
শূদ্রগণ বৈসে দ্বিজসেবাএ তৎপর।
নৃপতিগণ হিতকারী সুবুদ্ধিসাগর।।
তথা গুণিজন সভে করিয়া সমাজ।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনিএগা বলিলে কাজ।।
গন্ধ মাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান।
সভে মিলিআ বলিলেন পাঁচালি বিধান।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল।
তোমার মহিমা যেন ভ্রমে মহীতল।।
ভকতি করিয়া যেন সর্ব্বলোকে পূজে।
পুরাণবচন যেন সর্ব্বলোকে বুঝে।।

এরপর কবি 'গৌরীমঙ্গল'এর রচনাকাল জানিয়েছেন, সেটি পুথির বানানে এই-

নব সসি ষুর ইন্দ্র সক পরিমিত।
কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চন্ডির চরিত।।

বানান শুদ্ধ করলে- নব শশী সুর ইন্দ্র শক পরিমিত।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।।

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৪১৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে গৌরিমঙ্গল রচিত। তৎকালীন রাজা হিসেবে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই কালনির্ণয় সঠিক। (১১ পৃষ্ঠা-৯,১০ ও ১১)। রচনাকাল বাচক শ্লোকে কবি তাঁর কাব্যকে বলেছেন- "চন্ডীর চরিত।" একটি ভনিতাতেও কবি বলেছেন,

চন্ডীর চরিত্র কিছু কবিচন্দ্র ভনে।
ভকতি রহুক হরগৌরির চরণে।।
(২৫ পৃষ্ঠা-৪৮)

www.pathagar.com

এর থেকে বোঝা যায় যে, এই কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'গৌরীমঙ্গল' হলেও এটি আসলে চন্ডীমঙ্গল কাব্য।.....বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে কবিচন্দ্র মিশ্রের গৌরীমঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ পুথি আছে। জনৈক পরমেশ্বর দাসের আদেশে এই কাব্য রচিত হয় বলে ঐ পুথিতে লেখা আছে।..... পুথিতে প্রায় সব ভণিতাতেই পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লিখিত রয়েছে। ডঃ পঞ্চানন মন্ডলের মতে এই পুথিটি কবিচন্দ্র শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের গৌরীমঙ্গল-এরই একটি পুথি। (১১ পৃষ্ঠা-১১/১২)।

ডঃ আহমদ শরীফ মনে করেন যে, এই পরমেশ্বর দাস এবং মহাভারতকার কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস অভিন্ন। (২৬ পৃষ্ঠা-৩৫৫)। আমরা তাঁর মতকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। (১১ পৃষ্ঠা-১২)।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের হোসেন শাহের প্রশংসা তাঁর মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস চট্টগ্রামে বসে মহাভারত লিখেছিলেন এবং তিনি চট্টগ্রামের লোক- এই ধারণাই ইতোপূর্বে সকলে পোষণ করতেন। কিন্তু সম্প্রতি ডঃ আহমদ শরীফ প্রমান করেছেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের বাড়ী ছিল পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী বালাণ্ডায় এবং তিনি কবিচন্দ্র শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক 'গৌরীমঙ্গল' রচনার আজ্ঞাত্তদাতা পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে অভিন্ন। ডঃ শরীফ বলেছেন, "গৌরী মঙ্গলোক্ত পরমেশ্বর দাস ও চট্টগ্রামের পরাগলী মহাভারত' রচয়িতা কবীন্দ্র পরশ্বের দাস.... উভয়েই হোসেন শাহের সমসাসময়িক ব্যক্তি। সপ্তগ্রামে অঞ্চলের বালান্ডা গাঁয়ে রচিত কবিচন্দ্র মিশ্রের গৌরীমঙ্গলের চট্টগ্রামে অনুলিখিত পান্ডুলিপিতে (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথি, লিপিকাল ১১৯৬ মঘী সন) পরমেশ্বর দাসের নাম মেলে।...... যে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয় বা শাস্ত্র সংপৃক্ত না হলে দেশের এক প্রান্তের পুথি অন্যপ্রান্তে পৌছাত না, সে যুগে বালান্ডার ও চট্টগ্রামের পরমেশ্বর দাস অভিন্ন ব্যক্তি না হলে গৌরীমঙ্গল চট্টগ্রামে প্রচারিত হত বলে মনে হয় না। (২৬ পৃষ্ঠা-৩৫৫)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ডঃ আহমদ শরীফের যুক্তি শুধু যে অখন্ডনীয় তা'ই নয়, তা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যকে সুনিশ্চিতভাবে উদঘাটন করেছে।

গৌরী মঙ্গলের রচনা চলার সময়েই পরমেশ্বর দাস হোসেন শাহের সরকারে চাকুরী পান এবং কিছুদিন সপ্তগ্রামে চাকুরী করার পর চট্টগ্রামে বদলী হন বলে মনে হতে পারে। তবে পরমেশ্বরের মহাভারতের উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত পুথি গুলিতে হোসেন শাহের এবং মহাভারত রচনায় পরাগলের আজ্ঞার উল্লেখ আছে-চট্টগ্রামের উল্লেখ নেই। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করছি যে, পরমেশ্বর প্রথমে উত্তর বঙ্গে হোসেন শাহের রাজধানীতেই বদলী হন। সেখানেই তিনি পরাগলের সান্নিধ্য পান ও তাঁর নির্দেশে মহাভারত লেখেন। অতঃপর পরাগল ও পরমেশ্বর উভয়েই চট্টগ্রাম বদলী হন এবং পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে চট্টগ্রাম সম্পর্কিত অংশ গুলি সন্নিবেশ করেন। কারণ পরাগলের বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এবং তিনি চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা রাস্তি খানের পুত্র।.... পরমেশ্বর আসলে পরাগলের

www.pathagar.com

সভাকবি ছিলেন না, ছিলেন সহকর্মী।...পরমেশ্বর দাশের সহজাত কবিত্ব শক্তি ছিল, তাই তাঁকে পরাগল 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়ে বাংলা মহাভারত লেখার ভার দেন। (১১ পৃষ্ঠা-২০-২১)।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বালান্ডার পরমেশ্বর দাস ও চট্টগ্রামের (পরাগলপুরের) পরমেশ্বর দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং মহাভারতের (পরাগলী মহাভারত) রচয়িতা, এই সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু পরমেশ্বর দাস পরাগলের সহকর্মী ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত সঠিক ও যৌক্তিক নয়। কারণ সহকর্মীকে কবীন্দ্র উপাধিদান এবং মহাভারত রচনার উপদেশ দান যৌক্তিক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সহকর্মী হলে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস 'তাহার আদেশ মাল্য মস্তকে করিয়া কবিন্দ্রকহিল কথা পাঁচালী রচিয়া, মন্তব্য করতেন না। বিশেষ গুণের জন্যে প্রশংসা করলেও প্রশংসা নতী স্বীকারের মতো প্রশংসা হত না, তবে অধঃস্তন হলে ভিন্ন কথা।

যশোরাজ খান লিখেছেন-

শ্রীযুত হুসন জগৎ ভূষণ
সৌই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান।

(১১ পৃষ্ঠা-২৭/পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী থেকে উদ্ধৃত।)

হোসেন শাহী বংশের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় চৈতন্য সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে সাহিত্য চর্চায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররা এগিয়ে আসার সুযোগ লাভ করেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় সর্বশ্রেণী ও স্তরের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। (চৈতন্য সাহিত্য সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

হোসেন শাহী আমলে এই বংশের অধীন সামন্ত শাসকেরাও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দানে এগিয়ে আসেন। হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় পরাগলপুরের সামন্ত শাসক বা জায়গীরদার পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র ছুটিখানের উৎসাহে মীরসরাই থানার পরাগলপুর হয়ে উঠে বাংলা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পরাগলপুরে যে সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়, চট্টগ্রামে তা পরিবর্ধিত হয় এবং আরাকান রাজসভায় তা, পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই আজ একথা দাবী করা যায় যে, পরাগলপুরই ছিল মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূতিকাগার, চট্টগ্রাম পরিস্ফুটন ক্ষেত্র আর আরাকান পরিবর্ধন তথা পরিপূর্ণতা প্রদান কেন্দ্র। বস্তুতঃ মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই গৌড় থেকে পরাগলপুর হয়ে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে আরাকানে বিচরণ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও লেখকেরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্থপতির ভূমিকা পালন করে গেছেন।

www.pathagar.com

হেসেন শাহের আমলে 'মুসলমান সভাসদেরাও পিছাইয়া রহিলেন না। হোসেন শাহার এক সেনাপতি (লস্কর) ত্রিপুরা জয় করিয়া চাটিগ্রাম অঞ্চলে জাগীর পাইয়া শাসনকর্তারূপে বসতি করেন। ইঁহার নাম পরাগল খান। ইনি নিজের সভাকবি 'কবীন্দ্র' পরমেশ্বরের দ্বারা বাঙ্গালায় ভারত পাঞ্চালী অর্থাৎ মহাভারত কাব্য রচনা করাইয়া ছিলেন। কাব্যটির নাম 'পান্ডব বিজয়'। লস্কর পরাগল খান মহাভারত-কাহিনীর এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে, কবীন্দ্রের কাব্য তাঁহার সভায় প্রত্যহ পড়া হইত।....... (১ পৃষ্ঠা-১৭)।

কুরু পান্ডবের কাহিনী নিয়ে বাংলায় যে আখ্যান কাব্যগুলি লেখা হয়েছে তার লেখকদের মধ্যে প্রাচীনতম ছিলেন পরমেশ্বর দাস। ভনিতায় রচয়িতার নামের সঙ্গে 'কবীন্দ্র' উপাধি যুক্ত দেখা যায়। ইনি হোসেন শাহার এক সেনাধ্যক্ষ চট্টগ্রামের শাসন কর্তা পরাগল খানের সভাকবি ছিলেন। পরাগল কুরুপান্ডবের সংগ্রাম কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন। তাঁর অনুরোধেই পরেমশ্বর দাস মহাভারতের কাহিনী বাংলা ছন্দে বিবৃত করেন। পরমেশ্বরের ভারত কথা জনপ্রিয় হয়েছিল। (২ পৃষ্ঠা-৬৯)। "..........এইটিই বাঙ্গালায় লেখা সর্ব প্রাচীন মহাভারত কাব্য। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল।" (১ পৃষ্ঠা-১৭)। "......কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পান্ডর বিজয়' বাঙ্গালা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রাচীন মহাভারত পাঞ্চালী।" (ঐ পৃষ্ঠ-৫৮)।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে হোসেন শাহী আমলের উত্তর চট্টগ্রামের শাসক লস্কর পরাগল খানের নাম বাংলা সহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মূল মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। (৩ পৃষ্ঠা, ৫৬৭)। কি অবস্থায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর কাজ শুরু করেন তা ভনিতায় বলেনঃ-

লস্কর পরাগল খান শুনন্ত কাহিনী।
যেনমতে 'পান্ডবে হারাইল রাজধানী।।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেনমতে ধর্ম রইল বনের ভিতর।।
বৎসরেক আছিলেন্ত অজ্ঞাত বসতি।
কেনমতে তারা সবে পাইল বসুমতি।।
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।।
তাঁহার আদেশ মাল্য মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিয়া।।

....
লস্কর পরাগল খান অগ্নিশিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিলা বিচারি।
হিন্দু মুসলমান:তাএ ঘরে ঘরে পড়ে।

www.pathagar.com

(৩ পৃষ্ঠা-৫৬৮)। সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৪০, এর ২৫৮-২৫৯ পৃষ্ঠায় উধৃত)।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস মহাভারতে লিখেছেনঃ-

নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়ে যার পরম সুখ্যাতি।।
অস্ত্র শাস্ত্রে সুপন্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হয় যেন কৃষ্ণ অবতার।।
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর।।
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি।।
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হইয়া।।
পুত্রে পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি।।
(১১ পৃষ্ঠা-৩২৭/৩২৮)।

কবীন্দ্র আরো লিখেছেনঃ-

সুলতান হোসেন সাহা পঞ্চগৌড়নাথ।
ত্রিপুরার দ্বার সমর্পিল যার হাথ।।
(১২ অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৬৪)।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত "এ কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মহাভারতের নিম্নোক্ত অংশগুলো উধৃত করা হয়েছে, যাতে হোসেন শাহারও প্রশংসা করা হয়েছে। কবীন্দ্র লিখেছেনঃ-

কলিযুগে অবতার গুণের আধার।
পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার।।
সুলতান আলাপদিন প্রভু গৌড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার।।
রাঙ্গা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া।
শয়নে পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া।
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহো অনাথের গতি।
লস্কর পরাগল খান শুনন্ত-কাহিনী।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী।।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।

www.pathagar.com

কেন মতে ধৰ্ম্ম রইল বনের ভিতর।
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পাই পাঁচালী রচিয়া।।
তাহার আদেশ মাত্র মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিয়া।।....

প্রত্যেক পর্বের শেষে এইরূপ ভনিতা আছে ঃ-

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার।।
বৈশাম্পায়নে কহে কথা জন্মেজয় শুনে।
কবীন্দ্র কহিল তাক পরাগল স্থানে।।

সভাপর্বের এক স্থানে আছে-

শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খানে।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে পিতার কারণে।।
কি কারণে দুর্যোধন ইচ্ছিল মরণে।
কি কারণে কুমন্ত্রণা কৈল রাজাগণে।।
কবীন্দ্র কহিল শুন খান মহামতি।।

ঐ পর্বের শেষ ভনিতায়ঃ-

বিজয় পাণ্ডব নাম পূণ্য কথা অনুপাম
অমৃত বরিষে সর্ব্বক্ষণ।
শুনিলে অধৰ্ম্ম ক্ষয় সংগ্রামত হয় জয়
আয়ুযশ বাড়ে ততক্ষণ
লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণ সমান
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্যানিত্য।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র কহিল তাতে
সভাপর্ব কৈল বিরচিত।....

(১০ এবং ১১ এর পরিশিষ্ট 'গ' এর ৩২৪, ৩২৫ ও ৩২৬ পৃষ্ঠায় উধৃত)।

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন সম্পর্কে কবীন্দ্র লিখেছেন,

তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপ ধরি।
অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী।।
দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী।।
দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরিন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলু অনুপাম।।
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল।

www.pathagar.com

সুদেষ্ণা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল।।
সত্যকহ আম্মাতে (আমাতে) কপট পরিহরি।
কি নাম তোম্মার (তোমার) কহ কাহার বরনারী।।
দুই উরু গুরু তোর অতি সুললিত।
নাভী গভীর তোমার বাক্য সুললিত।।
দশন ডালিম্ব বিজ্জুলী নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ।।
কিবা গন্ধর্বের তুম্মি (তুমি) হয়সি বনিতা।
নাগ কন্যা তুম্মি (তুমি) কিবা নগরদেবতা।।
বিদ্যাধরী কিবা তুম্মি (তুমি) কিন্নরী রোহিণী।
অনুসূয়া কিবা তুম্মি (তুমি) উর্বশী মানিনী।।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী।
তোমারূপ দেখি আম্মি (আমি)লইতে না পারি।।
দুদেষ্ণার বচন যে শুনিআ তৎপর।
সেইখানে দ্রৌপদীও দিলেন্ত উত্তর।।
আম্মি (আমি) দেবকন্যা নহি গন্ধর্বের নারী।
সহেজ সৈরন্ধ্রী আম্মি (আমি) কেশকর্ম করি।।
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল।
তোম্মাকে (তোমাকে) সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল।।
তেকারণে আঁইলু হেথা বিরাট নগর।
সত্য কথা কৈল এহি তোম্মার (তোমার) গোচর।
সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোম্মারে (তোমারে) রাখিতে আম্মি (আমি) পারি।।
নারী সব তোম্মা (তোমা) দেখি পাসরিতে নারে।
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে।।
রাজাএ দেখিলে তোম্মা (তোমা) মজিবেক মন।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন।।
আপন কন্টক আম্মি (আমি) আপনে রোপিব।
মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব।।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেনমত দেখি আম্মি (আমি) তোম্মারে (তোমারে) রাবণ।।

(২৯ পৃষ্ঠা-১৬৭/১৬৮। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পুথি, ৫৭ পত্র থেকে উধৃত)।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপন্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ গ্রন্থের পক্ষে এটা কম গৌরবের

www.pathagar.com

নহে।...দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আসিবার অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভারত হইত নহে, মূল ব্যাসের মহাভারত হইত উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেনঃ-

সুদেষ্ণোবাচ

'মাদ্ধত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশেয়া মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা।।
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্বেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্তাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহরেঃ।।
বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য য ইমে মম বেশ্মনি।
তেহপি ত্বাং স সন্নমন্তীব পুমাংসং কং ন মোহরেঃ।।
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্টা বপুরমানুষম্।।
বিহার মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা।।
অধ্যারোহেদ যথা বৃক্ষান্ বধারৈবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে শুভে অহিতং স্যাত্তথা মম।।
যথা চ কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধমহং মন্যে বাসং তব শুচিস্মিতে।।"
(২৯ পৃষ্ঠা-১৬৮-১৬৯-ফুটনোট)।

শ্রীহরির রূপ বর্ণনায় বলেছেন,

"পরিধান পিতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন।।
মেঘের বিদ্যুৎ তুল্য হসিত মুখেত।
শঙখ চক্র গদা পদ্ম এ চারি করেত।।
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ।।
(২৯ পৃষ্ঠা-১৬৮-পত্র-৪৪)।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ভীষ্মপর্ব-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ বর্ণনা করেছেন এভাবে-

"দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার।।
এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেতে লৈল চক্র দেব জনার্দ্দন।।
সুর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম।।
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।

www.pathagar.com

ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে।।
কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন।
বিদ্যুৎ সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন।।
দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন।
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ।।
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি।।
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃ শর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর।।
শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী-ভাস্কর।
কবীন্দ্র কহন্ত কথা সুনন্ত লস্কর।।
(২৯ পৃষ্ঠা-১৬৯, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পুঁথি-১০৫ পত্র)।

পরমেশ্বর দাস দেবযানির মিলন বর্ননা করেছেন এভাবেঃ-

একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি
শর্মিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা।
ঋতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ,
চলি আইল পুষ্পবন যথা।।
নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত,
কুসুমে নমিত হৈছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী,
ভ্রমর করয়ে কোলাহল।।
সানন্দিত বন দেখি, মিলয়া সকল সখি,
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে।
মলয় সুধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে যাও।
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে।।
হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি।
মৃগয়া কারণে সেই বনে।
ভ্রমিয়া কাননে চাএ, মৃগ কোথা নাহি পা এ,
কন্যা সব দেখি বিদ্যমানে।।
তার মধ্যে এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
জিনি রূপে রম্ভা উর্ব্বশী।
অধরে বাঁধুলি জ্যোতি, দশন মুকতা পাতি,
বদন জ্বলয়ে যেন শশী।।
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে,
ভ্রূযুগে কাম ধনু ধারা।

www.pathagar.com

চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি,
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা।।
শয়ন করিয়া আছে, রতিকাম অভিলাষে,
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।
শর্মিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও,
কোন সখি যোগায় তাম্বুল।।

(২৯ পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮-কবীন্দ্রের হস্ত লিখিত পুথি থেকে উধৃত)।।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১৭০০০ শ্লোকে মহাভারত রচনা করেন। (৪ পৃষ্ঠা-১৮৯/১৯০)।

এই অনুবাদের কোন কোন স্থানে কবীন্দ্র পরাগল খানকেই লেখক হিসেবে দেখিয়েছেন। যেমনঃ-

পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
(৩ পৃষ্ঠা-৫৬৮)।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর আরো বলেছেন,

লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারতে যাহার অবদান।
ধনে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী
কুতুহলে করাইলা ভারত পাঞ্চালী।
(৫ পৃষ্ঠা-২৭৩)।

বিজয় পান্ডব এবং তার পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের নাম ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের সংস্কৃত কাব্য থেকেও জানাযায়। তাতে বলা হয়েছেঃ

ভারতামৃত সিদ্ধার্থ রসং বিজয়পাণ্ডবম।
পায়ং পায়মতো নিত্যং মহাকীর্তি পরান্বিতম।।
শ্রী পরাগল খানস্য মহানুগ্রহ গৌরবাৎ।
দেশ ভাষা মেবাবাপ্য কৌতুকাদকরোৎ কবিঃ।

(৩ পৃষ্ঠা-৫৬৮- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৪০ থেকে উধৃত)।

বিজয় পাণ্ডব, ভারত কথা প্রভৃতি নামে অভিহিত এবং পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত এই মহাভারতই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক প্রাচীন মহাকাব্য। (৩ পৃষ্ঠা-৫৬৯)। "ফুলিয়ার পন্ডিত কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণের আদি কবি; তিনি প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি। বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা 'কবীন্দ্র" পরমেশ্বরও প্রাক-চৈতন্য না হোক, শ্রীচৈতন্যের সমকালীন কবি,হয়তো বা বয়সে অগ্রজও। বাঙলার এই প্রথম মহাভারত রচিত হয় পূর্ববঙ্গের পূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার সীমান্তস্থিত ফেনী নদীর

www.pathagar.com

উপকূলে। তখনো হুসেন শাহ গৌড়েশ্বর (খৃঃ ১৪৯৩-১৫১৯)। 'আর্যাবর্তের অন্যকোন প্রাদেশিক সাহিত্যে মহাভারত অবলম্বনে লেখা এত পুরানো কাব্য আর পাওয়া যায় নাই'- একথা বাঙলা-ভাষীদের স্মরনীয় এবং সে হিসাবে এ গ্রন্থও পরম আদরনীয়।

নানাকারণে অবশ্য পরবর্তী কবি' কাশীরাম দাসের মহাভারত (খৃঃ ১৬০২-১০) বাঙালী মনকে জয় করেছে। তার মধ্যে একটি কারণ কাশীরামের কবিত্ব; অন্যটি...তাঁর গ্রন্থের শ্রীরাম পুরের ছাপাখানার সহায়তা লাভ। পূর্ব বঙ্গে কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমাদর তখনো কম ছিলনা, তাঁর হাতে লেখা পুঁথিও সর্বত্র সুপ্রচলিত ছিল, এই বিংশ শতকে পর্যন্ত চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-নোয়াখালী অঞ্চলে তা সুলভ। (৬ পৃষ্ঠা-১৩৪)।

পরাগল খাঁর শাসনের সদর দপ্তর ছিল মীরসরাই থানার পরাগলপুর। পরাগলপুরে বসেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস এই মহাকাব্য রচনা করেন। 'অবিভক্ত বাংলার সকল স্থানেই পরাগলী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি এটাই প্রমান করে যে, এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। (৩ পৃষ্ঠা-৫৬৯)। বস্তুতঃ পরাগলী মহাভারত বাংলা সাহিত্যের ৬ষ্ঠ গ্রন্থ।

পরাগল খানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছুটি খানও (নসরত খান) পিতার মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরই নির্দেশে কবি শ্রীকর নন্দী সংস্কৃত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেন.

পন্ডিতে মন্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি।।
শুনন্ত ভারত তবে অতি পূণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখন্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।
দেশ ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগৎ সংসার।।
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া।।
(৩ পৃষ্ঠা-৫৭০)।

এটি ছুটিখানী মহাভারত নামে পরিচিত। এটিও পরাগলপুরে রচিত হয়। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ বাংলায় হোসেন শাহী শাসনামলে মীরসরাই থানার পরাগলপুর ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র।

ছুটি খাঁও (নসরৎ খান-শাহ নহেন) পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহিনীর লতার ন্যায় আকাশ ছুঁইতে ইচ্ছুক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি কিরূপে করিতে হয়। বিশেষরূপে জানিতেন।

www.pathagar.com

কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদসেবা করিয়াছেন। (২৯ পৃষ্ঠা-১৭০) শ্রীকর নন্দী লিখেছেনঃ-

"নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা।।
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদন্ডভেদে পালে বসুমতি।।
তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান।।
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্বত কন্দরে।।
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাঁক কি কহিব অতি।।
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত।।
ফনী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার।।
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটিখান মহাশয়।।
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র-গমন।।
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি।।
দাতা বলি কর্ণসম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা।।
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি।।
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান।।
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতী।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতি।।
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহবরে গিয়া করিল প্রবেশ।।
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ।।

www.pathagar.com

অদ্যপি অভয় না দিল খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি।।
আপনে নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে।।
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবৎ পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান।।
পন্ডিতে পন্ডিতে সভাখন্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি।।
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখন্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।
দেশী ভাষায় এহি কথা রচ পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগৎ সংসার।।
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেন পয়ার রচিয়া।।
(৩০ এবং ২৯ এর ১৭০/১৭১ পৃষ্ঠায় উধৃত।

নন্দী কবির কবিত্ব ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুকপ্রদ হইয়াছে। আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর প্রত্যুত্তর উধৃত করিতেছিঃ-

বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর।।

ভীমের উত্তরঃ-

কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল।।
তোম্মার (তোমার) উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আম্মার (আমার) উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন।।
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুম্মি (তুমি)।
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আম্মি (আমি)।।
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্বুবতী।
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী।।
তুম্মি (তুমি) নারীজিৎ না হও আম্মি (আমি) নারীজিৎ।
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত।।
(২৯ পৃষ্ঠা-১৭২)।

নন্দী লিখেছেন,

খান পরাগল সুত দানে কল্পতরু।

www.pathagar.com

পিতার দুর্ল্লভ বড় গুরুভক্তি চারু।।
চিরজীবী হউক নৃপতি ছুটি খান।
বলি কর্ণ দধিচি সমান যার দান।।
তাহার আদেশ পাঞ্জাঁ পয়ার রচিল।
জয়মুনি (জৈমিনি) পুরাণ গ্রন্থ যেরূপ দেখিল।।
শ্রীকর নন্দী কহে বিচারিঞা পোথা।
পরম রহস্য ভারতের পূণ্যকথা।।

শ্রীকর নন্দী আরো লিখেছেন-

খান পরাগল সূত রূপে গুণে অদভূত
মেদিনী মন্ডল সমসর।
বন্ধুকূল বিকাশক অবিমল কমলক
পুত্র লভে যেন শশধর।।
লস্কর ছুটি খান কর্ণসম যার দান
বলবন্ত ভীমসেন সম।
তাহার আদেশ লভি শ্রীকর নন্দী যে কবি
পোথাখন্ড কৈল অনুপাম।। (২৮)

বাংলা ভাষায় লেখা মহাভারতের মধ্যে পরাগলী মহাভারত ও ছুটিখানী মহাভারতই প্রাচীনতম।.... লেখক ব্যাস রচিত মূল মহাভারতকে অনুসরণ করলেও বাংলাদেশের নিজস্ব মহাভারত-ঐতিহ্যের প্রভাবও এর মধ্যে দেখা যায়। ....অশ্বমেধ-কাহিনী ব্যাস-রচিত মহাভারতে বর্ণিত অশ্বমেধ-কাহিনীর তুলনায় বেশী চিত্তাকর্ষক বলে বাংলা মহাভারতের রচয়িতারা এর দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। ছুটিখানী মহাভারতে কেবলমাত্র অশ্বমেধপর্বই আছে এবং তা 'জেমিনি-সংহিতা' অবলম্বনে বিস্তারিত আকারে রচিত।.....পরাগলী মহাভারতের চেয়ে পুরোনো কোন বাংলা মহাভারতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। (১১ পৃষ্ঠা ১৫ ও ২২)।

কবি শ্রীকর নন্দী সুলতান হোসেন শাহ, সুলতান নসরৎ শাহ ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটিখানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হোসেন শাহ জগতের প্রভু। তিনি তাঁর রাজ্য নিরপেক্ষতার সঙ্গে শাসন করেন। নসরৎ শাহ একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি সর্বদা রামের মত তাঁর প্রজাদের প্রতি যত্নবান।

নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদন্ডভেদে পালে বসুমতি।।
নুসরাৎ শাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা।।
(৭ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা-১৭০)।

www.pathagar.com

উত্তর ভারতের জৌনপুর অঞ্চলের কবি সুফী সাধক শেখ কুৎবন তাঁর অধবী ভাষায় লিখিত "মৃগাবতী" কাব্যে হোসেন শাহের প্রশংসা করেছেন। বিশ্ব ভারতীর হিন্দি ভবনের অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ মৃগাবতী'র রাজ প্রশস্তির একটি আদর্শ পাঠ তৈরী করেন, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন প্রয়াগ থেকে ১৮৮৫ শকাব্দে এটি মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠা থেকে প্রশস্তিটি উধৃত করা হচ্ছেঃ-

সাহ হুসেন আহ বড় রাজা।
ছত্র সিংহাসন উনকো ছাজা।।
পন্ডিত ঔ বুধিবন্ত সয়ানা।
পঢ়ে পুরান অরথ সব জানা।।
ধরম দুদিষ্টিল উন্‌হ্ কহঁ ছাজা।
হম সির ছাহ জীউ জগ রাজা।।
দান দেয় বহু গনত ন আবৈ।
বলি ঔ করন ন সরবরি পাবৈ।।
রায় জহাঁ লহি গন্ধ্রপ অহহী।
সেবা করহি বার সব চহহী।।
চতুর সুজান ভাষা সব জানৈ ঐস ন দেখৈ কোয়।
সভা সুনহু সব কান দৈ ফুনি রে বখানৈ সোয়।।
দান দৈ য়ী বহু গিনৎ ন আওয়া।
বল অউ করন না সরবর পাওয়া।
রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহঈঁ।
সেবা করহি বার সব চহহী।।
চতুর সুজন ভাখা সব জানা
ঐস ন দেখ নুঁ কোয়া।
সভা সুনো সব কান দৈ
য়ী ফিন্ দেখা নূঁ সোয়ী।।

বাংলা হচ্ছেঃ-

শাহ হুসেন বড় রাজা আছেন, যার ছত্র ও সিংহাসন সুশোভিত, (যিনি) পন্ডিত, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, বই পড়ে তার সমস্ত অর্থ (যিনি)বোঝেন। এঁকেই ধর্মে সুধিষ্ঠির বলা শোভা পায়। সংসারে (এই রাজা) আমার উপরে ছায়ার মত। ইনি বহু দান দেন, (যার) গণনা হয়না। বলি আর কর্ণও (দানে যাঁর) সমকক্ষতা পায় না। গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত রাজার গতি। সবাই (তাঁর) সেবা করে ও দ্বারে (শরণ) চায়। (ইনি) চতুর ও জ্ঞানী, সব ভাষা জানেন, এরকম কাউকে দেখা যায় না। সভাতে সবাই কান দিয়ে শোন, এরঁ মত আর (কাউকে) দেখা গেল না।

www.pathagar.com

শেখ কুৎবনের মৃগাবতী ৯০৯ হিজরীর মহরম মাসে অর্থাৎ ১৫০৩ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই সম্পূর্ণ হয়েছিল। (১২ অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৩৬, ২৩৭ ও ২৩৮)।

এই "বড় রাজা " শাহ হুসেন" যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সে সম্বন্ধে এতদিন কারও মনে কোন সংশয় ছিলনা। কারণ ঐ সময় আলাউদ্দিন হোসেন শাহই বাংলার (গৌড়ের) সুলতান ছিলেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল এই যে, উত্তর ভারতের, জৌনপুরের কবি কুৎবন তাঁর অধবী ভষায় লেখা কাব্যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের প্রশস্তি কেন করেছেন। তার একটা আনুমানিক ব্যাখ্যা কোন কোন পন্ডিত দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষাতে ব্যাখ্যাটা এই, "জৌনপুরের শেষ শর্কী বংশীয় সুলতান হোসেন শাহ দিল্লীর বাদশাহ বহলুল লোদী ও সিকান্দর লোদীর কাছে হারমানিয়া প্রথমে বিহারে, (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে, (আসলে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) পরে বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন। গৌড় সুলতান হোসেন শাহ তাঁহাকে সাদরে আশ্রয়দেন। সপরিবার ও সপরিজন হোসেন শাহ শর্কী গঙ্গাতীরে কহলগাঁয়ের কাছে বাসস্থান করিয়া শেষ জীবন এইখানেই কাটাইয়াদেন। শর্কী-সুলতানের সঙ্গে কবি গুণীও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন সুফী সাধক কবি কুতবন। (৩১ পৃষ্ঠা-৯৬)। কিন্তু সৈয়দ হাসান আসকারী এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এই "শাহ হুসেন" জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কী। (৩২ পৃষ্ঠা-৪৫৭)। নেলসন রাইটস ৯১০ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ শর্কীর মুদ্রা প্রচারের কথা বলেছেন। (৩৩ পৃষ্ঠা-২০৭)। অর্থাৎ হোসেন শাহ শর্কী অন্ততঃ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তাই অধ্যাপক মুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, কুৎবন তাঁর মৃগাবতীতে হোসেন শাহ শর্কীরই প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এ রকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে হোসেন শাহ শর্কী যে কজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে জৌনপুর থেকে বাংলায় এসেছিলেন এবং যাঁদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি প্রজাহীন অবস্থায় 'রাজত্ব' করেছিলেন ও মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন (টাকশালের নাম দিতে পারেন নি, কারণ জায়গাটা বাংলার সুলতানের অধীন; এরকম রাজ্যহীণ রাজার ভিন্ন দেশে বসে 'রাজত্ব" করার দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগেও দেখা যায়) শেখ কুৎবন তাঁদের অন্যতম। তাই কুৎবন মৃগাবতীতে তাঁর (শর্কীর) প্রশস্তি করেছেন।

মুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, কুৎবন যে 'শাহ হুসেন এর প্রশস্তি করেছেন, তিনি যে জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী, তার প্রমাণ প্রশস্তিটির মধ্যেই রয়েছে। প্রশস্তির একটি চরণে রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহঙ্গ। (গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত রাজার গতি)। গন্দর্বেরা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেই পুরাণে প্রসিদ্ধ। অতএব গন্ধর্বদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পর্যন্ত শাহ হুসেন এর গতি, এই কথার অর্থ শাহ হুসেন একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী ভারতের অমর সঙ্গীতদের অন্যতম। ডঃ আবদুল হালিমের ইন্দো-পাক সঙ্গীতের ইতিহাস থেকে উধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, হোসেন শাহ শর্কীর উপাধিই ছিল 'গন্ধর্ব' । অতএব কুৎবন উল্লিখিত শাহ হুসেন যে জৌনপুরের হোসেন শাহই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (১২ অষ্টম অধ্যায় পৃষ্ঠা-২৩৮, ২৩৯ , ২৪০)।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, শেখ কুৎবন যে হোসেন শাহের প্রশংসা করেছেন সে হোসেন শাহ্ জৌনপুরের শেষ শর্কী সুলতান হোসেন শাহ নন, গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্। আমাদের যুক্তির পক্ষে সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, "......জৌনপুরের শর্কী রাজ বংশের শেষ রাজা হোসেন শাহ শর্কী ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বাহলোল লোদীর (দিল্লীর সুলতান) সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত ও রাজ্য চ্যুত হন। এর পর তিনি বিহারে আশ্রয় নেন এবং ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে আবার একবার সিকান্দর লোদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করেন। সে চেস্টা ব্যর্থ হয এবং সিকান্দর লোদীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজ্যে এসে আশ্রয় লাভ করেন এবং ভাগলপুণের কাছে কহলগাঁও নামক স্থানে তাঁর শেষ জীবন কাটে।" (১২ অষ্টম অধ্যায় পৃষ্ঠা-২৩৬)।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুৎবন মৃগাবতী রচনা শেষ করেন ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ সময় হোসেন শাহ (শর্কী নন) গৌড়েশ্বর ছিলেন। ঐ সময় শর্কী গৌড়েশ্বরের আশ্রিত ছিলেন। সুতরাং কুৎবন গৌড়েশ্বরেরই প্রশস্তি করেছেন। কারণ সৌড়েশ্বরের জন্যেই তিনি প্রাণে মানে রক্ষা পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য হারানোর ২৪/২৫ বছর পর ক্ষমতা হারা ব্যক্তির প্রশংসার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। তৃতীয়তঃ শর্কী সুলতানের সাথে কুৎবনও বাংলায়, গৌড়েশ্বরের রাজ্যে আশ্রিত ছিলেন এবং এই রাজ্যে অবস্থানহেতু তাঁর দৈনন্দিন কাজ কর্ম, রাজ্য শাসন ও প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে গৌড়েশ্বরের প্রশংসা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

সমসাময়িক কালের একজন লেখক মুহম্মদ বুদই উর্ফ সৈয়দ মীর আলাওয়ী ফার্সী ভাষায় ধনুর্বিদ্য বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হিদায়ৎ-আল-রাসী। লেখক এই বই সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে উৎসর্গ করেছেন। (৩৪ পৃষ্ঠা-৪৮৯)। এই বই এর পুথি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে বলে সুখময় বাবু তাঁর বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর বইতে উল্লেখ করেছেন।

খওয়াজ্গী শিরওয়ানী নামে পরিচিত মুহাম্মদ বিন য়জ্দান বখশ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজধানী একডালায় বসে শাহীহ্ আল-বুখারীর তিনটি খন্ড নকল করেছিলেন এবং তাঁর এই কাজ শেষ হয়েছিল ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে। এটি বাঁকীপুরের ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে। (৩৫)। তৃতীয় খন্ডের পুথির পুষ্পিকায় হোসেন শাহের এক দীর্ঘ প্রশস্তি আছে। (১২ অষ্টম অধ্যায় পৃষ্ঠা-২৩৫)।

প্রায় সকল লেখকই গৌড়ের শাসককে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং এখন বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "....মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বপর্যন্তও বিন্ধ্যপর্ববতের উত্তরবর্তী ও প্রাগ্জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূভাগ-সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল।

www.pathagar.com

এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম ছিল 'পঞ্চগৌড়।" এই নাম গৌড় দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক।...... উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্বাংশ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত ছিল। এক রাজার শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ'-এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত।

.....(তাছাড়া) পূর্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্নভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা স্যাকসনদিগের 'ব্রেডওয়াল্ডার' ন্যায় গর্বপূর্ণ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর'-উপাধি গ্রহণ করিতেন।..... এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ।

(২৯ পৃষ্ঠা-১২৮)।

এছাড়া মিথিলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে।..........মৈথিল অক্ষর (তিরুটে অক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।..............পাঞ্চালী নামক গীত পাঞ্চালেই (কান্যকুঞ্জ বা কনোজ) উদ্ভুত।.... সারস্বতের শকাব্দ বঙ্গদেশে গৃহীত।..... প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও ওড়িয়া ভাষার অনেক শব্দের নৈকট্য দৃষ্ট হয়। (২৯ পৃষ্ঠা-২৭২-২৭৩)।

আলোচ্য পঞ্চরাজ্যের মধ্যে মধ্যযুগে প্রায় সবসময়েই গৌড় শাসকের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল বিধায় কবিগণও দৌড় শাসককে তাদের কাব্যে পঞ্চগৌড়েশ্বর আখ্যায়িত করতেন।

হোসনেশাহী শাসনের বিশিষ্ট গবেষক, অধ্যাপক মোমতাজুর রহমান তরফদার লিখেছেন, "......Even the earliest part of Husain Shah's reign seems to have made an impression upon the mind of his subjects and captured their imagination to a great extent. Bijoy Gupta, a contemprary of Alauddin Husain Shah, who composed in 1494-95 the epic of snake cult popularly know as manasa mangal, has spoken very much highly of the achievements of the Sultan......." বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক থেকে 'হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়" "পর্যন্ত উধৃত করে তিনি লিখেছেন, ... This brief description of the Hindu society tells us much about the peace and prosperity enjoyed by the Hindus under Husain Shah whose reign was marked by a spirit of tolerence and liberalism..... " (৩৬ পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)।

এই সময় সুলতান নসরত শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি দ্বিজশ্রীধর বিদ্যা সুন্দর' কাব্য রচনা করেন। (৮ পৃষ্ঠা-৮২)। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রামের কবি শ্রীধরএর বিদ্যাসুন্দর কাব্যের একটি খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করেছেন। এই কবিতায় তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নুসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ-

www.pathagar.com

নৃপতি নাসির সাহা তনয় সুন্দর।
সর্ব্বকলা-নলিনী ভোগীত মধুকর।
রাজা শ্রী পেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমান।

(৩ পৃষ্ঠা-৫৭১-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৪০ এর পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯ থেকে উধৃত)।

নসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরোজ শাহের পৃষ্টপোষকতায় কবি আফজল আলী নসিহত-নামা রচনা করেন। (৫ পৃষ্ঠা-২৫৮)।

কবি আফজল আলী এতে বলেন,

গায়েবী মর্তব্য প্রভূ তাহানে যে দিলা
গাহারীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা
গায়েবী ফকির বলি দেশ-দেশান্তর।
ভ্যাজচিজ করিল ফাজিলের পাশে নিয়া
উপহাস্য করে বুলি মুনাফিকগণ
আয়াত হাদিস লেখিয়াছি তেকারন।
খোয়াব বলিয়া শাহা রুস্তমে কহিল।
অলিগন পদে প্রনামিয়ে পুনিপুনি,
ভাবে ডুবি যেবা পড়ে ছাড়ে ফুকরানী
খোয়াব যে 'নসিহত নামা' তারনাম।
(৯ পৃষ্ঠা-৭৩/৭৫)।

হোসেন শাহী বংশের শাসক গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে শাহ মোহাম্মদ সগীর রচনা করেন বাংলা ভাষায় প্রথম রোমান্টিক কাব্য ইউসুফ-জোলেখা।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা (সপ্তম সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ খৃঃ।

২। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্য একাডেমীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৬৫ খৃঃ।

৩। Dr. Suniti Bhusan Kanungo-A History of Chittagong. Vol-I Signet Library, Chittagong, 1988.

৪। Dr. Dinesh Chandra Sen-History of Bengali Language and Literature, Calcutta 1904.

৫। ডঃ এম, এ, রহিম-বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। প্রথমখন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খৃঃ।

৬। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ মুক্তধারা-ঢাকা ১৯৮০ খৃঃ।

৭। দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। প্রথমখন্ড, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১, খৃঃ।

www.pathagar.com

৮। সাহিত্য পত্রিকা-১ম খন্ড, ১৩৬৪ সাল।

৯। ডঃ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা-১৯৫৫।

১০। গৌরীনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদক, কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশপর্ব মহাভারত।

১১। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম। বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, ভারতী বুকষ্টল, কলিকাতা , ১৯৯৩ খৃঃ।

১২। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। শান্তিনিকেতন, ১৯৮০ খৃঃ।

১২। (ক) জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত-সম্পাদক বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭।

১৩। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খন্ড, মধ্যযুগ। ঢাকা, ১৩১৭।

১৪। ডঃ আবদুল করিম-বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৫। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯১।

১৬। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম সংস্করণ ১৯৬৩।

১৭। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। ভারতী বুকষ্টল, কলিকাতা, ১৯৯৩।

১৮। Sir Jadunath Sarkar-Editor-History of Bengal Vol-II, Dhaka 1948.

১৯। ডঃ আবদুল করিম-বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল। প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৮ খৃঃ।

২০। Dr. Abdul Karim-Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal.

২১। Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol-xiv No. 2, 1969.

২২। Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol-42, Calcutta, 1873.

২৩। ডঃ সুনীতিভূষণ কানুনগো-বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯৬ খৃঃ ।

২৪। Dr. Abdul Karim -Corpus of the Muslim Coins of Bengal. Dhaka 1960.

২৫। পুঁথি পরিচয়, ৩য় খন্ড।

২৬। ডঃ আহমদ শরীফ-বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য , ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৩।

২৭। এশিয়াটিক সোসাইটির ৩৭১০ নম্বর পুথি থেকে উদ্ধৃত।

২৮। এশিয়াটিক সোসাইটির ৪১২৪ নম্বর পুথি থেকে উধৃত।

২৯। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খন্ড)-অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১,

৩০। সাহিত্য, অগ্রহায়ন, ১৩০১।

৩১। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ , ৪র্থ সংসস্কণ,কলিকাতা, ১৯৬৪.

৩২। Journal of the Bihar Research Society, 1955 .

৩৩। Catalogue of the Coins in the India Musium, Vol-II.

৩৪। Charles Rieu-Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum-Vol-II.

৩৫। Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol-V. Part I nos. 130-132.

৩৬। Indian Historical Quarterly-Vol-xxxII

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্য সাহিত্য বিকাশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হোসেন শাহ

বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার-শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব-হোসেন শাহী আমলেই (১৪৯৩-১৫১৯) ঘটিয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-১৮)। এই প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসী বাঙালীর জীবনে ও ইতিহাসে যে অপূর্ব প্রেরণা দান করে যান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা বিচার করলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে বাঙালীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে মানতেই হবে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাঙলা সাহিত্যকে এমন সৃষ্টি প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন নি। তাই একটি পঙ্‌ক্তি না লিখলেও শ্রীচৈতন্য ইংরেজ-পূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতহাসের প্রধান পুরুষ। (২ পৃষ্ঠা-৫৯)। চৈতন্যের বাল্যকালেই খৃঃ ১৪৯৩ এ হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হন। তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ রাজত্ব করেন ১৫১৯ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে এটি সর্বাপেক্ষা গৌরবের কাল। বাঙলা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহ দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। (২ পৃষ্ঠা-৬১)। সুশাসন এবং বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে হোসেন শাহী আমলকে বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। শ্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন......উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে রাজ-সরকারের কোননা কোন বিভাগে চাকুরী করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা সমাজে কিছু কিছু বিজাতীয় আচার আমদানী হইতে লাগিল।....... অনুন্নত সমাজের লোকেরা অনেকে প্রয়োজনের তাগিদে অথবা অবস্থা গতিকে মুসলমান ধর্ম আশ্রয় করিতে লাগিল। যে শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম-অনুগতি ও আচারনিষ্ঠা কঠোরতর হইতে লাগিল, তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণপন্ডিত সম্প্রদায়।.....কিন্তু ইঁহাদের উৎসাহদাতা ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চার পোষকতায় ক্রমশ অনুৎসাহ হইয়া পড়ায় নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণপন্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। (১ পৃষ্ঠা-২৭)। ব্রাহ্মণদের কুলগর্ব অনেক দিনের। গোড়ার দিকে কুলগর্বের ভিত্তি ছিল বিদ্যাধিকার ও সদাচার। এখন বিদ্যা হইল নিষ্প্রোয়জন এবং সদাচার বলিতে কৌলীন্যরক্ষা। সুতরাং মানসিক সংস্কৃতির দিক দিয়াও কুলীন ব্রাহ্মণ হীন হইয়া পড়িল। (৫ পৃষ্ঠা-৫)। বস্তুতঃ যখন ব্রাহ্মণদের পক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তখনই শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি প্রচার করলেন জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম ধর্ম, নাম সংকীর্তন।..................কৃষ্ণ নামে ব্রাহ্মণ চন্ডাল সকলেরই

www.pathagar.com

অধিকার।........হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গকে এক ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন ।(২ পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪)। এই প্রয়াসকে আমরা আজকের প্রচলিত ভাষায় গণতান্ত্রিক বলতে পারি।

ব্রাহ্মণদের কৌলিন্যপ্রথা এতই কঠোর ছিল যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে ছোঁয়াছুয়িও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং মুসলিম রাজদরবারে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ করার ফলে এই ছোঁয়াছুয়ি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা কৌলিন্য রক্ষার চেষ্টা করলেও বিদ্যাবুদ্ধিতে পিছিয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে সেটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধর্মরক্ষা প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। ইসলামের বিশাল প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্যে কিছু ব্রাহ্মণ হিন্দু ধর্মের সংস্কার সাধনে এগিয়ে আসেন। এই সময় চৈতন্য বর্ণবৈষম্য বিদূরিত করে একেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি প্রেমের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই বৈষ্ণব ধর্ম। (৩ পৃষ্ঠা-১১)। শ্রী চৈতন্যের ধর্মসংস্কারের লক্ষ্য হিন্দু ধর্মকে ইসলামের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হলেও বর্ণবৈষম্য রোধের চেষ্টা ইসলামের সুফী প্রভাবেরই ফল। (৪ পৃষ্ঠা-১৭১)। কৃষ্ণ নাম ও কীর্তন এসেছে সুফীদের হাল্কা, জিকির, ছিমা থেকে। (ঐ পৃষ্ঠা-ঐ)। বস্তুতঃ চৈতন্যের ধর্ম হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একটা ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। (৫ পৃষ্ঠা-৪)।

কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা শ্রী চৈতন্যের মতবাদ সহজে গ্রহণ করেনি। তাদের পক্ষ থেকে শ্রী চৈতন্যের কীর্তণ বন্ধ করার জন্যে নবদ্বীপের কাজীর কাছে নালিশ করা হয়। এতে বলা হয়,

হেনকালে পাষন্ডী পাঁচসাত আইল।।
আসি কহে হিন্দু ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্তণ প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।।

মঙ্গল চন্ডি বিষহরি করে জাগরণ।
তাতে নৃত্যগীত বাদ্য যোগ্য আচরণ।
পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পন্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালাল বিপরীত।।
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।।
না জানি কি খাএগ্রা মত্ত হএগ্রা নাচে গায়।
হাসে কাঁদে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়।।
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তণ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ।।

www.pathagar.com

নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দু ধর্ম নষ্ট কৈল পাষন্ডী সঞ্চারী।।
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বির্য্য হয় হানি।।
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন।।
(৬ পৃষ্ঠা ১২৪/১২৫ এবং ৭ এর ২৬৫-২৬৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

মুসলমান কাজী এই অভিযোগ পেয়ে বৈষ্ণবদের কীর্তন নিষিদ্ধ করেন (৭ পৃষ্ঠা-২৫৭)। এতে চৈতন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। কাজী সাথে সাথে শ্রী চৈতন্যকে সাক্ষাৎ না দিয়ে কালক্ষেপণ করে সাক্ষাৎদান করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, এই সময় শ্রী চৈতন্য ও কাজীর মধ্যে নিম্নরূপ আলোচনা হয়ঃ-

প্রভু বলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম কেমত।।
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া।।
এবে তুমি শান্ত হইলে আমি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম।।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।।
(৬/ এবং ৭ এর ২৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

এই আলোচনা থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বাংলায় বসতি স্থাপনকারীরা গ্রামের মানুষের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

এই সাক্ষাৎকারকালে শ্রী চৈতন্য ও কাজীর মধ্যে যে ধর্মীয় আলোচনা হয় সে সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,

প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে।।
প্রভু কহে গো-দুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।

www.pathagar.com

বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তিহো পিতা।।
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন ধর্ম।
কোন বলে কর তুমি এমত বিকর্ম।
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরান।।
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি মার্গ নিবৃত্তি ভেদ।
নিবৃত্তি মার্গে জীবমাত্র বধের নিষেধ।।
প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়।।
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি।।
প্রভু কহে বেদে বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে।।
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে এই আছে আজ্ঞা বাণী।।
অতএব জরদগব মারে মুনিগণ।
বেদ মন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন।।
জরদগর হইএগ্রা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার।।
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহি ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে।।
(৬/৭ এর ২৬৬-২৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পস্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলমান কাজী হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। বস্তুতঃ এর দ্বারা এটা প্রমানিত হয় যে, তখনকার মুসলমানেরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ অবশ্যই অধ্যয়ন করতেন। এই আলোচনায় এটাও প্রকাশ পায় যে, একদা ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল বলে দাবী করা হলেও আলোচ্য সময়ে তা আর ছিলনা।

মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শণ করেন এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম হিন্দু জনসাধারণকে হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য 'মহাভারত' 'রামায়ণ' প্রভৃতি' বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। মুসলমান সুলতান ও শাসনকর্তাদের দরবারে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা হ'ত। এসব কার্যাবলী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উন্নততর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমঝোতা সৃষ্টিতে এবং বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। (৩ পৃষ্ঠা-২৫৩)।

www.pathagar.com

ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে চৈতন্য এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষানুসারে, শ্রী কৃষ্ণ ভগবান এবং সর্বোত্তম সত্য। জগৎ তাঁর মধ্যে এবং তিনি জগতের (সৃষ্টির) মধ্যে বিরাজমান। যদিও তিনি সর্বসৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাজিত, তবুও তিনি এক। (৩ পৃষ্ঠা-৩৬৭-৬৮)।

কৃষ্ণ দাস কবিরাজ লিখেছেন,

ব্রহ্মানন্দ প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়।
(৬-আদিলীলা, পঞ্চম অধ্যায়)।

চৈতন্য বর্ণ প্রথা রহিত করেন এবং ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যকার সমস্ত রকম বৈষম্য দূরীভূত করেন। ----বৈষ্ণব ধর্মের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। চৈতন্য শিক্ষা দেন,

"চন্ডাল (নিম্নশ্রেণীর হিন্দু) চন্ডাল নয়, যদি সে কৃষ্ণ নাম জপ করে;

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, যদি সে অধর্মের পথ অনুসরণ করে। (৩ পৃষ্ঠা-৩৬৭)।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

চন্ডাল চন্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে।
(৮ পৃষ্ঠা-১২৬)।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ".....মধ্যযুগের বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত নরপতি হোসেন শাহ এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য পরস্পরের সমসাময়িক। ....ইতিহাসে সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন মহাপুরুষের নামের জোরে সমসাময়িক রাজাও বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক না হলে রাজা বিম্বিসারকে আজ কে চিনত? কিন্তু হোসেন শাহের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি শুধুমাত্র তাঁর সমসাময়িক মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জন্য বিখ্যাত নন, নিজগুণেই তিনি বড়। তাই ব্রহ্মপুত্র থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর স্মৃতি জনসাধারণের মনের মধ্যে আজও বেঁচে আছে।

হোসেন শাহ তাঁর সমসাময়িক এই মহামানবকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।.... খৃস্টীয় ১৫৩৮-১৫৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এর অন্ত্যখন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ পাচ্ছি। .... চৈতন্যদেব যখন রামকেলি গ্রামে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে হরিগুণ গানে বিভোর ছিলেন, তখন,

নিকটে যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার।।
নির্ভয় হইয়া সর্বলোক বোলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহ বিত্ত সকল পাসরি।।

www.pathagar.com

কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াসে রামকেলি গ্রামে।
নিরবধি করয়ে ভুতের সংকীর্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কতজন।।
রাজা বোলে কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন।।

'কোটোয়াল' উচ্ছ্বাসিত ভাষায়, সন্ন্যাসীর রূপ-গুণ ও আচরণ বর্ণনা করলেন। তাঁর কথা শুনে রাজা কেশব খানকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন---

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বোল যার।।
কেমত তাহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোঁসাঞি তিহোঁ কহিবা অবশ্য।।
চতুর্দিকে আইচে লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভালমতে।।
শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন।।
কে বলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাসী।।

তখন-

রাজা বোলে, গরিব না বোলো কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কানে।।
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' খোদায় যবনে।
সেই তিহোঁ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে।।
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা সর্বদেশে শিরে করি বহে।।
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে।।
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে।।
ছয়মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে।।
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে।।
অতএব তিহোঁ সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরিব করিয়া তাঁরে না বোল উত্তর।।
রাজা বোলে এই মুঞি বলিলু সভারে।

www.pathagar.com

কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।।
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন।
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলে তাঁর লইমু জীবনে।।

(৯ অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৮২-১৮৩ ও ১৮৪/ ৮ এর ৩৬৮-৩৬৯)।

মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে, হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে, শিক্ষায় ও ধর্ম প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হয়। সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগুরু শ্রীচৈতন্যের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার প্রতি খুবই বিরূপ ছিলেন। ধর্ম প্রচারের কার্য থেকে তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণগণ সুলতান হোসেন শাহের নিকট বৈষ্ণবগুরুর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। বিচক্ষণ সুলতান শ্রীচৈতন্যের কার্যাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করেন এবং এর ফলে বুঝতে পারেন যে, চৈতন্যের বৈষ্ণব চিন্তাধারা হিন্দুদের কোন ক্ষতিসাধন করছেনা, বরং হিন্দু সমাজের উন্নতি বিধান করাই তাঁর চিন্তাধারা ও প্রচারণার লক্ষ্য। হিন্দুর সামাজিক জীবনে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে হোসেন শাহ তাঁর ধর্ম প্রচার কার্যে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেন নাই। অধিকন্তু, বৈষ্ণব গুরুর প্রচার কার্যে বাধা না দেয়ার জন্য তিনি সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রতি এক আদেশ জারী করেন। এমনকি তিনি শ্রীচৈতন্যের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করার বিরুদ্ধে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। (৩ পৃষ্ঠা-৩৭৪)।

ইতোপূর্বে নবদ্বীপের কাজীর নিকট ব্রাহ্মণদের অভিযোগ এবং তার প্রেক্ষিতে কাজী কর্তৃক কীর্তন বন্ধ ঘোষনা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'বৈষ্ণব গুরু এবং তাঁর শিষ্যরা রাত্রে রাস্তায় তাদের নাম সংকীর্তনের দ্বারা লোকের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। ন্যায্যতঃ কাজী চৈতন্যকে এই ধরণের 'সংকীর্তন' বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। কেননা ইহা নবদ্বীপ অধিবাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। (৩ পৃষ্ঠা-৩৭৪-৭৫)। বৈষ্ণব লেখকদের মতে কাজীর নির্দেশের বিরুদ্ধে চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং একদিন তাঁরা সমস্ত জিনিষপত্র সহ কাজীর ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ফেলেন। (৬ পৃষ্ঠা-১২২-২৩ এবং ৮ পৃষ্ঠা-১৮০-৮১)।

বস্তুতঃ কাজীর কাছ থেকে বাধা এসেছিল বলেই সুলতান এই বাধা অপনোদনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীচৈতন্য একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, এটা উপলব্ধি করেই সুলতান হোসেন শাহ বাংলায় চৈতন্যের প্রচার কাজ অবাধ করার ব্যবস্থা করে দেন। কেননা চৈতন্যের সংকীর্তন মুসলমানদের জিকির ও ছেমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হোসেন শাহের মন্ত্রী সাকর মল্লিক সনাতন এবং দবীর খাশ-রূপ শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় বৈষ্ণব মতবাদ প্রচারের পথ সহজতর হয়েছিল। অন্যদিকে সুলতান এবং আমীর ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই

www.pathagar.com

সময় বাংলা সাহিত্য চর্চা চলছিল অবাধ গতিতে। শ্রীচৈতন্যের অনুসারীদের মধ্যে রাজমন্ত্রী সনাতন ছিলেন পান্ডিত্য ও প্রতিভায় "বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি", দবির খাস রূপ গোস্বামীও পান্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তিকে ছিলেন অদ্বিতীয়।........ বৃন্দাবন দাসের বাংলায় চৈতন্যের প্রথম জীবন কাব্য 'চৈতন্য ভাগবত,' কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অন্যতম। (১ পৃষ্ঠা-৩৩,৪২ ও ৪৩)।

বস্তুতঃ হোসেন শাহী আমলে শুধু গৌড়ের দরবার নয়, রাজধানীর সন্নিকটবর্তী গ্রাম রামকেলী (সনাতন ও রূপের বাসস্থান), বর্ধমানের শ্রীখন্ড (হোসেন শাহের খাস চিকিৎসক মুকুন্দ এবং তার ভাই নরহরি সরকারের জন্ম স্থান এবং পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র) এবং চট্টগ্রামের মীরসরাই থানার পরাগলপুর বাংলা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ ঐ সময়ে বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থ প্রণীত হয় বিধায় হোসেন শাহী যুগকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

২। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা-প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০ খৃঃ।

৩। ডঃ এম, এ, রহিম- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ খৃঃ।

৪। ডঃ এনামুল হক-বঙ্গে সুফী প্রভাব।

৫। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ) ইষ্টার্ণ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫ খৃঃ।

৬। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-চৈতন্য চরিতামৃত, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

৭। Dr. A. Karim-Social History of the Muslims in Bengal (Down to AD 1538) Baitussharaf Islamic Research Institute, Chittagong. 1985 .

৮। বৃন্দাবন দাস-চৈতন্য ভাগবত (অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত)।

৯। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। শান্তিনিকেতন, ১৯৮০।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ সগির ও তাঁর কাব্য ইউসুফ-জোলেখা

হোসেন শাহী বংশের শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩২-৩৮) সময়ে শাহ মোহাম্মদ সগীর বাংলায় ইউসুফ-জোলেখা রচনা করেন।। (১পৃষ্ঠা-৫৭১)। এটি বাংলা ভাষায় মুসলমান লিখিত প্রথম গ্রন্থ। বঙ্গ (বাংলা নয়) বিজয়ী মুসলমানেরা সাথে করে দুটি ভাষা নিয়ে এসেছিলেন, একটি ধর্মীয় ভাষা-আরবী ও অপরটি সংস্কৃতির ভাষা-ফারসী। তবে তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলায় (বিজিত অঞ্চলে) মুসলিম শাসন স্থায়ী করতে হলে, বাংলার (বিজিত অঞ্চলের) মানুষের সাথে মিশে তাদের হৃদয় জয় করতে হলে, তাঁদের বাংলা ভাষা (স্থানীয় ভাষা) শিখতে হবে এবং স্থানীয় ভাষা শিখতে পারলেই তাঁদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের সাথে মেলা মেশা, ভাবের আদান প্রদান করা সহজ হবে। অন্যদিকে বহিরাগত মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় ধর্মীয় বা সামাজিক কোন বাধা ছিলনা। তাই রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সী করা হলেও শাসকেরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। বহিরাগতরাও বাংলা ভাষা শিখতে থাকেন। সাথে সাথে রাজকীয় কাজ পরিচালনায় অংশ নেয়ার জন্যে স্থানীয় লোকেরাও ফার্সী ভাষা শিক্ষা শুরু করে। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারা ধর্মীয় ভাষা আরবী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমান পন্ডিতেরাও হিন্দুদের ধর্মীয় বই পড়ে, স্থানীয় হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সাথে ধর্ম সম্পর্কে তর্ক করার লক্ষ্যে স্থানীয় ভাষা সংস্কৃত এবং সাধারণ লোকের ভাষা বাংলা শিখতে থাকেন। সুলতান আলাউদ্দিন আলী মার্দান খিলজী (১২১০-১২১৩) লক্ষ্ণৌতির শাসক থাকা কালে সেকালের খ্যাতনামা মুসলিম (হানাফী) তাত্ত্বিক কাজী রুকনউদ্দীন সমরকন্দী হিন্দু যোগশাস্ত্র অমৃতকুন্ড (সংস্কৃত) প্রথমে ফার্সী এবং পরে আরবীতে অনুবাদ করেন। (২ পৃষ্ঠা-৯৬)।

বস্তুতঃ মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় যে সব সাহিত্য রচিত হতে থাকে সেগুলো মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত সাহিত্যকর্ম ও দর্শনের ভাবানুবাদ হওয়ায় মুসলিম পন্ডিতেরা সে সময়কালের ইসলামী সাহিত্য ও দর্শন অনুবাদ ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইসলামী সাহিত্য ও দর্শনের সাথে বাংগালীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই শাহ মোহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জলিখা' রচনা করেন। এটি হচ্ছে নবী ইউসুফ এর সাথে জলিখার প্রেম কাহিনী। কতিপয় আরবী ও ফার্সী বই এবং কোরান ভিত্তিতে এই

www.pathagar.com

গ্রন্থ রচনা করা হয়। (২ পৃষ্ঠা-৯)। এই বই (পুঁথি) অর্থাৎ ইউসুফ-জলিখা লেখার কারণ বর্ননা করতে গিয়ে কবি বলেছেন,

চতুর্থে কহিমু কিছু পোথার কথন।
পাপ ভয় এড়ি লাজ দঢ় করি মন।।
নানাকাব্য কথা রসে মজে নরগণ।
যার যেই শ্রদ্ধায় সন্তোষ করে মন।।
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দোষিব সকল তাক হই ন জুয়ায়।।
গুনিয়া দেখিলুঁ আমি ইহ ভয় মিছা।
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।।
শুনিয়াছি মহাজনে কথিতে কথন।
রতন ভান্ডার মধ্যে বচন যে ধন।।
বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া।
প্রেম রসে ধর্মবাণী কহিমু ভরিয়া।।
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা।।
ন হৈতে প্রেমক ভাব ইছুফ অন্তর।
জলিখা মজিল তাক বিরহ্ সায়র।।
কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমিয়া অশেষ।।
(৩ পৃষ্ঠা-৫৮)।
কহিমু কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতি-ঘট ভরি।।
দোষ খেম গুণধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগির ভনে প্রেমক বচন।।
(৪ পৃষ্ঠা-৪-৫)।

ইউসুফ-জলিখা কাব্যের রাজবন্দনায় কবি বলেছেন-

তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
রাঘে ছাগে পানি খাএ 'নির্ভয় নিডর।।
রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পন্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত।।
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।।

www.pathagar.com

ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র শিষ্য হস্তে তিহঁ মাগে পরাজএ।।
মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিআ।
লইলেন্ত রাজপাট বঙ্গাল-গৌড়িআ।।
করুণা হীদএ রাজা পূণ্যবন্ত তর।
সবগুণে অসীম অতুল মনোহর।।
পূর্ণিমার চান্দ জেহ্ন বদন সুন্দর।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সুন্দর।।
রমনীবল্লভ নৃপ রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা।।
জিনিলা নৃপতি সব করিয়া সমর।
জয়বাদ্য দুন্দুভি বাহন্ত উষ্ণস্বর।।
ভকত বৎসল নৃপ বিপক্ষ বিনাশ।
পরজা পালন করে মনে হাবিলাষ।।
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁ কাম।
তান-ভক্তি বিনা-ধিক নাহি আর ধাম।।
মোহাম্মদ ছগির তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক জস ভূবন এতিন।।
(৪ পৃষ্ঠা- ৩-৪ ও ৭৮-৮৯)।

ইউসুফ-জলিখার রচনা কাল নিয়ে বিতর্ক ছিল। ডঃ এনামুল হকের মতে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময়ে (১৩৯২-১৪১০) এটি রচিত। (৩ পৃষ্ঠা-৫৬/৫৭)। সুলতান আহমদ ভূঞা ও সুখময় মুখোপাধ্যায় ডঃ হকের মতামত চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, এটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর আগে লিখিত হয়নি। (৫ দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৭-৯০)। সুলতান আহমদ ভুঁইয়া ই, জি, ব্রাউনের উধৃতিদিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সগীরের কাব্যখানি জামীর কাব্যের অনুকরণে রচিত; ফেরদৌসীর কাব্যের কোন প্রভাব তাঁহার কাব্যে নাই। (১০ পৃষ্ঠা-২২৫)। ই, জি, ব্রাউন বলেছেন যে, জামীর 'য়ুসুফ-জোলেখা' কাব্যের রচনাকাল ৮৮৮ হিজরী অর্থাৎ ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ। (১১ পৃষ্ঠা-৫১৬), মোল্লা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২ খৃঃ) 'য়ুসুফ-জোলেখা' নামীয় কাব্য রচনা করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে।.... অন্ততঃপক্ষে একশত বৎসর পরে আমাদের বাঙ্গাল দেশের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর তাঁহার য়ুসুফ-জোলেখা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ... (১০ পৃষ্ঠা-২২৮)। জনাব ভুঁইয়া তাঁর "কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর ও তাঁহার আবির্ভাবকাল" প্রবন্ধে সগীরের ইউসুফ জোলেখা'য় জামীর কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। (১২ পৃষ্ঠা ১৮২)। গ্যাসদীন সুরতান শব্দ ভিত্তিতে সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, এই গ্যাসদীন সুরতান' গিয়াসুদ্দিন মাহমুদশাহ। (৫ নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩০২)। ডঃ এ, করিম

www.pathagar.com

সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটি সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে (১৫৩২-১৫৩৮) রচিত। (১ পৃষ্ঠা-৫৭১)। ডঃ করিমের মতামতই সত্য।

শাহ মোহাম্মদ সগীর এবং তাঁর কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা' সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে, এটি ষোড়শ শতাব্দীতে গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে রচিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তথ্য ও যুক্তিদ্বারা এই সত্য প্রমাণ করেছি যে, ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময়ে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণ বাংলা ভাষায় তৃতীয় ও মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ। একই অধ্যায়ে আমরা এটাও প্রমান করেছি যে, ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক রুকন উদ্দিন বারবাক শাহ ও ইউসুফ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু (গুনরাজ খাঁ) ১৪৭৩-৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন। এটি বাংলা ভাষায় চতুর্থ এবং মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। একই অধ্যায়ে আমরা কানাহরি দত্ত ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের কথাও উল্লেখ করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বিজয়গুপ্তের কাল নির্ধারণ করে বলেছি যে, তিনি (বিজয় গুপ্ত) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে কাব্য চর্চা করেন। একই অধ্যায়ে আমরা পরাগলপুরে সাহিত্য চর্চা তথা বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম মহাভারত পরাগলী মহাভারত ও ছুটিখানী মহাভারত রচনার কথা উল্লেখ করেছি। একই অধ্যায়ে হোসেন শাহী বংশের যুবরাজ ফিরোজ শাহের উৎসাহে শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল) ও আফজল আলীর নসিহত নামা রচনার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্য আমরা কোন শক্তিশালী মুসলিম কবিকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় পাইনি। তাই আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, তথ্য ও যুক্তি এটাই প্রমান করে যে, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ নন, গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়েই শাহ মোহাম্মদ সগীর ইউসুফ জোলেখা রচনা করেন। গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনকাল দুর্যোগপূর্ণ ছিল। একারণেই হয়ত শাহ সগীর সুলতানের কোন প্রশস্তি তাতে যোগ করেন নি।

মুসলমান শাসনামলে বাংলা সাহিত্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন এতিহ্য-বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য প্রবহমান ছিল। (৬ পৃষ্ঠা-২)। মুসলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বজনীনতা ও মানবতার আদর্শ আনয়ণ করেন। তাঁরা ধর্মীয় বিষয়ে এবং ধর্মীয় ইতিহাস, রম্য রচনা, বীরগাঁথা প্রভৃতি বিষয়ে কাব্য রচনা করেন।.....তাঁদের কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল মর্তের মানুষ, তাদের রোমাঞ্চ, অপূর্ব কার্যাবলী, দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, তাদের চিন্তাধারা, আবেগ, আর্তি, সংস্কার ইত্যাদি। .....মুসলমান কবিদের নায়ক নায়িকারা ছিল এই দৃশ্যমান জগতেরই নরনারী এবং তাদের চিন্তাধারা ও কার্যাবলী ছিল এই পৃথিবীরই মানুষের মত। বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রীয় উপাদান ও রোমাঞ্চকর প্রেমমূলক উপাখ্যান মুসলমান কবিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান। (৯ পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫)। শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জুলায়খা' বাংলা সাহিত্যে প্রথম রম্য কাব্য, প্রেমের উপাখ্যান, মানবধর্মী সাহিত্য। (৩ পৃষ্ঠা-১০৮)।

www.pathagar.com

ইউসুফ জুলায়খার কাহিনী পারস্য কবি ফেরদৌসী, আবদুর রহমান জামী, শেখ আবদুল্লাহ আনসারী প্রমূখ তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। এটি মিশরের ঘটনা। কিন্তু বাংগালী কবি এটিকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির আদলে সাজিয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কেননা, তাঁর কাব্যে ইউসুফের ছোট ভাই ইবনে আমিনের সাথে মধুপুরের কুমারী বিধুপ্রভার বিবাহদান, রাজা আজিজ মিছিরের চৌদোলে চড়ে জুলেখাকে অভ্যর্থণা, জুলেখার পিতা মাতার পান চিবানো প্রভৃতি বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ, নাম ও যানবাহন এবং আচার অনুষ্ঠান (২ পৃষ্ঠা-১০৪-১০৬)। বস্তুতঃ শাহ্ মোহাম্মদ ছগির বাংগালী পাঠকের মনোরঞ্জণের জন্য বাংলা সংস্কৃতির আদলেই এই লেখা লিখেন। এ প্রসঙ্গে জোলেখার বারমাসী অংশটি উধৃত করলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।ঃ-

ইতি দোয়াদশ মাস

মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস
শুভ ছিরি পঞ্চমী প্রকাশ।
মউলিত পুষ্পবন মদন মোহন ঘন
তা দেখিয়া মোর মন উদাস।।
বিকশিত আম জাম ভ্রমর ভ্রমএ কাম
সৌরভ ধাবন্তি চতুর্দিশ।
মলয়া সমীর ধীর হৃদয় অন্তরে পীড়
বিরহিণী জন অহর্নিশ।।
ফাগুনে চৌগুণ রীত নানা পুষ্প বিকশিত
যুবজন ফাগু বিভূষিত।
পূরিত সকল অঙ্গ আগর চন্দন রঙ্গ
খেলএ আনন্দ হই চিত।।
নবীন পরব বেশ সুরঙ্গ দুর্লভ দেশ
তরুলতা নবরঙ্গ হাস।
জুবক জুবতীগণ নানা বস্ত্র বিভূষণ
অভরণ বিচিত্র বিলাস।।
চৈত্র হৈল সুললিত নানা পুষ্প বিকশিত
চম্পক চামেলী যুথী জাতী।
নাগেশ্বর শতবর্গ লবঙ্গ গুলাল স্বর্গ
আমোদিত প্রতি পাতি পাতি।।
ভ্রমর ভ্রমরী জোড় কেলিকলা রসে ভোর
গুঞ্জরে মঞ্জরী পরি রঙ্গে
তা হেরি চঞ্চল মতি কাম বিহারিত গতি
কামিনী ব্যাকুল মন ভঙ্গে।
বৈশাখ সময়ে দেশ রবির কিরণ বেশ

www.pathagar.com

নিদাঘ দহএ নিরন্তরে।
আম জাম সুফলিত তরুসব সুললিত
দুলিত লম্বিত ফলভরে।।
অলিকুল কলরব কেলিকলা রসে সব
পক্ষীসব রবএ মধুর।
দক্ষিণ মলয়া বাত হৃদয়ে অনঙ্গ ঘাত
তা হেরি ধাবএ মন দূর।।
জ্যৈষ্ঠ আইল বল চূত সুপক্কিত ফল
ডালে সব হৈল সুশোভিত।
পেখিতে আহ্মার মন চারু চমকিত ঘন
উদয় মঙ্গল সুচরিত।।
নানা বর্ণ ফলবর্গ জেহেন নক্ষত্র স্বর্গ
কনক কটোরা মধুপুর।
তরুসব সুচরিত জীববন্ত হরষিত
বিরহিনী হেরি কাম ভোর।।
আষাঢ় আইল ঘন সঘন তিমির বন
নিশি দিশি নাহিক প্রকাশ।
রবিখএ আনিবার ধরনী পুরিত ধার
জীবজন্তু অধিক উল্লাস।।
বিদ্যুৎ তরঙ্গছটা চৌদিকে অম্বর ঘটা
মোর মন ভয়ে চমকিত।
নানা পক্ষী করে রব মঙ্গল পঞ্চমী সব
সুললিত মধুর সঙ্গীত।।
শ্রাবন আইল ঋত মেঘছত্র চতুর্ভিত
নির্ভরে রবিষে জলধার।
নির্মল শীতল জল সতত বিরহানল
বিশেষ দহএ দেহা মোর।।
চাতক পিয়ার পিউ পক্ষীরবে দহে জীউ
শিখী সুখে গিরি গর্ভে নাদ।
দাদুরীর রোল ঘোর ভাবেত হইলুঁ ভোর
শুনিতে শুনিতে পরমাদ।।
ভাদ্র জে আইল ধীর ভূমি ভরপুর নীর
খাল নাল গহন গম্ভীর।
গগন গর্জিত ঘন চারু চমকিত মন
জলপূর্ণ সরসীর তীর।।

www.pathagar.com

বরিষে নির্ভর ঝরি ঝিঝিরব ঝনকারি
ডাউক শবদ করু পূর।
উন্নত তাহার বাণী জেন বিখধারা মানি
তা শুনি ধাবএ মন দূর।।
আশ্বিন জে পরবেশ বরিষা হইল শেষ
খেনে ঘোর খেনেকে বিদ্যুৎ।
কেতকী বকুল ফুল তাহাতে ভ্রমরা রোল
তা দেখি ধরাইতে নারি চিত।।
আইল কার্তিক মাস চতুর্দিক পরকাশ
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাস পিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
মনপক্ষী উড়িতে উশ্চাএ।।
নিশি দিশি উঝলিত তারাগণ বিস্তারিত
বহএ সমীর ধীর ধীর।
ধবল কাচিয়া ফুল জেহেন পতাকা তুল
মদন চামর চমক্কার
আঘ্রান আইল রিত নব শালী সমুদিত
সুগন্ধি সৌরভ জা এ দূর।
শারী শুক করে রোল নানা বন্ন ধান্যকূল
বিকসিত সব খিতিপুর।।
ঘরে ঘরে ধান্য রাশি নর পশুগণ হাসি
গবান রুচিত পরকাশ।
রাজা প্রজা উল্লসিত প্রবাস বঞ্চিত রিত
মোং পৈক্ষে জেহ্ন বনবাস।।
পৌষ আইল ওস রিত ভূবন পুরিত শীত
খোহামএ জেহ্ন বিষ্টিকার।
জুবক জুবতি মিলি কর্পূর তাম্বুল তুলি
বিলসিত নানা সুখসার।।
মুঞি বড় হতভাগী অহনিশি রহোঁ জাগি
প্রভুমোর নিদয়া হিদয়।
মোহাম্মদে কহে দুখী অবশ্য হইবা সুখী
নিশিশেষে রবির উদয়।।

(৪ পৃষ্ঠা-৫২,৫৩, ৫৪ ও ৮৩, ৮৪)।

এটি বাংলার প্রকৃতিরই রূপ বর্ণনা, মিশরের নয়। এই কবিতায় আষাঢ়ের যে বর্ণনা রয়েছে তা কবি গুরুর আষাঢ় কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

শাহ মোহাম্মদ সগীর ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহসিকতার সাথে সাহিত্য চর্চা শুরু করায় বহুসংখ্যক বাংগালী মুসলমান এই ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন। অর্থাৎ শাহ মোহাম্মদ সগীর মুসলমান হিসেবে প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন এবং এতদিন যে সাহিত্য ছিল ভাগবত, রামায়ণ, পুরাণ আশ্রিত সেই সাহিত্যে মুসলমানদের কোরান কিতাব টেনে আনেন, কিছু সংখ্যক সহজবোধ্য আরবী ফার্সী শব্দও বাংলা ভাষায় আত্মীকরণ করা হয়। বস্তুতঃ শাহ মোহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলায়খা' লেখার পরই মুসলিম লেখকেরা বাংলা সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। অর্থাৎ মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শাহ মোহাম্মদ সগীর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'এক দেশে বসবাস করে, একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবনযাপন করে, একই ভাষা বলে, একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যোগদান করে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানতো নিশ্চয়ই, উচ্চবর্গের মুসলমান ও উচ্চবর্গের হিন্দুও বাঙালী বনে গিয়েছিল। বলতে গেলে বাঙালীর একটা রাষ্ট্র, জাতি বা নেশন হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা তখনি (ষষ্ঠদশ খৃষ্টাব্দে) দেখা দিয়েছিল। তখন থেকে বাংলা সাহিত্য হচ্ছে অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর সমবেত সৃষ্টি, যদিও তার বুনিয়াদ হিন্দুভাষা, কথা ও ভাব। (৭ পৃষ্ঠা-৪১/৪২)।

হিন্দু শাসনামলে বেদের ভাষায় বাংলায় সাহিত্য চর্চায় যে বিধি নিষেধ ছিল মুসলিম আমলেও তা কাটেনি। সমাজের এই বিধি নিষেধ লক্ষ্যকরে এবং প্রভাবিত হয়েই সম্ভবতঃ শাহ মোহাম্মদ সগীর কাব্য রচনা করতে গিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, শাহ মোহাম্মদ সগীর তাঁর কাব্য অর্থাৎ ইউসুফ জোলেখা'য় নিজের আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন নি। তবে তাঁর কাব্য পর্যালোচনা করে পন্ডিতগণ এটি যে, হোসেন শাহী বংশের সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে (১৫৩২-৩৮) রচিত তা প্রমান করেছেন। তাঁর কাব্য রচনার স্থান নিয়ে বিতর্ক ছিল। তবে একটি খন্ডিত পান্ডুলিপি ছাড়া "শাহ ছগিরের সকল পান্ডুলিপি চট্টগ্রাম হইতে আবিস্কৃত হওয়ায়" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) পন্ডিতগণ শাহ ছগিরকে চট্টগ্রামের কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইউসুফ-জোলেখাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য। (৮ পৃষ্ঠা-৫৭৬)। পরাগলপুরের ঐতিহ্য অর্থাৎ পরাগল খান ও ছুটিখানের কাল ছিল হোসেন শাহ থেকে নুশরৎ শাহ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪৯৩ থেকে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন নুসরৎ শাহের ভাই এবং হোসেন শাহের পুত্র। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ নুসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহকে হত্যা করে বা করিয়ে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন। সুতরাং পরাগলপুরের উপর তাঁর প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক। তাই শাহ মোহাম্মদ সগীর চট্টগ্রামের অন্য কোথাও বসে ইউসুফ-জোলেখা লিখে থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, রাজ প্রশস্তিতে তিনি 'গেছ' বলে গিয়াসুদ্দিনের নাম স্মরণ করেছেন। পরাগলপুরের কোন প্রভাব থাকলে কিংবা পরাগলপুরে কাব্য রচনা করলে তিনিও তাঁর পরবর্তী কবি সৈয়দ সুলতানের মতো পরোক্ষে হলেও পরাগলপুরের নাম উল্লেখ করতেন। তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে তখন চট্টগ্রামের সাহিত্যিকদের উপর পরাগলপুরের প্রভাব পড়েছিল।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১। ডঃ এ, করিম-বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল। ঢাকা, ১৯৯৪ খৃঃ।

২। Dr. A. Karim-Social History of the Muslims in Bengal (Down to AD 1538). Baitussharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1985.

৩। ডঃ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা 'সাহিত্য, ঢাকা। ১৯৫৫।

৪। শাহ্ মোহাম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা, সম্পাদক-মুহাম্মদ এনামুল হক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫। সুখময় মুখোপাধ্যায়-বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯৬৬

৬। S. A. Ashraf-Muslim Traditions in Bengali Literature.

৭। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা-প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০।

৮। Dr. Suniti Bhushan Kanungo-A History of Chittagong 'Vol-I Signet Library, Chittagong. 1988.

৯। ডঃ এম, এ, রহিম-বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ খৃঃ।

১০। নওবাহার, ৪র্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

১১। E.G Brown-Literary History of Persia, Vol-III

১২। সাহিত্যিকী, শরৎ সংখ্যা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার প্রথম মুসলিম কবি সাবরিদ খান

রসুল-বিজয়, হানিফা ও কয়রা পরী ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতা সাবরিদ খান চট্টগ্রামের কবি এবং মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর প্রথম হলে তিনি দ্বিতীয়, আর তিনি প্রথম হলে শাহ সগীর দ্বিতীয়জন হবেন।

শাহ মোহাম্মদ সগীর বা কবি সাবরিদ খান, এর কাল সুনিশ্চিত হলে হয়তো বাঙলার মুসলমান কবিদের মধ্যে তাঁরাই কেউ প্রাচীনতম বলে গণ্য হবেন, কারণ তাঁদের ভাষার স্থানে স্থানে প্রাচীনতার লক্ষণ দেখা যায়।.... সাবরিদ খান অভিজাত গোষ্ঠীর সন্তান, বিশেষত মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর ধারার কবি। কিছুটা সংস্কৃত জ্ঞানও তাঁর ছিল, সেই অলঙ্কারিক-ঐতিহ্য তাঁর লেখায়ও সুরক্ষিত। বিদ্যাসুন্দরের মুসলমান কবি এবং ভারত চন্দ্রের পূর্বেকার বিদ্যাসুন্দরের কবি হিসাবে সাবরিদ খান তাই বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন। (১ পৃষ্ঠা-১৬১)।

সাবিরিদ খানের (শাহ বারিদ খানের) ভনিতাযুক্ত এক পদবন্ধ থেকে তাঁর পরিবার ও বাসস্থান নির্ণয় করা যায়। যেমনঃ-----

আদ্য সৃষ্টি কহি জান শুণ উপদেশ
ভাটি মধ্যে বাইশ বাঙ্গালা চাটিগাঁ প্রধান দেশ।
হাওলা, দেয়াঙ্গি, মৈষামূড়া, কাঞ্চণা মহম্মদপুর
হাসিমপুর বাজালিয়া এই আষ্ট শ্রী।
চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ী
তীরাতীরি গোলাগুলী সব গেল উড়ি।
কাঞ্চণা প্রহরী রৈল সমশের চৌধুরী
অলিমুন্দার হাদুমুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভাই
ফরমানী মুনদারী পাইল জামিজুড়ি যাই।
আলিমুন্দার হাদুমুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভঙ
হাওলার নিমুন্দার করে নানা রঙ।
রাজা ছিল খোঁয়াঝা গিরি উজির ছিল বাজি
তেরঘর খোঁআঝার মধ্যে সাতঘর কাজি।
জগদীশ মনোহর তারা দুই ভাই

www.pathagar.com

বর্ধমানী ছেগা পাইল গরুর মাংস খাই।
শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কূলে শঙ্খনদীর মোড়
সাধুখাঁ সাবরিদ খাঁ তারা দুইঘর।
মহন্ত সকল জান রাজার সঙ্গে ছিল
সেই সব সকলেরে খোঁআঝাগিরি দিল।
কহে হীন সাবরিদ খাঁ এহার রহস্য
বচনে না ধরে যারে সে নহে মনুষ্য।

উধৃত ছড়ায় কবির সমকালীন (১৫১৭-৫০) দক্ষিণ চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর পরিচয় রয়েছে। পদবন্ধের বক্তব্য এইঃ-

এক সময় পূর্ব বঙ্গ ও আসামের কতকাংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এই ভাটি বাইশটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। চট্টগ্রাম এর একটি। কর্ণফুলীর পূর্ব-দক্ষিণ তীর থেকে মাতামুহুরী নদী অবধি অঞ্চলের মধ্যে হাওলা (খরদ্বীপ), দেয়াঙ্গ (দেব গ্রাম), মৈষামুড়া (শঙ্খতীরস্থ গ্রাম), কাঞ্চণা (সাতকানিয়া থানার-গ্রাম), মুহম্মদপুর, হাসিমপুর (পটিয়া), বাজালিয়া (সাতকানিয়া) ও চক্রশালা (পটিয়া)-এই সাতটি সমৃদ্ধ গ্রাম বা চাকলা ছিল।

পটিয়া থানা থেকে দুইমাইল দূরে চক্রশালা গ্রাম অবস্থিত। বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে এই চক্রশালাতেই আরাকান রাজের চট্টগ্রামস্থ অধিকারের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাঞ্চননগরে জমশের চৌধুরী সীমান্তরক্ষী সেনানী নিযুক্ত হলেন। জামিজুড়ি চাকলায় গিয়ে আলিমুন্দার, হাদুমুন্দার ও বড়াইয়া মুন্দার....এই তিন ভাই মুন্দারী (মহুন্দারী মজুমদারী) ফরমান লাভ করেন। এই মুন্দারত্রয়ের মধ্যে হাওলার নিমুন্দার ঐশ্বর্যে ও বিলাসিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আরাকান রাজ থেকে খোঁয়াজা খেতাব লাভ করেন এবং রাজমন্ত্রী তাঁকে ঘোড়া উপহার দেন।

আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রামে সরকারী খোঁয়াজা খেতাবধারী তেরটি সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবার ছিল। তাদের মধ্যে সাতটি কাজী বংশীয়। জগদীশ ও মনোহর ভ্রাতৃদ্বয় গোমাংস খেয়ে সমাজে পতিত হলে রাজার কৃপায় বর্ধমানী ছেগা (জায়গীর) পেয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। শঙ্খনদের বাঁকে সাধুখাঁ ও শ'বারিদ খান পরিবার দুটোর বাস। যারা আরাকান রাজের পর্ষদ ছিলেন তাঁরা সবাই খোঁয়াজা উপাধি লাভ করেন। (২ পৃষ্ঠা-২৫১ থেকে ২৫৩)।

উপরে সাবরিদ খানের সময়কাল ১৫১৭-৫০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে হোসেন শাহী শাসন ছিল। অতঃপর ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে মূলতঃ ছিল আরাকানী শাসন। সুতরাং সাবরিদ খানের সময়কাল আরাকানী শাসনের সময় কালের কোন একটা সময় হবে।

www.pathagar.com

মুসলমান কবির লেখা প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য (পাঞ্চালিকা) সাবিরিদ খানের রচনা। দ্বিজ শ্রীধরের রচনার মত সাবিরিদ খানের রচনার পুথিও চাটিগাঁয়ে পাওয়া এবং সে পুথিও খন্ডিত। (৩ পৃষ্ঠা-৬৩৩-৩৬)।

পুথিতে সাবিরিদ খান নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবেঃ----

পীয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্র যুত
উজীয়াল মল্লিক-প্রধান
তানপুত্র জি ঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুছা-খান।
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা-অগ্রগণ্য অর্ক-সুত
ধৈর্য-বন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসর-গুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত।।
তান-সুত গুনাধিক নানু রাজা ময়াল্লিক
জগত-প্রচার যশখ্যাতি
তান-সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী।
(৩ পৃষ্ঠা-৬৩৬)।

সাবিরিদ খান সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, সাবিরিদ খান সম্ভবতঃ কোন সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উধৃত করে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যারূপে কবি পয়ারত্রিপদী জুড়িয়া দিয়াছেন। যেমন-

অত্যোত্তরে শুভদেশে সর্বশাস্ত্রসমন্বিতা।
পুরী রত্মাবতী নাম্নী বহুরত্নাবিভূষিতা।।
গুণসার-নৃপপুত্রো নীতিধর্মপরায়ণ:
তস্য কলাবতী নান্মী ভার্যা চ গুণশালিনী।
তস্য গর্ভে সুতো (জাত) কালিকায়াঃ প্রসাদতঃ।
সুন্দর ইতি আখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রে বিশারদঃ।।
অত্যন্ত উত্তর দেশ বিজয়নগরী।
অধিক উত্তম রত্নাবতী নাম পুরী।
সে দেশের নরপতি নাম গুণসার
সকল ভূপতি জিনি যশ সুপ্রচার।।......

ডঃ সেন সাবরিদ খান সম্পর্কে আরো বলেছেন, সাবিরিদ খানের সংস্কৃতে জ্ঞান ছিল এবং বাংলা কাব্যকলায় তাঁর বেশ অধিকার ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি সাবরিদ খান কর্তৃক কাঞ্চীপুরের বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যার রূপ বর্ণনা এবং এই বিদ্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক সুন্দর এর সাথে সুচরিতা মালিনীর কথোপকথন উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

বিদ্যার রূপ বর্ণনা-

মুখ-বিধু পূর্ণ-ইন্দু কিএ অরবিন্দ
মৃগ-বৎস-নেত্র কিবা নীল মত্ত ভৃঙ্গ।
বালেন্দু জিনিয়া ভাল সীমন্ত উজ্জ্বল
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর যুগল।
রদ-পাঁতি মুতি-জ্যোতি বাচি সুমধুর
ভুরু-ভঙ্গে কাম শর নিঃসরে প্রচুর।
কণ্ঠ-রেখা দর্শি কম্বু জলধি মজ্জিল
কমল-কলিকা কুচ হৃদয়ে উগিল.......

সুন্দর ও মালিনীয় কথোপকথন-

সুন্দরঃ-----

আহ্মা জান বৈদেশী নিশ্চিত
দ্বিজবর-তণয় পন্ডিত।
পাঠ পড়ি ভ্রমি এ নগর
পন্ডিতানী করিতে বিচার।
বেলি শেষে অস্ত যাএ সুর
বাসাখানি মাগি তোহ্মাপুর।
পালহ্ বচন সুনয়নী
প্রেমচিত্তে দেও বাসাখানি।
অমুল্যরতন এক নেও
আনিয়া রন্ধন-সজ্জা দেও।........

মালিনীঃ-----

জবে আর ভিন্নদেশী পাই
যত্ন করি তাহাক রহাই।
মনে ভীত বাসী তোহ্মা দেখি
মহারাজ-সূত হেন লখি।

সুন্দরঃ----

অবেলা এ অতিথি পাইআ
অসাধু রহএ উপেখিআ।
আএ ধনি বুঝাই তোহ্মাএ
উপেক্ষিতে আহ্মা না জুআএ।.......

মালিনীঃ----

বিদেশী-কুমার হেন তোহ্মাক বুঝাই
নৃপতি দুর্বার বাসা দিবারে ডরাই।
নাগরঙ্গ নাম সেএ রাজ্য কোতোআল

www.pathagar.com

নিতি নিতি প্রজা-ঘর করএ বিচার।
ভিন্ন দেশী পুরুষ মন্দিরে যার পাএ
আগে শাস্তি করি পাছু রাজাক জানাএ
তনু-কান্তি সুলক্ষণ অভিন্ন মদন
তোহ্মার তুলনা রূপ নাহিক ভুবন।
কোতোআলে (যবে) দেখে তোহ্মা মোর গৃহে
কি বুলি ভাভিআ তাক রাখিবাম তোহে।.........
(৪ পৃষ্ঠা-৩৩৫ থেকে ৩৩৭)।

তথ্যপঞ্জী

১। গোপাল হায়দার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা-প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮০ খৃঃ।

২। ডঃ আহমদ শরীফ-সৈয়দ সুলতান-তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২।

৩। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (মুসলিম কবির বিদ্যাসুন্দর প্রবন্ধ) ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩২৫ বাংলা।

৪। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ) ইষ্টার্ণ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের সর্বাধিক প্রভাবশালী কবি ছিলেন পরাগলপুরের সৈয়দ সুলতান

হোসেন শাহী বংশের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এই বংশের শাসনামলের প্রাদেশিক শাসকদের, বিশেষ করে পরাগলপুরের শাসকদের আগ্রহের ফলে বাংলা সাহিত্য চর্চার যে সূচনা হয়েছিল, ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে পাঠান যোদ্ধা শের শাহেব বাংলা (গৌড়) দখলের কারণে তাতে ভাটা পড়লেও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বৈষ্ণবপন্থী কবিদের লেখাছিল অব্যাহত এবং সাথে সাথে অবৈষ্ণব কবিদের সাহিত্য চর্চাও ক্ষীণ আকারে হলেও চল ছিল।

ছুটি খাঁর পরে অবশ্য সেই পরাগলী ঐতিহ্য বা হুসেন শাহী ঐতিহ্যের সন্ধান সে অঞ্চলে কিছুদিন পাওয়া যায় না। তখন পাঠান-মোগল ও নানা আঞ্চলিক রাজাদের ভাগ্যপরীক্ষার কাল। অনুমান করা হয়, গৌড়ের সুলতানদের পতন আরম্ভ হলে (১৫৩৮-১৫৭৫) গৌড়ের মুসলমান উজীর ওমরাহরা শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের দিকে পশ্চাদগমন করে থাকবেন; হয়তো তাঁদের সঙ্গে জৌনপুরী শর্কীদের 'শরণার্থী' অভিজাতরাও ছিলেন, তাঁরাও শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের দিকে বাস করতে যান। শ্রীহট্টের ও চট্টগ্রামের সুফী-মতবাদের অনুরক্ত কবিদের আবির্ভাব তাই সম্ভব হয়। (১ পৃষ্ঠা-১৪৮)। 'চৈতন্যের কয়েকজন প্রধান অনুচর ছিলেন এই অঞ্চলের লোক। সেই সূত্রে বৈষ্ণবতার জোয়ারও এখানে প্রবলভাবে আসিয়াছিল। সুফী পীরদের প্রভাবতো ছিলই। সেই হইতে কাব্য ও সঙ্গীতকলার চর্চাও এখানে চলিতে থাকে।' (২ পৃষ্ঠা-৩৪৩/৩৪৪)। পরাগলপুরের সৈয়দ সুলতান তেমনি একটি সমুজ্জ্বল দীপশিখা--তিনিও সুফী সাধক, আবার তিনিও রাধাকৃষ্ণের পদাবলী-গায়ক। একই সময়ে তিনি মুসলমান ধর্মের নিয়মনীতি নিয়ে কাব্য লিখছেন, সংস্কৃত 'হরিবংশের' অনুকরণে তিনি (খৃঃ ১৬৫৪) 'নবীবংশ' লিখেছেন--ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণও তাঁর সেই নবীদের অন্তর্গত।' (১ পৃষ্ঠা-১৬০)।

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হোসেন শাহার সেনাপতি পরাগল খানের নামেই এই গ্রামের নাম। কবিও পরাগলের বংশধর ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখা তিন খানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে-'জ্ঞান প্রদীপ' 'নবী বংশ' এবং 'শবে মেয়েরাজ' নামান্তর "ওফাৎ রসুল বা হজরৎ মহম্মদ চরিত'। জ্ঞান প্রদীপ যোগ সাধনার বই। নবীবংশ বিরাট কাব্য, ইহাতে বারোজন নবী অর্থাৎ অবতার-মহাপুরুষের কাহিনী বর্নিত হইয়াছে। নবীদের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং কৃষ্ণ আছেন। হরিবংশ-পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে কবি বিশেষ হৃদয়বত্তা ও সমদর্শিতা

www.pathagar.com

সহকারে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সমভূমিতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় কাব্যখানি একেবারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, নবী বংশেরই 'খিল' পর্ব অর্থাৎ শেষ খন্ড। (৩ পৃষ্ঠা-১০১)।

নবী বংশের উপসংহার শবে মেয়েরাজ, লেখা হইয়াছিল ১০৬৪ হিজরীতে (দশ শত রস যুগে অব্দ গোণ্ডাইল) অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে। (২ পৃষ্ঠা-৩৬০)।

সৈয়দ সুলতান নবী বংশে হিন্দু শাস্ত্র কিভাবে কাজে লাগাইয়াছেন তার নমুনা-

নর সবে পাইবারে পাপপূণ্য ভেদ
চারি মহাজন স্থানে আইল চারি বেদ।
ঋক্‌বেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার
নর সবে সেইকালে জ্ঞান পাইবার।
তবে যদি বিষ্ণুর হইল উতপন
যজুর্বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।

কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায়ঃ---

কত কত মোহন-মোহিনী জান
কুটিলকুন্তল-ফান্দ বেড়িয়াছে মুখচান্দ
গোপীগণে বাড়াইতে আশ
যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি
দেখা দিলে তিমির বিনাশ।
সুগন্ধি তিমির-কেশ ধরিছে মোহন বেশ
মুখচান্দ রহিছে ছাপাএ
একবারে অনুপাম নিশি দিশি এক ঠাম
লক্ষিবারে লক্ষণ ন যাএ।
কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্নাভিন
এ চান্দ-সুরুজ নহে তার
সৈয়দ সুলতানে কহু সেই সে আহ্মার পহু
দেখা না দে বিদিত সভার।
(২ পৃষ্ঠা-৩৬০-৬১)

সুফী ও যোগী সাধক সৈয়দ সুলতানের কবিত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় তাহার পদাবলীতে পাওয়া যায়। কয়েকটি পদে চর্যা-গীতির সঙ্কেতধ্বনি পাই। যেমনঃ----

কাহে কাহে ধনি বাগ বানায়া
দুনিআ মিছা ধান্ধা মায়া লাগায়া।
তুহ্মি আহ্মার গুরুজী আহ্মি তোর চেলা
তোর দরশন বিনু ফিরিএ একেলা।
হুঙ্কারে মারো হোঁ তীর দূরে গিয়া লাগে

www.pathagar.com

ফিরি লাগে তীর কামানেরি আগে।
নোনাকর চিড়িয়া রূপাকর বাটা
সখি গেঁও সবে সবে উরি গেঁও হাটা।
কহে সুলতানে এ ঘর খাখারা
যাইব মনুরা সব ফানারা।
(৪ পৃষ্ঠা-২৪৮-৪৯)।

বাংলায় কাব্য রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়দ সুলতান লিখেছেনঃ---
কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালী উত্তর্পণ
না বুজে বাঙালী সবে য়ারবি বচন।।
য়াপোনা দীনের বোল এক না বুঝিল,
পরস্তাব সকল লইয়া সব রৈল।।
(৫ পৃষ্ঠা-৭)।

বাংলায় সাহিত্য চর্চার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে, তিনি লিখেছেনঃ---
দেসেত য়ালিম থাকি জদি না জানা এ,
সে য়ালিম নারকে পড়িব সর্বথায়।।
নর সবে পাপ কৈলে য়ালিমেক ধরি।
য়াল্লায় সাক্ষাত মারিবেন্ত বেড়াবেড়ি।।
(৫ পৃষ্ঠা-৩)।

সৈয়দ সুরতান নবীবংশ রচনারম্ভে লিখেছেন-
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি-
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু-মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।
গ্রহ শত রস যুগে অব্দ গোঞাইল
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।
আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মুর্খ যত।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক।
(৬ পৃষ্ঠা-৫৯)।

উপরোক্ত কাব্যাংশের পঞ্চম লাইনে কবি যে রচনাকাল উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে পন্ডিতগণ এই অভিমত দিয়েছেন যে, সৈয়দ সুলতান ১৫৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দে নবীবংশ রচনা করেন।

নবী বংশে সৈয়দ সুলতান লিখেছেনঃ---

www.pathagar.com

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আদ্যেতে আছিল জাহা করিব প্রচার।
যেরূপে আদম ছফি হইল উৎপন
কহিম সেসব কথা বুঝিতে কারণ।
এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি লয়।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আকাশ পাতাল ক্ষিতি সৃজন যাহার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আদ্যেতে আছিল 'যাহা করিমু প্রচার।
যেরূপ আদম সফি হৈল উৎপন
কহিবাম সেসব কিঞ্চিত বিবরণ।
আলিমানগণে আমি মাগি পরিহার
ক্ষেমিবা পাইলে দোষ ন করি গোহার।
সৈয়দ সুলতানে কহে কেনে ভাবিমর
সহায় রসুল যার তরিবে সাগর।
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী হইছে
একে একে সভানের পরস্তাব রৈছে।
এক পুস্তকেত এত লেখিবারে নারি
এক রসুলের যদি এক পুথি করি
তবে কথঞ্চিৎ জান লেখিবারে পারি।
(৪ পৃষ্ঠা-৪৫৮-৫৫১)।

রসুল চরিতের শুরুতে তিনি লিখেছেন,

প্রথমে প্রণাম করি প্রভূ নৈরাকার
অর্ধেক যে আছিল কথা করিমু প্রচার।

দ্বিতীয়ে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
নূর মোহাম্মদের কথা শুন বিবরণ।

রসুল চরিতের গোড়ার দিকে লিখেছেনঃ-----

কিতাবে ত লিখিয়াছে যে সকল ভাল
সেই মতে নিরঞ্জন সৃজিল সংসার
প্রথমে কহিএ আমি সেসব প্রকার।
অঙ্গিকার আছিল তাহা করিলু প্রচার।

যে রূপে আদম সফি হইল উৎপণ

www.pathagar.com

নূর মোহাম্মদের কহিমু বিবরণ।

কহিল কিঞ্চিৎ কথা সে সব বিবরণ
এতে আমি কহিবাম শুন দিয়ামন।
(৪ পৃষ্ঠা-৪৭৫, ৪৭৯)।

সৈয়দ সুলতান বলেছেন,

যে সকল মুমীন হএ করুনা হৃদএ
নবীবংশ পুস্তক রাখিতে জুয়াএ।
এহি পুস্তক যদি পারে রাখিবারে
আল্লার গৌরব হয় তাহার উপরে।
(৪ পৃষ্ঠা-১০২)।

সৈয়দ সুলতান তাঁর সমগ্র রচনাকে 'নবীবংশ' বলে অভিহিত করে হযরত মুহাম্মদের ওফাত-পূর্বাবধি বর্ণনার পরে পাঠক ও শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ--

তোমরা সবের মুঞি জান হিতকারী
ইমা ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি।
যেরূপে সৃজন হৈল এ তিন ভূবন
যে রূপে আদম হাওয়া সৃজন হৈল।
যে রূপে যথেক পয়গম্বর উপজিল
বঙ্গেত এসব কথা কেহ না জানিল
নবীবংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল।

এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রচিলুম
আল্লা এক মনে ভাবি প্রচার করিলুম।
তে কারণে কত কত পশুবুদ্ধি নরে
কিতাব ভাঙ্গিলুম করি দোষএ আমারে।

ওফাত-ই-রসুলের উপসংহারে আছেঃ

উমর খাত্তাব যদি শহীদ হইল
তার পাছে আমীর উসমান রাজ্য পাইল।
উসমান নৃপতি ছিল দ্বাদশ বৎসর
পরস্তাব তাহান আছ এ বহুতর।
ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি যবে
কথঞ্চিৎ সেই কথা কহিতে পারি তবে।
(৬ পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮)।

নবী বংশের প্রারম্ভিক উক্তিতে তিনি বলেছেন,

বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম

www.pathagar.com

আল্লার মহিমা জান কহিতে অসীম।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার
আদ্যেত আছিল যাহা করিমু প্রচার।
দ্বিতীএ প্রণাম করি রসুল খোদার
নূর মুহম্মদ বলি জগতে প্রচার।
তৃতীএ প্রণাম করি আছব্বা সবারে
চতুর্থে প্রণাম করি পীর পয়গম্বরে।
(৬ পৃষ্ঠা-৬২)।

সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ আক্ষরিক অর্থে তাৎপর্যহীন। কারণ এই কাব্যে কোন নবীর বংশ কাহিনী বর্ণিত হয়নি। এতে আদম নবীর যে বংশধর কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে তাও পূর্নাঙ্গ নয়। ডঃ আহমদ শরীফের মতে নবীবংশ নামে কবি মুখ্যত নবী পরম্পরা নির্দেশ করেছেন।......অতএব 'বংশ" শব্দটিকে কুল, পুরম্পরা, সমূহ, গণ, বর্গ প্রভৃতি অর্থেই গ্রহণ করতে হবে এবং এই অভিধায় চিহ্নিত করলেই নবীবংশ নামের যথার্থ্য ও সার্থকতা স্বীকার করা সহজ হবে। (৬ পৃষ্ঠা-৭১)।

সৈয়দ সুলতান বর্ণিত কাহিনী কাল্পনিক। 'অবশ্য সেগুলো সৈয়দ সুলতানের বানানো নয়, তাঁর আগে হাজার বছর ধরে ওসব কাহিনী লোক পরম্পরায় তৈরী ও পল্লবিত হয়ে তাঁর কানে এসেছে। (৬ পৃষ্ঠা-৭১-৭২)।

নবী বংশ আরব দেশের কাহিনী। কিন্তু সৈয়দ সুলতান বাংলাদেশের কবি। এই কাব্য রচনায় তাঁর দেশের মানুষ, সমাজ এবং মানুষের আচার আচরণই তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। তাই তাঁর বর্ণনায় বাংলাদেশের রূপ বৈচিত্রই ফুটে উঠেছে।

'পূর্বে রচিত আরবী-ফারসী নবী কাহিনীকে আদর্শ করে সৈয়দ সুলতান স্বাধীনভাবে নবীবংশ রচনা করেছেন। তিনি বাংলা দেশের পটভূমিকায় এঁদের জীবন চিত্র এঁকেছেন। কবির বিবৃত কাহিনীর কাঠামো নিম্নরূপঃ-

বৈদিক নবীরা তথা বৈদিক মানুষেরা যখন ইব্লিসের প্ররোচনায় আদর্শ ভ্রষ্ট ও অনাচারী হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ রুষ্ট-বিরক্ত হয়ে বললেনঃ-----

না ধরিল পাপী সবে বেদের বচন।
বেদশাস্ত্র সৃজিয়া না কৈলা কোন কাজ
রাখ নিয়া চারিবেদ সমুদ্রের মাঝ।
মোর বাক্য লাঘিলেক যথ পাপিগণ
তেকারণে কৈল আমি সেসব নিধন।
শূণ্যকার পৃথিবী দেখিয়া নৈরাকার
আদমকে চাহন্ত ক্ষিতিত রাখিবার।
(৬ পৃষ্ঠা-৭১, ৭২ ও ৭৩)।

www.pathagar.com

আদমকে যে স্বর্গে বাস করতে দেয়া হয়েছিল তার বর্ণনাঃ----

মন্দ মন্দ বায়ু বহে কোকিল পঞ্চম গাহে
পত্রসব বিজুলি প্রকাশ।
চারিদিকে তরুগণ যেহেণ গহন বন
নবীসব বসে চারিপাশ।
(৬ পৃষ্ঠা-৭৩)।

উপরোক্ত দৃশ্য বাংলাদেশের বসন্তকালীন দৃশ্য নয় কী?

আকিমাকে পত্নীরূপে পাওয়ার জন্যে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ডের পর আকিমা কাবিলের মনে নীতিবোধ জাগানোর চেষ্টা করে-

তোর মোর এক জন্ম কেনে কর অপকর্ম
কিসকে করহ অবেভার
তোর মোর হৈলে ঘর অপকৃত্তি হৈব বড়
রহিবেক কূলের খাখার।
(৬ পৃষ্ঠা-৭৫)।

আকিমার অলঙ্কার ও সাজসজ্জা বর্ণনায়-

চুম্বিয়া যখন করে আলিঙ্গন
সঘন কিঙ্কিনী বাজে
নেপুর অনুক্ষণ বাজএ চরণ
রুনঝুন শব্দে বাজে
ঘাগর কিঙ্কিনী শব্দ মাত্র ধ্বনি
কুমারী বিমোহে লাজে।
....
কাঞ্চুলি ফাড়িল বসন খসিল
ভুলিল যত মান..................
বিশেষ ঘর্মজলে সিন্দুর কাজলে
একত্রে হই গেল মেল.............
চন্দন হইল দূর বসন খসিল উর
ছিঁড়িল কণ্ঠের মুক্তাহার
কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গ পরিহরি।.........
(৬ পৃষ্ঠা-৭৬)

মৃত্যুর আগে আদমের মনোভাব প্রকাশে বলা হয়েছে-

আরনা দেখিমু প্রিয়া তোমার চাঁদ মুখ
এহিসে মনেত মোর বড় লাগে দুখ।
কোনরূপে নিদ্রা তুমি যাইবা একসরী

www.pathagar.com

কিরূপে বঞ্চিবা নিশি আমা পরিহরি।

হাওয়ার আসন্ন বৈধব্য দুঃখে তাঁর বিলাপের বর্ণনা-

নয়নের জল পড়ে জিনি জলধর
ক্ষিতিতে পড়িয়া বিবি বিলাপিলা অতি।

আদমের মৃত্যুর পর হাওয়ার বিলাপঃ-

হতভাগী পুষ্প মুঞি আদম বিকাশ
মোহোর স্বামী নাহি মোর পাশ।

কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন
দক্ষিণ সমীর শমন সমান।
অনল হইয়া নিতি দগধে পরাণ।

আমার চাতক পিয়া গেলা দিগন্তর
জলধ হইয়া আমি আছি একসর।

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করহুঁ লেপন
চন্দ্রিমার জোত মো'ত লাগে হুতাশন।

আদমের মৃত্যুর পর পুত্র শিশকে জিব্রাইল প্রবোধ দানেব ছলে মানব জীবনের স্বরূপ জানানঃ---

জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতৈক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেতে মিশন।
স্বর্গের উৎপত্তি জান স্বর্গেত রহিব
কি কারণে তুমি সবেএ শোক ভাবিব।
(৬ পৃষ্ঠা-৭৬. ৭৭)।

আদমের মৃত্যুরে পর শিশ নবী হন। তার সাথে কাবিলের সন্তানদের (মূর্তি পূজকদের) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল,
বলি রাজা যথ অস্ত্র সব রাখিছিল
ইব্লিসে সেই অস্ত্র হরি লই আইল।
(৬ পৃষ্ঠা-৭৮)

সৈয়দ সুলতান নবীবংশে রসুলের (দঃ) ওফাত পর্যন্ত রচনা করেন। অবশ্য ওফাতে রসুলে যদিও ওমর ওসমানের কথা আছে। কিন্তু নবীবংশ সৈয়দ সুলতান সম্পূর্ণ করেন নি। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খানই এই কাব্য সম্পূর্ণ করেন।

www.pathagar.com

কবি দৌহিত্র বলে পরিচয় দানকারী কবি মুজফফর এর কবিতাংশ

'সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর
কহে হীন মুজফফরে এজিদ উত্তর।
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি
অশুদ্ধ হইলে শুধু ধীর করে ছাহি।
(৪ পৃষ্ঠা-২৯-৩০)

অপর দৌহিত্র কবি মুহাম্মদ মুকিম বলেছেন-

এবে প্রণামিব আমি পূর্ব কবি জান
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান।
(৬ পৃষ্ঠা-৫৩)।

এইসব কবিতাংশ উধৃত করে কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, সৈয়দ সুলতানের বাড়ী চক্রশালা (পটিয়া)। কিন্তু সৈয়দ সুলতান নিজ কবিতায় বলেছেনঃ---

লস্করের পুরখানি আলিম বসতি
মুঞি মুর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।

এখানে উল্লেখিত লস্করের পুর মানে হোসেন শাহী বংশের শাসনামলের সামন্ত শাসক লস্কর পরাগল খানের বসতি ও শাসনকেন্দ্র পরাগলপুর। তাঁর কাব্যে 'লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি-কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারী' উল্লেখ দ্বারা এটা সমর্থিত। পরাগল খান ছিলেন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সেনাপতি ও সামন্ত শাসক। পরাগলপুর প্রতিষ্ঠার শতাধিক বছর পর পুরাগল পুরে 'আলিম বসতি'র কথা উল্লেখে এটা প্রমানিত হয় যে, পরাগল খান ও ছুটি খানের পর পরাগলপুর শাসন কেন্দ্র না থাকলেও পুরাতণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তখনো অব্যাহত ছিল। আলোচ্য সময়ে অবশ্য আমরা পরাগলপুরের স্থলে জাফরাবাদকে সামন্ত শাসক নিজাম শাহের (আরাকান রাজের প্রতিনিধি) শাসনকেন্দ্র রূপে দেখি। সুতরাং নিজের জন্মভূমি না হলে একটি পরিত্যক্ত তথা গুরুত্ব হারানো স্থানে গিয়ে সৈয়দ সুলতানের কাব্যচর্চা করার যৌক্তিকতা নেই। অন্যদিকে শাসন কেন্দ্রের গুরুত্ব হারালেও পুরাতণ ঐতিহ্য অনুযায়ী সৈয়দ সুলতানের সময় কালেও 'লস্করের পুরখানি আলিম বসতি' ছিল।

আমরা আগেই বলেছি, পরাগল খান ও ছুটি খানের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী বাংলায় মহাভারত রচনা করেন এবং পরাগলপুরে রচিত মহাভারতই বাংলা ভাষায় রচিত আদি মহাভারত। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের আমলে পরাগলপুর ছিল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র। সৈয়দ সুলতানের বক্তব্য থেকে এই সত্য আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যায় যে, পরাগলখান ও ছুটি খান শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত কাহিনী সংস্কৃতে ও বাংলায় শুনতেন না, মুসলিম ধর্মকাহিনীর চর্চাও পরাগলপুরে ছিল। এই কারণেই পরাগলপুরে 'আলিম বসতি' গড়ে উঠেছিল। সে যুগে আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি বাংলায় রচনা করার মতো কোন

www.pathagar.com

সাহিত্যিকের অভ্যুদয় না ঘটলেও পরাগলপুরে বসতিস্থাপনকারী আলিমরা আরবী-ফারসী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যোলোচনা করতেন। পরাগলপুরের পরোক্ষ প্রভাবেই পরবর্তী সময়ে মুসলিম সাহিত্যিক শাহ মোহাম্মদ সগীর, সাবরিদ খান, সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজীর বাহরাম খান প্রমুখের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাঁরা আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য এবং মুসলমানদের মধ্যে হাজার বছর ধরে প্রচারিত কাহিনী ভিত্তিতে সাহিত্য রচনা করেন বাঙলায়।

সৈয়দ সুলতান একাধারে লেখক ও গায়ক, সুফী ও যোগী, পীর ও শিক্ষক। সৈয়দ সুলতান যে পীরালী করতেন তা তাঁর নিজ উক্তি দ্বারাই প্রমানিত হয়। তিনি বলেছেন,

> মুঞি যদি গুরুপদে করিলুঁ সেবন
> তবে জ্ঞান পাইবেক মোর শিষ্যগণ।
> মুঞি যদি পদবন্ধ না করিতুম সার
> মোহোর শিষ্যের হৈব এ হেন প্রকার।
> (৬ পৃষ্ঠা-৫৯)।

শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' মুসলিম কবি রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ-এই সত্য প্রমানিত। সাবরিদ খানও সমসাময়িক কালের কবি। সুতরাং তাঁর কাব্য বিদ্যাসুন্দর মুসলিম রচিত দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ। দৌলত উজীর রাহরাম খানের 'ইমাম বিজয়' ও 'লায়লী-মজনু, হচ্ছে মুসলমান রচিত তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থ। সে হিসেবে সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপ,' 'নবীবংশ' এবং 'শবে মেয়েরাজ' (নামান্তর উফাৎ রসুল বা 'হজরত মহম্মদ চরিত)' হয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও ৭ম গ্রন্থ। তবে এগুলো পরাগলপুরে রচিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রন্থ।

সুকুমার সেন, গোপাল হালদার প্রমুখ সৈয়দ সুলতানকে একজন যোগ সাধক রূপে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণের উপাসকরূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে মুহম্মদ আবদুল হাই 'বৃটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক সামাজিক পটভূমি' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, 'সৈয়দ সুলতানের নবী বংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ হিন্দু দেবতা ও উপদেবতাদের নবী বলে স্বীকৃতিদান এবং বাংলায় শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের অনুসরণে নবীবংশ রচনা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু প্রভাবের ফল। (৭ পৃষ্ঠা-৯)।

বস্তুতঃ সৈয়দ সুলতান সুফী-সাধক না যোগ-সাধক এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকে কাব্যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ায় এই বিতর্কের সৃষ্টি। কিন্তু সৈয়দ সুলতান আসলে কি ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্য চর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল তা, ডঃ আহমদ শরীফ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাঙলায় তথা পাক ভারতে ইসলাম পরিচিত ও প্রচারিত হয়েছে সূফী-সাধকদের অনলস প্রয়াসে। কোরান-হাদিসের ইসলামের সঙ্গে দেশজ মুসলমানের সম্পর্ক তখনো গৌণ (ধর্মীয় ভাষা আরবী না জানার কারণে)। শিক্ষিত মুসলমানেরাও আজন্মের সংস্কার বশে দেশ কালের প্রভাব এড়াতে পারেনি।

www.pathagar.com

তাই ভারতিক যোগানুগ মরমীয়া সাধনপদ্ধতিই মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত হয় (ষোল শতকে)। এ প্রভাব থেকে আলিমও রক্ষা পাননি, তার প্রমাণ পীর সৈয়দ সুলতান, পীর হাজী মুহম্মদ, পীর শাহাবদ্দিন, পীর শাহ দৌলা প্রমুখ যোগসাধনায় বিশ্বাসী আলীমগণ।.....কিছুটা শাসক শ্রেণীর পরোক্ষ প্ররোচনায় দেশজ মুলসমানেরা জ্ঞাতিত্ব (দেশীয়) ভুলে শাসক শ্রেণীর জ্ঞাতিত্ব গৌরব-স্বপ্নে আবর-ইরাণমুখী হয়ে উঠলেও হিন্দুদের প্রতি প্রতিবেশীসুলভ হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধার ভাব মুছে ফেলতে পারেনি। তাই হিন্দু পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত মুসলমানদের সাহিত্যিক প্রয়াসে রূপকল্প ও কাহিনী যুগিয়েছে এবং পরবর্তীকালে সত্যপীরাদি (সত্য নারায়ণও) লৌকিক উপদেবতার যৌথ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়েছে।----(আলোচ্য শতকে) ভারতীয় সুফীদের উপর বৈদান্তিক অদ্বৈত তত্ত্বের ও যৌগিক দেহতত্ত্বের গভীর প্রভাব পড়েছিল এবং চৈতন্যোত্তর যুগে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ও গাঢ়তর হয়েছিল, রাধা-কৃষ্ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক হয়ে ষোল-সতেরো শতকে বাঙালীর মন হরণ করেছিল। কিছুটা চিশতিয়া সুফীর অনুমোদনে এবং কিছুটা দেশ ও কালের প্রভাবে মুসলমান সমাজে রাধা কৃষ্ণ রূপকে সঙ্গীত সাধনরীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে, যুগ প্রভাবে, (কেননা বাঙলা দেশে রঘুন্দনেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সে সংস্কার আন্দোলনের পরেই চৈতন্য দেব নব-বৈষ্ণব মত প্রচার করেন) ইসলামী সমাজকে ধর্ম ও ইসলামের ঐতিহ্য সচেতন করবার প্রয়াস লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে মুসলিম সমাজে।.....সৈয়দ সুলতানের মধ্যে আমরা যুগের সর্বপ্রকার প্রভাব লক্ষ্য করি।.....সৈয়দ সুলতান পীর হিসেবেই মুখ্যত শিষ্যের প্রয়োজনে এবং গৌণত জনগণের কল্যাণে সাধন পদ্ধতি এবং আনুসঙ্গিক মৌল-বিষয়ক জ্ঞানদানের জন্যেই 'জ্ঞান প্রদীপ' রচনা করেন। আর চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সুফীদের মতো আধ্যাত্ম 'সঙ্গীত রচনা করে একাধারে সাধন, ভজন ও আত্মবোধনের উপায় করেছেন। এ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে আত্মার আকৃতি আর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা খুঁজেছে নিবৃত্তির উপায়। বস্তুত ষোল শতকে, মুসলিম সমাজে আধাত্মতত্ত্ব চিন্তার মাধ্যমেই ধর্মান্দোলনের শুরু।..... (তাই সৈয়দ সুলতানের) সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে ঐতিহ্য-সচেতন করে, মুসলমানদেরকে ধর্মবুদ্ধি দান করা, যাতে ইবলিসের তথা পাপের পথ পরিহার করে ন্যায় ও সততার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম তার ইহলৌকিক নিরাপত্তা ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। তিনি নীতি-ধর্মের ধারক, বাহক ও প্রচারক। তাঁর নবীবংশের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব হচ্ছেঃ শয়তান অন্যায় ও অপকর্মের প্রতীক তথা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের উৎস। রিপু রূপেই শয়তান মানুষের জীবনে আবির্ভূত হয়। অতএব রিপুর উত্তেজনাই শয়তানের প্রভাবের সাক্ষ্য। মানুষের মনুষ্যত্বের অরি হচ্ছে শয়তান তথা Evil force. এর সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া তথা অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থাকার সাধনাই মানুষ্য-সাধনা। এ সংগ্রাম আদম থেকে মুহম্মদ অবধি কিরূপে স্বার্থক ভাবে পরিচালিত হয়েছে তার ইতিহাসই নবীবংশে বিধৃত। শয়তান যাদের পেয়ে বসেছিল তথা যারা যুগে যুগে শয়তানের সেনাপত্য করেছে তাদের মধ্যে নুহর প্রতিদ্বন্দ্বি দানিয়াল, ইব্রাহিমের শত্রু নমরুদ, মুসার অরি ফেরাউন, দাউদের শত্রু আনসারী আর মুহম্মদের শত্রু

www.pathagar.com

আবু জেহেল প্রধান। শয়তানের তো নিজের কোনো অবয়ব নেই। সেতো সত্য ও শিব বিরোধী মানুষ কিংবা রিপু চালিত দুর্মতি রূপেই প্রতিপক্ষতা করে কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাকামীর সঙ্গে।.....ইবলিসের খপ্পরে পড়লে মানুষের যে কি মানসিক ও আত্মিক দুর্গতি হয়, তার কয়েকটি জীবন্ত চিত্রও রয়েছে নবীবংশে। কাজেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে স্বীকার করতে হবে যে, নবী বংশ নীতি-ধর্ম প্রচারোদ্দেশেই রচিত। অতএব, পীর, মীর ও সুফী মরমী কবি এই গ্রন্থ রচনা করে তাঁর সামাজিক কর্তব্য ও মুমীনের দায়িত্বই পালন করেছেন। .....দেশী ভাষায় গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের শুরু সৈয়দ সুলতান থেকেই।....(বস্তুতঃ) সৈয়দ সুলতান ধর্মের ক্ষেত্রে যুগ পুরুষ ও যুগন্ধর। (৬ পৃষ্ঠা-২০০ থেকে ২০৪)।

ডঃ আহমদ শরীফের গবেষণামুলক প্রবন্ধে উল্লিখিত যুক্তি ও তথ্য এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমান কবি মীর সৈয়দ সুলতান যোগী-সাধক নন, সুফী সাধক। তাঁর সাহিত্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকে বিশেষ গুরুত্বদান ইসলামের 'লায়েক রাহা ফিদ্দিন' উদ্ভুত এবং উদার মানসিকতার পরিচায়ক। "এই কাব্যটিতে (নবী বংশে) কবি বিশেষ হৃদয়বত্তা ও সমদর্শিতা সহকারে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সমভূমিতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" (৩ পৃষ্ঠা-১০১)। সৈয়দ সুলতান শুধুমাত্র মুসলিম লেখকদের বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন নি। নিজে বেদপুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত আত্মস্থ করে তার ভিত্তিতে ইসলামের নবীদের জীবনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে অমুসলিম সাহিত্যিকদেরও ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে, কোরান-কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ও আলোচনায় পরোক্ষভাবে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ সৈয়দ সুলতানের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিকের সুপ্ত চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তাই সৈয়দ সুলতানের সাহিত্য স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরো নিবিড় করেছিল।

সৈয়দ সুলতান অবশ্য একথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোন আলেম (জ্ঞানী) যদি নিজ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে নিজ সমাজকে উন্নত করতে চেষ্টা না করেন তবে সেই আলেম আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন এবং তাঁর শাস্তি হবে। এ কথার দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, তিনি মুসলমান বিদ্বান ব্যক্তিদের বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা করে মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করেছেন। বস্তুতঃ সৈয়দ সুলতান ধর্মের ক্ষেত্রে 'যুগপুরুষ ও যুগন্ধর' বলে ডঃ আহম্মদ শরীফ যে মন্তব্য করেছেন ঐ মন্তব্য দ্ব্যর্থহীন এবং সত্য।

ষষ্টদশ শতাব্দীতে সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাবে কারো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল কিনা তা জানা যায় না। পরাগলপুরের পরাগলী ও ছুটিখানী ঐতিহ্য তখনো অব্যাহত না থাকলেও পরাগলপুরে সাহিত্য চর্চার যে ভীত সৃষ্টি হয়েছিল তা, তখনো অটুট ছিল, এটা সৈয়দ সুলতানের লেখা থেকে ধারণা করা যায়। তাই তিনি পরাগলপুরকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য চর্চা করেন। সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্যিকের উপর সৈয়দ

www.pathagar.com

সুলতানের প্রভাব পড়েছিল এবং তাঁরা তাঁদের সাহিত্য চর্চায় সৈয়দ সুলতানকে পীর এবং গুরু হিসেবে অনুসরণ করেছেন। ডঃ আহমদ শরীফ এর 'সৈয়দ সুলতানঃ তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ" থেকে উধৃতি দিয়ে আবদুল হক চৌধুরী বলেছেন, 'পরবর্তী কালের চট্টগ্রামের ১৭ জন কবি তাঁদের রচিত কাব্যে সৈয়দ সুলতানকে কবি গুরু ও ধর্ম গুরু বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং প্রভাব স্বীকার করেছেন অথবা নামোল্লেখে তদীয় পৌত্র ও দৌহিত্র পীরগণের স্মরণ করেছেন। উক্ত ১৭ জন চট্টগ্রামী কবি হলেন, শেখ পরাণ, শেখ মুতালিব, মোহাম্মদ খাঁ, মীর মোহাম্মদ শফি, শরীফ শাহ (এই দুজন পৌত্র), কবি মোজাফফর (দৌহিত্র), মুহাম্মদ মুকিম (দৌহিত্র,) শেখ মনসুর, চুহর পন্ডিত, ফতেহ্ খাঁ, আবদুল করিম খোন্দকার, সৈয়দ নাসির, মোহাম্মদ আলী, মঙ্গল চাঁদ, শেরবাজ চৌধুরী, চম্পাগাজী ও পেতা গাজী। (৮ পৃষ্ঠা-৯৭)।

তথ্যপঞ্জী

১। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপ রেখা, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০ খৃঃ।

২। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ), ইষ্টার্ন-পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫ খৃঃ।

৩। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

৪। পুথি পরিচিতি-আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত ও আহমদ শরীফ সমপাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮ খৃঃ।

৫। সৈয়দ সুলতান-ওফাত-ই রসুল। সম্পাদক-আলী আহমদ, ১৩৫৬ বাংলা।

৬। ডঃ আহমদ শরীফ-সৈয়দ সুলতানঃ তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২ খৃঃ।

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৮৯ খৃঃ।

৮। আবদুল হক চৌধুরী-চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, ১৯৭৯ খৃঃ।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যযুগের আর এক প্রতিভা মোহাম্মদ খান ও তাঁর কাব্য

সৈয়দ সুলতানের প্রায় সমসাময়িক কালে কিংবা কিছু পরে আমরা আর একজন শক্তিশালী মুসলিম কবিকে পাই। ইনি মোহাম্মদ খান। তিনি নিজেকে সৈয়দ সুলতানের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং সুলতানের অসমাপ্ত 'নবী বংশ' সমাপ্ত করেছেন। মোহাম্মদ খান বলেছেন,

নবী বংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি
চারি আছাববার কথা কৈলুঁ পদাবলী।
দুইভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া
প্রলয়ের কথা সব দিলুঁ প্রচারিয়া।
অন্তে পুনি বিরচিলুঁ প্রভু দরশণ
এহা হোন্তে ধিক কথা নাহি কদাচন।
দুই পাঞ্চালিকা যদি একত্র করএ
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ।

দুই পাঞ্চালিকা নবীবংশ ও মুক্তল হোসেনকেই নির্দেশ করে। অতএর সৃষ্টি পত্তন থেকে ওফাত-ই-রসুল অবধি সমগ্র রচনার নাম 'নবী বংশ'। মুক্তল হোসেন এ একাদশ পর্বে হাসর অবধি বর্ণিত হয়েছে। কোন পর্বে কি আছে সে সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেনঃ-

আদি পর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব
দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব।...
কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন
চারি আসহাবার কথা শাস্ত্রের নিদান।....
কহিব তৃতীয় পর্বে হাসানের বাণী
জয়নবকে বিবাহ করিলা মনে গুণি।....
চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন...
কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধ অবশেষ......

www.pathagar.com

ষষ্টমে হোসেন পর্ব কহিবাম পাছে.....
সপ্তমেত স্ত্রী পর্ব কহিবাম পুনি.....
অষ্টমেত স্ত্রী পর্ব কহিবাম পুনি......
নবমে ওলিদ পর্ব শুন গুণিগণ....
দশমে এজিদ পর্ব কহিবাম এবে....
একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব।
যেন মতে দজ্জাল পাপী ভুলাইব নর
যেন মতে আসিয়া পুনি ইসা পয়গাম্বর।
মোহাম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি
যেমতে পালিবা লোক দজ্জাল সংহারি।
এয়াজুজ মাজুজ সেই দুই বাহিনী
যেন মতে হিসাব দিবেক সর্বজানি।

এটি যে পীর সৈয়দ সুলতানের আরব্ধ কার্যে সমাপ্তি দানের জন্যে রচিত তাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ-

হিন্দুস্থানে লোক সবে না বুঝে কিতাব
না বুঝি না শুনি নিত্য করে মহাপাপ।
তেকাজে সংক্ষেপ করি পাঁঞ্চালী রচিলুঁ
ভালমন্দ পাপ পূণ্য কিছু না জানিলুঁ।.....
পাঞ্চালি পড়িতে যবে মনে ভয় পাই
অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই।
কিতাবে আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে
দান ধর্ম পূণ্য কর্ম করিবেন্ত তবে।
অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আর্শীবাদ
মহাজন আর্শীবাদে খণ্ডিব প্রমাদ।
বিশেষ পীরের আজ্ঞা না যায় লঙঘন
রচিলুম পাঞ্চালিকা তাহার কারণ।
(১ পৃষ্ঠা-৬৮,৬৯,৭০)।

পীরের (সৈয়দ সুলতানের) পরিচয় দিতে গিয়ে মোহাম্মদ খান বলেছেনঃ-

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরস 'দধি'।
শ্যাম নব জলধর সুন্দর শরীর
দানে কল্পতরু পৃথিবী সমস্থির।
পূর্ণচন্দ্র ধিক মুখ কমল লোচন

www.pathagar.com

মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন।
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর
সেবক বৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর।
ভাবে ভবকল্পতরু গুণে রত্মাকর
সিদ্দিক সিদ্দিক সম ধর্মেত উমর।
উসমান সদৃশ লজ্জা আলি সমজ্ঞান
অসীম মহিমা পীর শাহ সুলতান।........
উদরেত বৈসে তান জগতের গুণ
বিজয় করিলা শাস্ত্র পৃথিবী ত্রিকোণ।
হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার
বহু যত্নে এহি রত্নে কৈলা করতার।...
নবী বংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।
(১ পৃষ্ঠা-৫৭-৫৮)।

ডঃ আবদুল করিম বলেছেন, সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খান তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে অলেক্ষ্যে মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময়কার কাহিনী এবং বিশেষ করে চট্টগ্রামে ইসলাম বিস্তারের ইতিহাসের উপর কিছুটা আলোকপাত করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাস রচনায় কবির বংশ-লতিকার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। (২ পৃষ্ঠা- ২২)।

কবি বংশ পরিচয়ে বলেছেনঃ-

পিতৃকুল

তবে পিতামহগণ প্রণামিএ একমন
পিতামহ মাহি আছোয়ার।
সিদ্দিকের বংশে জন্ম ওমরের সদৃশ ধর্ম
লজ্জায়ে ওসমান সমসর।।
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী দানেতে হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু সর্ব অস্ত্র শাস্ত্রে গুরু
জন্ম হইল আরবের স্থান।।
হাজী খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার।।
সহরিষে তানসঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।

www.pathagar.com

আসিতে সমুদ্র তীর সে হাজী খলিল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফরমান পাই এক মৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ।।
আল্লার অস্তুত করি সে মৎস্যের পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরী দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার।।
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে
দুই পীর বাড়ী লই গেলা।
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলম সুখী
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা।।
মাহি আছোয়ার তবে সে দেশ ভ্রমন্ত যবে
দেখিলেন্ত আচার্য-নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধরী জিনি সুধাহাসি মধুবাণী
নয়নে চকোর কমলিনী।।
তান মুখ জুত দেখি চকোর ভ্রমর আঁখি
পরস্পর বাসিলেক দ্বন্দ্ব।
বিধি ভাল সীমা কৈল সমুখে নলিনী হৈল
ললাটে শ্রী খন্ড অর্ধচন্দ্র।।
দেখি মাহি আছোয়ার পিতাস্থানে সে কন্যার
মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে।
আচার্য না দিল যবে ব্যাঘ্রে আরোহি তবে
বিপ্র দ্বারে আইলা তুষিতে।।
ভএ ধায় বিপ্রগণ আচার্যে ভাবিয়া মন
দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি
পুত্র প্রসবিলা যশস্বিনী।।
হাতিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
দানে জ্ঞানে দ্বিতীয় হাতিম।
পালন্ত ভিক্ষুক কুল বিক্রমে হামজা তুল
শৌর্য বীর্য দিতে নাহী সীম।।
তান পদ শিরে ধরি পঞ্চালি রচনা করি
তাহান নন্দন গুণনিধি।
সিদ্দিক তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম

www.pathagar.com

বদন কমল কলানিধি।।

সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু
সত্যবাদী সিদ্দিক সমান।
তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু
রাস্তিখান রূপে পঞ্চবান।।
চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন সচীপতি
তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহার নন্দন বলি র'সে দধি বলে শূলী
দানে হরিশ্চন্দ্র সমসর।।
তেজে অগ্নি কোপে সম মানেতে কৌরব সম
রণে যেন ভৃগুপতি রাম।
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিনা খান রূপে অনুপাম।
তানপুত্র গুণবান ভীমসম বলবান
কার্তবীর্য সম ধনুধারী।
জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু
যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি।।
ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যথাতি
ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
গাভুর খান গুণনিধি খিরে ক্ষিতি রসে' দধি
তাহানে প্রণামি বহুতর।।
করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি।
লইয়া পন্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ
রঙ্গ চঙ্গ কৌতুক অপার।।
তাহান নন্দন বর রসে যেন রত্মাকর
ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর
ঐশ্বর্যাদি নৃপ যযাতি।।
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজকুল জয়কেতু
জন্ম হৈল প্রচন্ড প্রতাপ।
গান্ধারী নন্দন মানে কর্ণবলী জিনি দানে
ভিক্ষুক জনের যেন বাপ।।

www.pathagar.com

বিজয়ে বিজয় সম বিলক্ষ কুলের যম
চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুবলিত বর
সুরন্ত সকল নারী আশ।।
প্রজার পালক রাম বাপ হোন্তে অনুপাম
বাহুবলে সামীলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরত খান জান
তান পদে করম মিনতি।।
প্রণামি তাহান পদ রচিব পঞ্চাল পদ
তানপুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথ্বি জিনি ধৈর্যবন্ত
গান্ডীবে অর্জুন সমসর।।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপগলি।
ক্ষেপান্ত করাল সেল নাশন্ত রিপুরকুল
জ্বলন্ত অনল হেন জানি।।
প্রশংসন্ত সর্বদেশ কীর্তিগান্ত সবিশেষ
মহিষ মারপ্ত এক বারে।
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি করিব অন্ত
এক শরে শার্দুল সংহারে।।
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত শিব যম
প্রজা পালিলেন্ত ধর্ম রাখি।
মুখ জুতি পূর্ণচন্দ্র হাস্য জিনি মকরন্দ
অমল কমদ দল আঁখি।।
দমন মুক্তা পাতি অধর রঙ্গিম অতি
ভুরু যুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘবাহু মধ্যচারু গজ শুন্ড দুই উরু
চরণ অমল কমলিনা।।
নারী-মুখ পদ্ম-ভৃঙ্গ সমরে সুদৃশ সিংহ
মধুবাণী সুধাসম হাসি।
তেজী গুরুজন ভীত সকল কামিনী চিত
শ্যাম খন মিলিবারে আসি।।
কেহ বোলে হর ভএ দেখি আইল কামরএ
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পুর্ণশশী কেহ বোলে নহে বাসি
কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক।।
কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর

www.pathagar.com

কেহ বোলে নহে এ সকল।
সুবশশী পঞ্চবান এহি সে জালাল খান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর।।
সে পদ-পঙ্কজ রেণু শিরে ধরি ফাগু জেনু,
রচিলুঁ পঞ্চালি অনুপাম।
তাহান নন্দন বলি বলে ভীম মহাশূলী
সমবেত ভৃগুপতি রাম।।
সুমেরু সদৃশ স্থির দানে জিনি কর্ণবীর
নতু কিবা হাতিম সমান।
বান্ধব পালক রাম রূপে অভিনব কাম
নতু ষড়াননের সমান।।
কোপে যুগান্তরের সম তেজশালী হুতাসন
দহএ যে হেন কানন।
শ্যাম নব জলধর যেন স্বর্গ বিদ্যাধর
চন্দ্রমুখ কমল নয়ান।।
ধর্মে ধর্ম জ্ঞানে গুরু সর্বসিদ্ধি কল্পতরু
মর্যাদায় সদৃশ রত্নাকর।
মধুসম বাক্য জান শ্রীযুত রহিম খান
তাহানে প্রণামি বহুতর।।
তাহান অনুজার পার্থসম ধনুর্ধর
বলে ভীম ধর্মে যুধিষ্ঠির।
কোপে অগ্নি আসে কুরু দানে কর্ণ কল্পতরু
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম স্থির।।
শাস্ত্রে অস্ত্রে অনুপাম রূপে অভিনব কাম
বদন অমল কমলিনী।
পর উপকার চারু দ্বিতীয় কল্পতরু
মধু হাসি অমিয়া সে বাণী।।
নিরঞ্জন অনুক্ষণ ভাবে অবিশ্রাম মন
নিছক নাহিক বিশ্বয়।
কমল নয়ন নীর বহএ যে অনিবার
স্মরিতে যে নিরূপ আকার।।
প্রভু মোবারিজ খান কমল চরণে তান
প্রণমি এ সহস্রেক বার।
তানসুত অল্পজ্ঞান মোহাম্মদ খান জান
পঞ্চালি রচিলুঁ শিশুবুদ্ধি।।
শুন কহি গুণী লোক অপরাধ ক্ষেমি মোক
গুণ কহিলু সফল সুদ্ধি।।
(৩ পৃষ্ঠা-১০১-১০৩)

www.pathagar.com

মাতৃকুল

এক মনে প্রণাম করম বারে বার
কদল খান গাজী পীর ত্রিভুবন সার।
যার রণে পড়িল অক্ষয় রিপুদল
ভএ কেহ মজ্জি গেল সমুদ্রের তল।
একসর মহিম হইল প্রাণহীন
রিপু যিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন।
বৃক্ষে ডালে বসিছিলা কাফিরের গণ
সেই বৃক্ষ ছেদি 'সবে করিলা নিধন।
তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম
পুস্তক বাড়ে এ হেতু না লেখিলুঁ নাম।
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম।
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান
শএখ শরীফুদ্দিন ত্রিভুবনে জান।
একমনে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ
শিক্ষাগুরু কল্পগুরু অতি বিতপণ।
প্রণামহোঁ তান সুত গুণের সাগর
কুলগুরু কাজী সে আলাম নাম ধর।
মহাসত্য মীর কাজী তাহান নন্দন
একমনে প্রণামহোঁ এ দুই চরণ।
তানসুত গুণযুত খান কাজী নাম
তাহান পদেও মোর সহস্র প্রণাম।
তাহান নন্দন জান সর্ব গুণালয়
করতার ভাবে তাহার হৃদয়।
শএখ হামীদ পীর জানে ত্রিভুবন
একমনে প্রণামি এ সে দুই চরণ।
তানসুত সুতনয় বুদ্ধি সুরগুরু
দুঃখিত জনের পতি ভব কল্পতরু।
যার করমেতে ভরি গেল ত্রিভুবন
বাবা ফরিদের পদে করম বন্দন।
তাহার ঔরসোদ্ভব ত্রিভুবনের সার
দশদিক ভরি কীর্তি হইল যাহার।
খেনেক মক্কাতে চলি যাএ সেই জন
তথা গিয়া সেবন্ত নিরূপ নিরঞ্জন।

www.pathagar.com

তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশ
যথাবিধি করতার সেবন্ত বিশেষ।
হামিদ আলাম পীর ভূবনের গতি
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি।
তাহান ঔরসোদ্ভব কুলের কেতন
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অতি বিতপন।
বধিল সে রিপুকুল করিয়া সংগ্রাম
আপনেহ স্বর্গবাসী হৈলা পরিণাম।
শাহা নাসিরুদ্দিন পীর মর্যাদা সাগর
চরণ রাজীতে প্রণামহোঁ বহুতর।
তাহান ঔরসে বিধি মানিক্য ধরিলা
সর্ব সুলক্ষণ শিশু তাতে উপজিলা।
পরম উজ্জ্বল কান্তি কমল লোচন
আখেরে কতুব হেন বোলে সর্বজন।
পীর মোকাররম নাম ভুবনের সার
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণাম বারে বারে।
তাহান কনিষ্ঠ সে যে পূজিত ভুবন
পূর্ণ চন্দ্রাধিক মুখ কমল লোচন।
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন-কান্তি উষ্ণ নাসা-দন্ড
দীর্ঘবাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচন্ড।
গৌড় রাজ্য-অধিপতি যাকে প্রশংসিলা
ভিক্ষুক জনের পতি যাহাকে বুলিলা।
চাটিগ্রাম পতি জান নসরত খান
আপনার প্রিয়সুতা দিলা যার স্থান।
বার বাঙ্গালার রাজা ঈশা খান বীর
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর।
স্নেহভাবে যাহাকে পূজন্ত প্রতিনিতি
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি।
সদর জাঁহা করি যার ভুবনে ব্যাখ্যান
পরম পন্ডিত গুণে রসের নিদান।
'পীর (-ই-) মুলুক' যারে বোলে সর্বজন
(বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুইচরণ)
এক মনে ভাবে যেবা এক নিরঞ্জন।
ক্ষমাকুল দয়াশীল মধুর বচন
শাহ আবদুল ওহাবের করম বন্দন।

www.pathagar.com

শাখ ভিখারী তানে বোলে সর্বজন
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ
তাহান নন্দন শ্যামাসুন্দর শরীর
পূর্নিমার চন্দ্রমুখ সর্ব শাস্ত্রে থির।
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসে' দধি
বহুল প্রকারে যারে সৃজিলেক বিধি
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে সেইজন
প্রভুভাবে বরে নীর কমল লোচন।
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে পুজএ যার পদ
আল্লার কালাম যার হএ কণ্ঠগত।
কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধির হেতু
মহাশয় মাতামহ কুল জয় কেতু।
ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে বাখানে
যা' হোন্তে পাইল পথ রোমাঙ্গীর গণে।
শাহ আহমদ পীর করম বন্দন
উদ্ধারহ মাতামহ পশিলুঁ শরণ।
মোহাম্মদ খান কহে মনে করি সার
তুম্মি মাত্র সহায় নরক হৈতে পার।
(৪ পৃষ্ঠা-২১০-২১১)।

উপরে বর্ণিত পিতৃকূল পরিচয় অনুযায়ী কবি মোহাম্মদ খান সোনারগাঁর সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের চট্টগ্রাম বিজয়ে সাহায্যকারী মাহি আসোয়ারের একাদশতম এবং চট্টগ্রামপতি রাস্তিখানের পরবর্তী অষ্টম বংশধর। কবির পিতৃকূলের পূর্বপুরুষেরা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং মাতৃকূলের পূর্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিক জগতে ও বিচার বিভাগে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। (২ পৃষ্ঠা-৩৩)।

মুহম্মদ খান রচিত মুক্তাল হোসেন (অর্থাৎ মকুতুল-হুসয়ন) কারবালার যুদ্ধ কাহিনী বিষয়ক আরবী গ্রন্থের ফারসী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। মুক্তাল হোসেনের প্রাচীনতম পুথিতে যে রচনাকাল জ্ঞাপক অংশ পাওয়া যাইতেছে তার পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া সম্পূর্ণ অর্থবোধ হয় না।

যেমনঃ--

মুসলমানি তেরিখের দশ শত ভেল
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহিগেল
হিন্দুয়ানি তেরিখের শুন বিবরণ
বাণ বহো সম অর্ধ আর বাণ শত।
বিংশ তিন দুন করি চাহ দিয়া দধি

www.pathagar.com

পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি।
সুরগুরু শেষ নিদগ্ধ (গুরু) আগে
মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে।
হইয়া নক্ষত্ররূপ উদি গেল শশী
দশদিগে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি।
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল
সেই রাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল।
(৫ পৃষ্ঠা- ১৬১)।

কিন্তু ইতোপূর্বে উল্লিখিত কবির মাতৃবংশ পরিচয়ে কবি বলেছেন যে, তাঁর মাতামহ ইশা খানের সংবর্ধনা লাভ করিয়া ছিলেন, একথা সত্য হইলে কবি (মুহাম্মদ খান) সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাহা হইলে কাব্যের (মুক্তল হোসেন) রচনা কাল ১৬৪৫-৪৬ হওয়া সম্ভব। (৬ পৃষ্ঠা-৩৬৩)।

গ্রন্থশেষে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবেঃ--

ভাবে ভবকল্পতরু মাহি-আসোয়ার
তান বংশে নসরৎ-খান গুণসার
তান সুত গণযুত শ্রীযুত জালাল (জামাল)........।
তান সুত অসীম মহিমা গুণবান
বান্ধবপালক পহু বিরহিম খান
তাহান অনুজ ধীর রূপে পঞ্চবাণ
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ মুবারিজ খান।
তানপুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ
অল্পবুদ্ধি বিরচিল পাঞ্চালিকা-পদ।
মুক্তাল-হোসেন কথা অমৃতের ধার
শুন গুণিগণ মনে আনন্দ অপার।
আমির হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরসোদধি।
শ্যাম নবজলধরসুন্দর শরীর
দানে কল্পতরু যুধিষ্ঠির-সম স্থির।
সুন্দর অধিক মুখ কমললোচন
মন্দ মন্দ মন্দ হাসি অমৃত সমান।
শাহা সুলতান পীর কৃপার সাগর

www.pathagar.com

সেবক বৎসল প্রভু গুণে রত্মাকর।
তাহার আদেশ মাল্য শিরেতে ধরিয়া
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালি রচিয়া।
(৬ পৃষ্ঠা-৩৬২)।

মোহাম্মদ খান তাঁর পীর মীর সৈয়দ সুলতানের নবী বংশ কাব্য সমাপ্ত করেন এবং মুক্তল হোসেন কাব্য রচনা করেন। উভয় কাব্যে 'লেখক নিজ পিতৃকল ও মাতৃকুল উভয় বংশেরই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। চাটগাঁয় মুসলমান অধিকারের ইতিহাসের পক্ষে এই বিবরণের মুল্য আছে। (৬ পৃষ্ঠা-৩৬৩)। মোহাম্মদ খানের কাব্যত্রয় মুসলমান রচিত ৮ম, ৯ম ও ১০ম গ্রন্থ।

মুহম্মদ খানের আর একটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ'। এতে তিনি বলেছেন,

ধনহীন দাতার বিপদে মনে দুখ
ধনবন্ত কৃপণে ভূঞ্জএ নানা সুখ।
নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনহীন স্বামী প্রতি প্রেম ছাড়ে নারী
মধুহীন ফুল যেন না লএ শুক শারী।
ধনবন্ত মুর্খক পূজএ সর্বলোক
ধনহোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর।
(১ পৃষ্ঠা-২২৪)।

সত্যকলি বিবাদ সংবাদ গ্রন্থ শেষে রচনা সমাপ্তিকালের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয় এবং তাহা হইতে কষ্টকল্পনায় ১৫৫৭ পাওয়া যায়। ইহা শকাব্দ হইতে পারে। তাহা হইলে খৃষ্টাব্দ হয় ১৬৩৫। (৬ পৃষ্ঠা-৫৫৬)।

গ্রন্থ সামাপ্তিতে কবি বলেছেন,

সত্যগুরু শেষ হইল অস্তে গেল শূর
উজ্জ্বল করিল চন্দ্র নক্ষত্রের পুর।
দশশত বাণ শত দশ দধি
রাত্রি হইয়া গেল সংসার অবধি।
সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম
গুরুজন চরণে সহস্র পরনাম।
(৭ পৃষ্ঠা-৪৩৪-৩৬)।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ খানের রচনাবলী প্রমাণ করে যে তিনিও ছিলেন একজন শক্তিশালী কবি। গুরু সৈয়দ সুলতানের মতো তিনিও ছিলেন জ্ঞানী। তিনি অলক্ষ্যে তাঁর কাব্যে ইতিহাস রচনার বিশেষ করে চট্টগ্রামের ইতিহাস রচনার উপাদান রেখে গেছেন।

মোহাম্মদ খান তাঁর মুক্তল হোসেন কাব্যে মঙ্গল কাব্যের রীতিতে বলেছেন,

শাহা আবদুল ওহাবকে করম বন্দন
শাহা ভিখারী তানে বোলে সর্বজন।
রঙ্গে ঢঙ্গে কলিঙ্গে পূজন্ত যার পদ
আল্লার আলাম (কালাম) হয়ে যার কণ্ঠগত।
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
পূর্বে বান্দিয়া কহিমু পূর্ব দিবাকর
পূর্বে উলে ভানু যে পশ্চিমে যায়ে ঘর।
উত্তরে বন্দিয়া কহিমু হেমন্ত কেদার।
যার হিমে ডংশে নাগে সয়াল সংসার।
দক্ষিণে বন্দিয়া কহিমু ক্ষীরনদী সাগর
চৌদ্ধ ডিঙ্গা লইয়া ভাসে সাধু সদাগর।
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
চতুর্দিক বন্দি মুঞি শির কৈলুম স্থির
শিরের পরে বন্দি কহিম নব্বই হাজার পীর।
নিশান বন্দিয়া কহিমু আলি মহাশয়ে
যে নিশান দেখিলে লোকের পাপ হৈব ক্ষয়ে।
নাকড়া বন্দম মুঞি ফুলের গোঁথনি
চান্দয়া বন্দম মুঞি মোকমে ঢাকনি
মোকাম বন্দিয়া কহিমু বিবির আসন
চেরাগ বন্দম মুঞি মোকাম রোশন।
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
মায় বন্দম গর্ভস্থিতি বাপ বন্দম দাতা
পৃথিবী বন্দিয়া কলিমু খাক বসুমাতা।
ওস্তাদের পায় বন্দম করিয়া ভকতি
তাঞি বিনে পৃথিবীতে আর নাহিগতি।

www.pathagar.com

oooooooooooooooooooooo
ডাইনে বন্দি সরস্বতী বামে বিদ্যাধর
গলায় তুলিয়া দেয় মা কোকিলের স্বর।
বন্দনা সমাপ্ত হৈল শুন কহি আর
মোহাম্মদ খানে কহে পাইবে উদ্ধার।।
(৬ পৃষ্ঠা-৫৬৬-৬৭)।

মোহাম্মদ খান তাঁর কাব্যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ সুলতানকে পীর এবং গুরু বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। গুরুর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করার কথাও বলেছেন। কিন্তু তিনি কোথায় কাব্য চর্চা করেছেন তা বলেন নি। তাঁর কাব্য চর্চার স্থান স্বীয় পীর ও গুরুর কাব্য চর্চার স্থান হওয়া বিচিত্র নয় বলে ধারনা করা সঙ্গত। অর্থাৎ মোহাম্মদ খানও পরাগলপুরকে কেন্দ্র করে কাব্য চর্চা করেছেন। তাঁর কাব্যে চট্টগ্রামের ইতিহাসের উপাদান এই মতেরই পরোক্ষ সমর্থক।

তথ্যপঞ্জী

১। ডঃ আহমদ শরীফ-সৈয়দ সুলতান-তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ। বাংলা একাডেমী, ১৯৭২।
২। ডঃ আবদুল করিম-চট্টগ্রামে ইসলাম। ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮১।
৩। সাহিত্য পত্রিকা-বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ বাংলা।
৪। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা-১৩৬৯ বাংলা।
৫। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-বাংলা প্রাচীন পথির বিবরণ, ১-১।
৬। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ)। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।
৭। পুথি পরিচিতি-আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

বাংলাভাষায় দ্বিতীয় প্রণয় কাহিনী
বাহরাম খানের লায়লী-মজনু

খৃষ্টীয় ১৫৩৮ অব্দে পাঠান যোদ্ধা শের শাহ শূরের হাতে গৌড়ের হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের পতনকালে উত্তর চট্টগ্রামের (উত্তরপূর্ব ও উত্তর পশ্চিম) শাসক ছিলেন হামজা খান। গৌড়ে শের বাহিনীর হাতে মাহমুদ শাহ আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করলে হামজা খান 'মসনদে আলা' উপাধি ধারণ করে উত্তর চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হামজা খান চট্টগ্রামে শেরশাহ এবং ত্রিপুরা রাজ বিজয় মানিক্যের আগ্রাসন রোধ করেছিলেন। হামজা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ খান (ছুটি খান নহেন) এবং তাঁর মৃত্যুর পর হামজা খানের পৌত্র (নসরৎ খানের পুত্র) জালাল খান উত্তর চট্টগ্রাম শাসন করেন। মুক্তল হোসেন কাব্যের লেখক কবি মুহম্মদ খান তাঁর বংশ পরিচয়ে হামজা খান, নসরৎ খান এবং জালাল খানকে চট্টগ্রামের শাসক বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁরা ছিলেন সমগ্র চট্টগ্রাম নয়, উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম চট্টগ্রামের শাসক। দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী-মজনু কাব্য এই মতেরই প্ররোক্ষ সমর্থক।

হামজা খানের সময় উত্তর পশ্চিম চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক ছিলেন নিজাম শাহ। সম্ভবতঃ তিনি সমগ্র নিজাপুর পরগনার শাসক ছিলেন। এই সামন্ত শাসক নিজাম শাহের রাজধানী ছিল ফেনী নদীর তীরে মীরসরাই থানার জাফরাবাদে। (এই জাফরাবাদ সন্দ্বীপ চ্যানেলে, আন্তিবোল সাগরে বিলীন হয়ে গেছে)।

সামন্ত শাসক নিজাম শাহের রাজস্ব উজির (দেওয়ান) ছিলেন মোবারক খান। মোবারক খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহরাম খান নিজাম শাহের (দেওয়ান) দৌলত উজীর (রাজস্ব উজীর) হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কবি। নিজাম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাহরাম খান লায়লী-মজনু ও ইমাম বিজয় কাব্য রচনা করেন। মধ্য যুগে কবি দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্য বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর কাব্যের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও বরিশাল অঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে অধ্যাপক আলী আহমদ বলেছেন। (১ পৃষ্ঠা-৬৮ থেকে ৭২)।

লায়লী-মজনু একটি প্রণয় কাব্য। এই কাব্যে কবি তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

পূর্বকালে নরপতি   ভূবন বিখ্যাত অতি
আছিল হোসেন শাহাবর।

www.pathagar.com

তান রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর।।
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহান গুণের অন্ত নাই।
অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।।
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী
যোগাইলা সভান আহার।।
বাতুল আতুর যথ পালিলেন্ত অবিরত
দান ধর্ম করিলা বিশেষ।
নটক গাইন জনে সত্য যথ কৃতি ভনে
প্রকাশ হইল সর্বদেশ।।
শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি
ডাকাইয়া আনিলেন্ত তাএ
কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার
তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।
প্রথমে ব্যাঘ্রের স্থানে ফেলিয়া দেখিল তানে
ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা।
দ্বিতীএ বান্ধিয়া শিলা সাগরেত বিসর্জিলা
নামাজ পড়িলা সুখে তথা।।
তৃতীএ বান্ধিয়া রাগে দিলেপ্ত হস্তীর আগে
গজে দেখি সালাম করিলা।
চতুর্থে জতুর ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে
আনলে দহিয়া পরীক্ষিলা।।
পঞ্চমে খর্গের ঘাতে পরীক্ষিলা নরনাথে,
খর্গ ভাঙ্গি হৈল খান্ খান্।
ষষ্টমে হানিয়া শর পরীক্ষিলা বহুতর
অঙ্গে না লাগএ একবাণ।।
সপ্তমে গরল দিয়া মহারাজ পরীক্ষিয়া,
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া ধর্মের সাজ ভালবাসে মহারাজ
প্রসাদ করিলা দুই সিক।।
নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পূরএ সাধ

www.pathagar.com

চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোভব মনোরম অমর নগর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস।।
লবনাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
শুভপুরী অতি দিব্যধাম।
চৌদিকে পর্বত গড় অধিক উঞ্চলতর
তাত শাহা বদর আলাম।।
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রাম।
আদ্যরূপে দানধর্ম করিলা পূণ্যের কর্ম
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম।।
অনুক্রমে বংশ কথ গঞিলেন্ত এই মত
গৌড়ের অধীন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহ সুর।।
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর।
রজনী সময় হৈলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পূরীর অন্তর।।
এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান।
তাহান বংশেতে উৎপতি।
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম।
সদাএ ধর্মেত তান মতি।।
তান প্রতি মহীপাল খেতাব অধিক ভাল
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজির।
সাধু সৎলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিত রঙ্গে
ধর্মরূপে তেজিল শরীর।।
তানপুত্র ক্ষুদ্র-সম নাম মোর বহরম,
মহারাজ গৌবর অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে।।
আসাউদ্দিন বন্ধু গুণনিধি জ্ঞান সিন্ধু
তান পদ মনে করি স্থির।
পুস্তক পয়ার সার যেন মুকুতার হার
রচিলেক দৌলত উজীর।।

(২ পৃষ্ঠা ১০ থেকে ১৩)।

www.pathagar.com

ইমাম বিজয় কাব্য বাহরাম খানের প্রথম গ্রন্থ। এটি কারবালা কাহিনী। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লায়লী-মজনু,' এটি প্রণয় কাহিনী। এটি একটি কল্পিত প্রণয় উপাখ্যান। আরবে কল্পিত হলেও সেখানে এই কিংবদন্তী চালু নেই। (২ পৃষ্ঠা -৩২)। লায়লী মজনু কাব্য রচনার কাল নিয়ে বিতর্ক ছিল। পন্ডিতদের সকল মতামত খন্ডন করে এই গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ বলেছেন যে, ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লায়লী-মজনু কাব্য রচিত হয়। (২ পৃষ্ঠা-২৪)।

কিন্তু জার্নাল অব দ্যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ বলা হয়েছে যে, ১৬১২-১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এই কাব্য রচিত হয়। (৪ পৃষ্ঠা-২৩৪)। শেষোক্ত তথ্যই গ্রহণ যোগ্য। কারণ কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক নিজাম শাহকে ধবল অরুণ গজেশ্বর বলে যে খেতাবে ভূষিত করেছেন তা' আরাকানের রাজারা সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নয়।

কাব্যে উল্লিখিত নিজাম শাহ নিজামপুর পরগনার শাসক ছিলেন। কারণ নিজামপুরের অস্তিত্ব ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বেও ছিল। বাহারীস্থানী গায়েবীতে বলা হয়েছে, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি কাসেম খানের বাহিনীকে নিজামপুরে থামতে হয়েছিল এবং নিজামপুর ছিল মগদের (আরাকানের) একটি প্রদেশ। (৩ পৃষ্ঠা-৪০৭)। নিজাম শাহের রাজধানী ছিল জাফরাবাদ। এটি বিলীন হয়ে গেলেও সেই বিলীন অঞ্চলে শহরের কোন অস্তিত্বের কথা কিংবদন্তী হিসেবেও চালু নেই। সে যুগে প্রদেশ পাল শ্রেণীর শাসকেরা শহরে এবং সামন্ত শাসকেরা গ্রামে বাস করতেন। সুতরাং আলোচ্য নিজাম শাহ সামন্ত শাসক ছিলেন এবং দৌলত উজির আসলে দেওয়ানই ছিলেন। বাংলা কাব্যে অতি প্রশংসার ভূরি ভূরি নজির আছে। সুতরাং এই কাব্যে বাহরাম খান তাঁর পৃষ্ঠপোষককে নৃপতি বানিয়ে ছেড়েছেন এবং নিজেও দেওয়ানের স্থলে দৌলত উজির হয়ে গেছেন।

বাহরাম খান জামীর কাব্য অনুসরণে এই কাব্য রচনা করেন। জামীর কাব্যে লায়লী উমাইয়া বংশের খলিফা আবদুল মালেকের পদস্থ এক কর্মচারীর কন্যা। কিংবদন্তীটি আরবের কোথাও চালু না থাকলেও কাব্যের ঘটনাস্থল ও পাত্র পাত্রী সব আরব। মজনু, যার আসল নাম কএস, সে আমির পুত্র। কএস ও লায়লীর প্রথম দেখা স্কুলে। সেখানেই একে অপরকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং সেখানেই দু'জনের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়।

কএস লায়লীকে বলেঃ--

জনমে জনমে দেব ধর্ম আরাধিলুঁ
যে সব পূণ্যের ফলে তোমাকে পাইলুঁ
তোমার বদন ইন্দু আমিয়ার আশ
চকোর চঞ্চল মতি হইলুঁ উদাস।
তোমার কমল মুখ দেখিয়া অনুপ
আকুল হইল মোর নয়াণ মধুপ।
তুমি বিনে অকারণ জীবন যৌবন
তুমি বিনে অকারণ এ তিনভুবন।

www.pathagar.com

লায়লীর উত্তরঃ--

প্রসন্ন হইল মোর দেব পরমার্থে
জগতেত জীবন হইল মোর স্বার্থে।
জীবন যৌবন মোর অমন হিয়া
প্রেম ভাবে হারাইলুঁ তোমাকে দেখিয়া।
ভাবের সাগরে অতি উঠিল তরঙ্গ
অনলে পড়িয়া যেন দহিল পতঙ্গ।
ডুবিল জীবন নৌকা ভাবের সাগরে।
প্রেমের কৃপাণ হানি বধিলা আমারে।
যাবৎ জীবন প্রেম না করিব ভঙ্গ
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।
(২ পৃষ্ঠা ৩৭/৩৮)।

লায়লী-মজনুর প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে গেলে লায়লীর পিতা-মাতা লায়লীকে ঘরে বন্দী করেন। অতঃপর মজনু লায়লীর জন্যে প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। অতঃপর লায়লীর পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব গেলে তা নাকচ হয়। কিন্তু পরে সম্মত হলেও মজনু লায়লীর কুকুরকে চুম্বন করে পাগলামীর পরিচয় দিলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। অতঃপর লায়লীর পিতা এক যুদ্ধে নিহত হলে বিজয়ী লায়লীকে বিয়ে করতে চান। লায়লী তা নাকচ করে। লায়লী প্রেমে উন্মাদ কএস মারা যায়। পরে লায়লীও মারা যায়। এটি একটি বিয়োগান্ত ঘটনা।

লায়লীর সঙ্গে মজনুর বিবাহ প্রস্তাব কবি বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ--

মজনু হইল যদি বিকল শরীর।
দারুণ জনক মনে জন্মিলেক পীড়।।
ইষ্ট মিত্র গণ সঙ্গে করিলা যুকতি।
কেমন উপাএ হৈব মজনু মুকতি।।
আন মতে উপদেশ নাহি প্রতিকার।
লায়লী দর্শনে মাত্র হৈব নিস্তার।।
বিবাহ মঙ্গল কার্য করহ রচন।
লায়লীর সঙ্গে হএ মজনুর মিলন।।
এথেক জানিয়া পিতা নিজ গনসঙ্গে।
চলিলা মালিক ঘরে আনন্দিত রঙ্গে।।
বারতা পাইলা যদি সুমতি সুজন।
আগুবাড়ি আসিয়া করিলা দরশন।।
বিচিত্র মন্দিরে নিলা কুতুহল মনে।
দিব্যাসনে বসাইলা পরম যতনে।।
অন্যে অন্যে দুইগণে শোভিত সদন।

www.pathagar.com

বিবিধ বিধান রূপে করাইলা ভোজন।।
আমীর সুমতি তার বিনয় বচনে।
কহিলা পিরীতি রূপে মালিকের স্থানে।।
শুনহ সুমতি বড় গুণের নিধান।
নিবেদন করি আমি কর অবধান।।
পুত্র এক আছে মোর প্রাণের দোসর।
গুণের গরিমা অপরূপ মনোহর।।
সমর্পিতে চাহি তারে তোহ্মার চরণ।
আছাদন কর যদি সকরুণা মন।।
বিবাহ বচনা কর কন্যা দান দিয়া।
রহিবে তোমার যশ ভূবন ভরিয়া।।
এই শুভ কর্ম যদি করহ রচন।
বহু মুল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন।।
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত।
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ।
পঞ্চপত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ।।
আহ্মাকে জানিবা যেন নিজ পরিজন।
করিমু অনেক সেবা যাবত জীবন।।
পুত্রদান দিয়া মোর রাখহ পরাণ।
এ দুঃখ সাগর হন্তে কর পরিত্রাণ।।
মালিকে শুনিল যদি এসব কাহিনী।
হাসিতে হাসিতে দিলা পদুত্তর বাণী।।
শুনহ আমীর বর বচন উচিত
উচিত বচনে মাত্র না হইও দুঃখিত।।
তোহ্মার বালকবর হৈয়াছে পাগল।
বুদ্ধি শুদ্ধি নাহি তার সদাএ বিকল।।
নগরের শিশুগণে মারিয়া ফিরাএ।
লাজ মান হারাইয়া বনেতে বঞ্চএ।।
কলঙ্ক ভরিছে তাঁর আবর নগর।
দিগম্বর আকারে রোদএ নিরন্তর।।
এক তিল যে জন বঞ্চএ তার পাশ।
লাজমান মহত্ত্ব সকল হএ নাশ।।
যার রূপ দরশিতে ভয় উপজএ।
যার তনু পরশিতে হৃদয় কম্পএ।।

www.pathagar.com

তার সনে কিরূপে আনের হৈব মেল।
গোরস সহিতে যেন না মিলএ তেল।।
পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভএ বিবাদ।
মুর্খের সহিত খেল বিষম প্রমাদ।।
যদ্যপি কনক আসি দেখিতে সুরঙ্গ।
কোথাত কাটিছে কেবা আপনার অঙ্গ।।
আমীরে এথেক শুনি বুলিল বচন।
কভুহ পাগল নহে মোহর নন্দন।।
সুজনের প্রেমভাবে হইছে মোহিত।
এহিসে কারণে হৈছে আকুল রচিত।।
ভাবিনীর দরশনে ভাবক হৈব স্থির।
শান্ত হৈব হুতাশণ যদি পাএ নীর।।
পুত্রক আনিব আহ্মি তোহ্মার গোচর।
যদি দেখ পাগল করিও দুরান্তর।।
এ বলিয়া মজনুকে আনিতে চলিলা।
নজদ গহনে গিয়া ঢুড়িয়া পাইলা।।
বিশেষ প্রকার করি অনেক যতনে।
পুত্রক আনিলা পিতা আপন ভবনে।।
খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা।
স্নান করাইয়া ভাল বস্ত্র পরাইলা।।
যতনে আনিলা তবে মালিক গোচর।
সভামধ্যে বসাইলা গৌরব অন্তর।।
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র যেন বদন নির্মল।
বসিলেন্ত সমাজেত অধিক উজ্জ্বল।।
অষ্ঠ অঙ্গ সুলক্ষণ ভূগ্ন মোহন।
অপরূপ রূপ-নিধি নয়ান শোহন।
এক দিষ্টি হৈয়া সব লোক নিরীক্ষএ।
কুমারীর যোগ্য এই কুমার নিশ্চিএ।।
হেনকালে সুন এক বিচিত্র শরীর।।
লায়লীর পুরী হন্তে হইল বাহির।।
মজনু দেখিয়া তারে প্রেমের বিভোলে।
শীঘ্র গতি ধাইয়া ধরিলা সুন গলে।।
পরম ভক্তিরূপে প্রেমের তাড়না।।
চুম্বএ সুনের পদে পাসরি আপনা।।
কান্দএ উষ্ঙল রোলে দীর্ঘল নিঃশ্বাসে।

www.pathagar.com

অস্তুত করএ অতি সকরুণা ভাষে।।
শাস্ত্র মধ্যে দশগুণ তোহ্মার বাখান।
ভাবক জনের সব নিয়ম প্রধান।।
প্রথমে নাহিক মান লোকের বিদিত।
দ্বিতীএ নাহিক ধনসম্পদ সঞ্চিত।।
তৃতীএ শয়ন শয্যা মৃত্তিকা মন্ডল।
চুতুর্থে উদর নিত্য ক্ষুধাএ বিকল।।
পঞ্চমে অনেক যদি করএ প্রহার।
কদাচিত না তেজঅ ঈশ্বরের দ্বার।।
ষষ্ঠমে ঈশ্বর আদি নিজগণ রক্ষা।
ঘাত কর ঈশ্বরের যথেক বিপক্ষা।।
সপ্তমে তোহ্মার গুন বিদিত ভুবন।
ঈশ্বরের নিদ্রাকালে না কর শয়ন।।
অষ্টমে তোহ্মার গুন সদাএ নীরব।
নবমেত অল্পভক্ষ্য অনেক উচ্ছব।।
দশমে হইলে মৃত্যু নাহিক দায়ক।
বিদ্যা সিদ্ধ মহা দশ গুণের নায়ক।।
তোমার পদে মুঞি যাম বলিহার।
এহি পদে পরশিছ লায়লীর দ্বার।।
পরশিতে সেই দ্বার মোর ভাগ্য নাই।
পরশিতে সেই পদ উদ্দেশ না পাই।।
প্রেম ভাবে বিকলিত দারুণ মজনু।
নয়ানেত লাগাএ সুনের পদ রেনু।।
এথ দেখি মালিকে নয়ান বিদ্যমান।
হাসিয়া বোলন্ত তবে আমীরের স্থান।
যদি সে তোহ্মার পুত্র হইত পন্ডিত।
হেন মত না করিত সুনের সহিত।।
এমত মজনু সনে অযোগ্যতা কাজ।
কলঙ্ক ভরিব মোর আরব সমাজ।।
যে জন পন্ডিত হএ বুদ্ধির আগল।
নির্বিষের ভরসাএ না খাএ গরল।
মোর প্রতি আছে যদি গৌরব তোহ্মার।
না বুলিবা এসব বচন পুনর্বার।।
আমীর শুনিয়া হৈলা লজ্জাএ অস্থির।
পলটি আইলা তবে আপনা মন্দির।।
আসাউদ্দিন শাহা নির্মল উজ্জ্বল।
উজির দৌলতে কহে ভাবেত বিকল।।

www.pathagar.com

লায়লী-মজনুর বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে যাবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কবি আরবের উপাখ্যান বলে কথিত কাহিনী বর্ণনা করলেও এই কবিতায় একটি আরবী ফারসী শব্দও ব্যবহার করেন নি। ব্যবহার করেছেন বাংলা শব্দ। কবি মজনুর বিরহ বর্ণনা করেছেন এ ভাবেঃ-

পরম ভাবক বর মজনু সুজন।
প্রেমের সাগর মধ্যে ডুবাইলা মন।।
পরম ঈশ্বর ভাবে পাগল হইল।।
অমৃত মথনে যেন বিষ উগরিল।।
সংসারের মায়া মোহ অকারণ জানি।।
প্রেম রস ডোর দিয়া বান্ধিলা পরাণি।।
না বুঝিয়া লোক সবে বোলন্ত পাগল।
পাগল না হএ অতিগুণের আগল।।
কহিতে অকথ্য কথা শুনিতে অশক্য।
দেখিতে অদেখ যথ লক্ষিতে অলক্ষ্য।।
মধু কটু রস যেন ভক্ষিলে সে জানে।
পটেত লিখিয়া রস বুঝাইব কোনে।
শৃঙ্গারের রস যেন নপুংশক ঠাঁই।
কদাচিত না বুঝিব কহিলে বুঝাই।।
তেহেন প্রেমের রস যে করএ পাণ।
সেই সে বুঝএ তার বিষম সন্ধান।।
উদ্দেশিতে দিশ নাহি দশদিশ ঘোর।
স্থল নাহি স্থিতি নাহি নাহি অন্ত ওর।।
প্রেম পন্থ দুর্গম কন্টক বহুতর।
দুরান্তর দুরন্ত সে ঘোর ভয়ঙ্কর।।
যাবত মেহেন্দি সম পিষণ না যাএ।
কদাচিত লাগিতে না পারে রাঙ্গা পাএ।।
যদি হএ কাঙ্কই করাত লই চিড়ে।
তবে সে উত্তম কেশ ছুঁইবারে পারে।।
ভষ্ম হৈল মজনু প্রেমের হুতাশনে
পতঙ্গ দহিল যেন দীপ দরশণে।।
বিরহ আনলে ভষ্ম করিল তাহানে।
ভ্রমএ ভ্রমর হৈয়া প্রেমের উদ্যানে।।
বিদরিল হিয়া যেন ডালিম্ব সুপাক।
প্রেম জালে বন্দী হৈল ঠৈকিল বিপাক।

www.pathagar.com

প্রেম-রস পান করি হইল মাতল।
রবি তাপে রেণু যেন হইল তাতল।।
চরণে ফুটিল ক্লেশ-কন্টক বিশেষ।
শিরভেদি বিকশিল লোকে বলে কেশ।।
সহজে বদন তান কনক দরপণ।।
রেণুএ মণ্ডিত হৈল উজ্জ্বল কারণ।।
বিরহ আনল তাপে দহিল শরীর।।
নিবারিত আনল নয়ানে বহে নীর।।
নিবারিতে না পারএ মনের হুতাশ।
কুঠি অভ্যন্তরে যেন দহএ কাপাস।।
কহিতে মরম ব্যথা নাহিক ব্যথিত।
রহিতে নাহিক স্থল লিক্ষ্য দুঃখিত।।
সহজে পাগল নাথ উতাপিত মন।
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে না চিনে আপন।।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণে পারে লড়।
ক্ষেণে খাএ পাছার ভুমিতে গুরুতর।।
ভাঙ্গিয়া সম্পদ গৃহ করিলা উজাড়।
বিপদ- মন্দিরে গিয়া হইয়া সঞ্চার।।
অধিকারী হইলেন্ত কলঙ্ক নগরে।
ধরিলা দুঃখের ছত্র শিরের উপরে।।
মনের মানুষ যদি না পাইল খোঁজ।
তেজিলা শিরের পাগ জানি অতি বোঝ।।
বিনি পাদুকাএ যদি পারি চলিবার।
বৃথা কেন চরণে লইব এথ ভার।।
বসন ভূষণ তেজি দিগম্বর বেশ।
ভ্রমএ নজদ বনে দুঃখিত বিশেষ।।
প্রেমের কারণে এথ ঠেকিল প্রমাদ।
বনবাসী আত্মনাশী উম্মত্ত উম্মাদ।।
প্রাণের পরানি বিনে দগধে পরাণ।
হৃদয় শোণিত বিনে নাহি জল পান।।
মনের আনল বিনে নাহিক ভোজন।
নয়ান শয়ন তান হইল স্বপন।
মনেত না ভাএ তান জনক জননী।
সকল কুটুম্ব মাত্র লায়লী কামিনী।।
কলিকালে মানবী হইল সত্য-ভঙ্গ।

www.pathagar.com

তেকারণে তেজিলা মানবীগণ সঙ্গ।
বসতি করিলা গিয়া ঘোর বনমাঝ।
পশু পক্ষীগণ সঙ্গে করিলা সমাজ।।
তপোবনে তাপসী জপএ প্রভুনাম।
মায়াজাল কাটিল বর্জিল ক্রোধকাম।।
মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী।
পরম জ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।।
নয়ান চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ।
যাবতে বদন-ইন্দু উদিত না হএ।।
অহর্নিশি অবিরত দুই ভুরু-মাঝ।
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ।।
অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব।
ভবমধ্যে অভব ভাবেত মনোভাব।।
পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।
পূর্বের দহন ভএ লইলা শরণ।।
ধুইলা নয়ান পাপ নয়ানের জলে।
দহিল মনের তাপ মনের আনলে।।
দশ দ্বার মুদিলেন্ত না রাখিলা বাট।
পঞ্চশব্দ বাজএ নটকে করে নাট।।
নিজ প্রিয়া সহিতে বসিয়া সিংহাসনে।।
বিরলে কৌতুক করে না দেখাএ আনে।।

এখানে কবি মজনু যে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন তার নাম বলেছেন নজদ। নজদ আরবের পাহাড়। কিন্তু যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং ফলের নাম করেছেন তা বাংলাদেশের। সুতরাং কবি আরবের নামে বাংলার পাহাড়ের কথাই বলেছেন। (২ পৃষ্ঠা -১৬৫ থেকে ১৭৪)।

কবি লায়লীর বিরহ বিলাপের বর্ণনায় বলেছেনঃ-

মালিকের পুরী কনক চৌআড়ি
রাজধানী সমসর।
বিবিধ মন্দির বিচিত্র প্রাচীর
অপরূপ মনোহর।
চৌদিকে পুষ্পিত অতি সুললিত
জাতী যুথি বিকশিত।
মঞ্জরী মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
পিকরব সুললিত।।
সেই উপবনে সখীগণ সনে

www.pathagar.com

বঞ্চএ লায়লী বালা।
কাম উতাপিনী নব বিয়োগিনী
অন্তরে দারুন জ্বালা।
যথ সহচরী পরম সুন্দরী
এহি নিধুবন মাঝ।
রত্ন আভরন শোহণ মোহণ
ক্ষেণে তরঙ্গ বিরাজ।।
আকুলি বিকুলি দুখিনী রোহিনী
লায়লী বিরহ তাপী।
রঙ্গ কুতুহল জানএ বিফল
কান্ত নাম জপি জপি।।
কর্পূর তাম্বুল পরিমল ফুল
বিলাসএ যথ নারী।
বিরহিনী বর দহএ অন্তর
বহএ নয়ান বারি।
কেহ করে নৃত্য কেহ গায় গীত
কেহ বসি রঙ্গ চাএ।
লায়লী যুবতী বিষাদিত মতি
এক মনে নাহি ভাএ।
কাহার সহিত নাহিক পীরিত
বোল নাহি কার সঙ্গে।
এক মন সনে জপে রাত্রি দিনে
অন্তরে কাম তরঙ্গ।।
নিজ মন খেদ করিতে নিবেদ
নাহিক ব্যথিত জন।
পবন সম্বোধি বোলে হতবুদ্ধি
যত দুঃখ নিবেদন।।
শুনহ পরন জগত জীবন
শুনিছি তোমার নাম।
আমি বিরহিনী মরম কাহিনী
কহিএ তোমার ঠাম।।
তোমা অবিদিত নাহিক কিঞ্চিত
যথা দেখ মোর সাঞি।
মোর মনোরথ নিবেদন যথ
জানাইবা তাহান ঠাঞি।

www.pathagar.com

যেদিন অবধি নাথ গুণ--নিধি
নাহি দেখি অভাগিনী
জীবন যৌবন সব অকারণ
বিরহিনী তনু ক্ষীণি।
এ নব যৌবন দগধে পরাণ
বিফল বালেমু আশে।
যদি সে কমল শিশিরে দহল
কি করির মধুমাসে।।
কাহার হৃদএ শুলে হে বিন্ধএ
মোর বুকে পঞ্চবাণ।
সম্পদ গঞিল আপদ আইল
হরিল সকল জ্ঞান।।
অধিক সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া
পাইলুঁ গুণের ধাম।
হাসিতে হারাইলুঁ আপনা খাইলুঁ
বিধি হৈল মোর বাম।
দারুণ রোদন বিষম বেদন।
নয়ান ভেল মলিন।
বিরহ সন্তাপ সঘন বিলাপ
তনু হৈল মোর ক্ষীণ
হারালুঁ দুকূল হইলুঁ আকুল
না পাইলুঁ প্রভু রাজ।
কাহার স্মরণ লইমু এখন
ডুবিলুঁ সাগর মাঝ।
মোর কর্মভোগ এ দুঃখ বিয়োগ
তাত নাহি মোর ধিক।
তুমি প্রাণেশ্বর দুঃখিত অন্তর
সেই সে দুঃখ অধিক।।
প্রভু মহাশয় দীন দয়াময়
সদাএ দুঃখিত মন।
মুঞি অভাগিনী জনম দুঃখিনী
বিফল রাখি জীবন।।
দিবস রজনী প্রভু শিরোমণি
নাহিক শয়ন সুখ।
কোন নিদারুণ বিধি নিকরুণ

www.pathagar.com

সৃজিল এথেক দুখ।।
যখনে তখনে　　　　এই উঠে মনে
হাহা প্রভূ শিরোমনি।
পুনি তোম্মা সন　　　　না হৈল মিলন
মুঞি বড় অভাগিনী।।
এক কায় মনে　　　　তোম্মার চরণে
না পারিলুঁ ভজিবার।
মোর সমসর　　　　জগত ভিতর
ভাগ্যহীন নাহি আর।।
এই রূপে ধনি　　　　বিলাপ কাহিনী
কহিল মারুত ঠাঁই।
কিবা নিজ মন　　　　নতুবা পবন
দোসর ব্যথিত নাই।।
চিন্তামণি সম　　　　মহন্ত উত্তম
আসাউদ্দিন শাহা।
উজির দৌলত　　　　ভাবত সতত
পূরিতে মনের চাহা।।

(২ পৃষ্ঠা-১৬১ থেকে ১৬৪)।

উপরোক্ত কবিতায় লায়লীর পিতৃগৃহের ফুলের বাগানে যে ফুরের নাম করা হয়েছে সে ফুল আরবের নয়, বাংলাদেশের। বস্তুতঃ কবি এখানে আরবের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশেরই রূপ বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে, শাহ মোহাম্মদ সগীর এর ইউসুফ জোলেখা কাব্য এবং দৌলত উজীর বাহরাম খানের লায়লী-মজনু কাব্য পারস্যের এবং আরবের কাহিনী বা কিংবদন্তী ভিত্তিতে রচিত হলেও তাতে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এমনকি স্নানকেও গোসল বলা হয়নি। তাতে বোঝা যায় যে, এই কবিদ্বয় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় প্রাথমিক যুগের (মুসলমান লেখকদের মধ্যে) কবি হলেও তাঁরা বাংলা শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

তথ্য পঞ্জী

১। জমির আহমেদ-ফেনীর ইতিহাস। সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

২। দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত লায়লী-মজনু-ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। Baharisthan-i-Gaibi of Hamidullah Khan, Edited by Mirza Nathan, Vol-I,

৪। Journal of the Asiatic Society of Bengal, XV (1882).

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ও তাঁদের কাব্য

সৈয়দ সুলতান ও মুহম্মদ খানের কাব্য রচনার পরে মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত কবি মঙ্গল চাঁদ এর ইসলামের মহিমা জ্ঞাপক উপাখ্যান 'শাহজালাল মধুমালা কাব্যে সৈয়দ সুলতান ও মোহাম্মদ খানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে-

এসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল বলি তাহা না লেখিল।
আছিল এসব কথা আদ্যের বিচার
হাজার বাহাত্তর সনে হৈল প্রচার।
সৈয়দ সুলতান আর মোহাম্মদ খান
এসবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জন।
(১ পৃষ্ঠা-২১৭)।

নুরনামা ও কায়দানি কিতাব' নামক দুটি গ্রন্থ রচয়িতা শেখ পরাণ ছিলেন ষষ্টদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি। সীতাকুন্ডের এই কবি তাঁর নুর নামা'য় সৈয়দ সুলতানের নবী বংশের কথা উল্লেখ করেছেন,

শাস্ত্র নীতি কথা কহি কর অবধান।
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমাণ
নবীবংশে রচিছেন্ত সৈয়দ সুলতান।
(২ পৃষ্ঠা-৫৮)।

শেখ পরাণ তাঁর কায়দানী কিতাবে হাজী মুহম্মদ ও তাঁর গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেনঃ--

যদি বোল গোর হোন্তে না উঠিব পুনি
কাফির হৈয়া যাইব নরকেত জানি।
'সুরত নামার, মধ্যে ইমার সিফত
কহিছন্ত হাজী মুহম্মদ ভালমত।
তেকারণে এথা মুঞি না কৈলুঁ সমস্ত
কিঞ্চিত কহিলুঁ মুঞি ইঙ্গিতে বুঝিত।
(২ পৃষ্ঠা-৯২)- নসীয়ত নামা-পৃষ্ঠা-১৬৫১৬৬)

সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ও 'নুরনামা' লেখক শাহ মীর মুহাম্মদ সফী হাজী মুহম্মদকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেনঃ-

www.pathagar.com

'কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখ মতি
এহলোক পরলোক সেই দূরগতি।
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাহলুঁ সেই পথের নির্দেশ।
কহে মোহাম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
যার ঘর্মে সৃষ্টি উৎপন।
পীর হাজী মুহম্মদ শিরে বন্দী তান পদ
পাইতে সে নূরের দরশণ।
(২ পৃষ্ঠা -৯৩-৯৪)।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সীতাকুন্ডের কবি, শেখ পরাণের পুত্র শেখ মুতালিব তাঁর 'কিফায়তুল মুসাল্লিন' কাব্যে সৈয়দ সুলতানের নবী বংশের কথা উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ হাসান অর্থাৎ সৈয়দ সুলতানের পুত্র তাঁর পীর ছিলেন। শেখ মুতালিব লিখেছেন-

কিফায়তুল মুসাল্লিন শুন দিয়া মন
বঙ্গ ভাষে কহে শেখ পরাণ-নন্দন।
সব মসায়েল তিনি করি একাত্তর
কহিয়াছে কায়দানি কেতাব ভিতর।
(২ পৃষ্ঠা ৭০)।

....
পীরপদে প্রনামিএ সৈয়দ হাসান
মীর মুহম্মদ সফী তাহান নন্দন।
(২ পৃষ্ঠা-৬৩।

....
সীতাকুন্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন
তাহান নন্দন হীন শেখ মতালিব ভান।
(১ পৃষ্ঠা-২০০)।

....
নবী বংশে যে সকল প্রসঙ্গ আছ এ
পুনি তাক লিখিবারে উচিত না হএ।

....
শবে মে'রাজে আছে যুদ্ধ বিবরণ
পুনি এথা কহি তাক নাহি প্রয়োজন।
(৩ পৃষ্ঠা-৪৬)।

শেখ মুতালিব তাঁর গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করেছেন আরবী আবজাদ রীতিতেঃ

ইসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত

www.pathagar.com

সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।
সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম
সেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম।
পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম।
কিফায়তুল মসল্লিন রাখিলাম নাম।

এ থেকে যথাক্রমে ১০৪৮-১০৪৯ হিজরী তথা ১৬৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়।
(৪ পৃষ্ঠা-৪৮-৪৯)।

'শির্নামা' রচয়িতা শেখ মনসুর (১৭০৩) লিখেছেন,

সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন
ভাগ্য ফলে হৈলুঁ আমি তাহার অধীন।
তানপদ পাদুকার রেনু ভুরু দেশ
দিয়া মনে আশা করি আছি এ বিশেষ।
(২ পৃষ্ঠা-১৫)।

'লালমতি সয়ফুল মুলকের' রচয়িতা কবি শরীফ শাহও সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন-

শাহ সুলতান সৃত সর্বগুণে অলঙ্কৃত
তান পদে করিয়া ভকতি।
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি
শরীফ যাহার ভবতি।
(৪ পৃষ্ঠা-৫১)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাগমালা ও পদাবলী রচক চট্টগ্রামবাসী চম্পাগাজী শ্রদ্ধার সাথে সুফী সাধনার গুরু হিসেবে সৈয়দ সুলতানকেই স্মরণ করেছেন-

এক গৃহের দশ দুয়ার ধরিয়াছে মুখে
শ্রীমুখের ধ্যান কহিলাম সুখে।
শাহ সুলতান পদ মানি চম্পাগাজী কহে
লাহুতের ঢেউ পড়ে মানিক্য গলায়।
(৫ পৃষ্ঠা-১৬৫)।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধের কবি দুল্লা মজলিস রচয়িতা আবদুল করিম খোন্দকারও তাঁর কাব্যে সৈয়দ সুলতান রচিত নবী বংশে'র, উল্লেখ করেছেন এভাবে--

বিশেষ ন কহি আমি আদমের কথা
নবী বংশ পুস্তকেত আছএ ব্যবস্থা।
(২ পৃষ্ঠা-২৪০)।

www.pathagar.com

দুল্লা মসলিস গ্রন্থে আদম, ইব্রাহিম, আয়ুব, মুসা, ইসা, মুহম্মদ প্রমুখ নবী এবং ফাতেমা, আলী, হাসান বাশরী প্রমুখের বিবরণ এবং রোজা ও বেহেস্তের কথা আছে। (৪ পৃষ্ঠা-৫৬)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি, রাউজানের নয়াপাড়া নিবাসী 'গুলে বকাউলি' উপাখ্যানের রচয়িতা কবি মুহাম্মদ মুকিম তাঁর কাব্যে পীর বন্দনায় বলেছেন-

সৈয়দ সুলতান বংশে শাহাদুল্লা নাম।
একে তান ভ্রাতৃপুত্র দুতীয়ে জামাতা,
সর্বশাস্ত্র বিশারদ শরীয়ত জ্ঞাতা।
তানপুত্র শ্রীসৈদ মোহাম্মদ সৈয়দ
নিজপীর স্থানে সেই হইল মুরীদ।

....
পীর মীর মুহম্মদ সৈদ'ক সালাম

....
শ্রীযুত মুহম্মদ সৈয়দ পীরবর।
তান পদ প্রণামিয়া শ্রীলএ মুকিম
নর-পরী ভাব গ্রন্থ কহে সুকৃতিম।

অপর কাব্য ফায়েদুল মকতদীতে লিখেছেন-

প্রেমরস কাব্য কলা সুগন্ধি শীতল
কালাকাম ভাঙ্গি কৈলুঁ পয়ার নির্মল।
মৃগাবতী নামে আর পরীর নন্দিনী
মিত্রজনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী।
'মোরে আজ্ঞা দিল পীর রচিতে পয়ার
দেশী ভাষে রঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার।
আয়ুব নবীর কথা আছিল কিতাবে
পয়ার না কৈলুঁ তাহে মন্দ কহে সবে।
সুরস কথন অতি দুঃখ ব্যবহার
কিঞ্চিৎ লেখিলুঁ তাহে প্রকাশি পয়ার।
(৪ পৃষ্ঠা-৫১ ও ৫২)।

মুকিমের পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র সৈয়দ মুহাম্মদ সৈয়দ। পীর বন্দনায় তিনি সৈয়দ সুলতানকেও প্রণাম জানিয়েছেন।

এবে প্রনামিব আমি পূর্ব কবি জান
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান।
(২ পৃষ্ঠা-৯২)।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সৈয়দ সুলতান যে চক্রশালা নিবাসী নন তা' আগেই বলা হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে কাব্য রচনার কাল উল্লেখ করেন নি। তবে নিম্ন বক্তব্য থেকে বোঝা 'যায় যে, এই কাব্য-১৭৬০ খৃষ্টাব্দের অনেক পরে রচিত-

ইংরেজ নৃপৃতি সে যে ফিরিঙ্গির জাত।......
চিরকাল ইঙ্গরাজ এথা মহিপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল।
(৪ পৃষ্ঠা-৫২)।

কবি মুকিমের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে, এদেশে ইংরেজ আগমণ বা প্রভাব তিনি পছন্দ করেননি।

পদকার কবি ফতেখান বলেছেন,

কহে ফতেখান, সখি
উপায় আজএ নাকি
শ্রীযুত ইব্রাহিম খান
ভবকল্পতরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ সুলতান।
(৫ পৃষ্ঠা-১৯০)।

এখানে উল্লিখিত ইব্রাহিম খান কবি মুহম্মদ খানের কাকা এবং চট্টগ্রামে আরাকানী উজির (১৫৮৫) ইব্রাহিম খান হবেন। কারণ চট্টগ্রাম ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (আওরঙ্গ জেব কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত) আরাকানের অধীন ছিল।

একটি কবিতায় ফতেখান আলাওলের নামও উল্লেখ করেছেনঃ-

কহে ফতেখানি যে হি পাইল ধ্বনি
সোহি পুরুষ বর জান।
পুরল মনোরথ সকল কলাবত
শ্রী আলাওল খান।
(৫ পৃষ্ঠা-১৯০)।

আঠারো শতকের শেষার্ধের কবি সৈয়দ নাসির তাঁর সিরাজ ছবিল-গ্রন্থে' সৈয়দ সুলতান ও আলাওলকে প্রণাম করেছেন,

সৈয়দ সুলতান কবি আলাওল আর
দোহ পদে প্রনামিএ হাজার হাজার।
(২ পৃষ্ঠা-৫৯৭)।

আঠারো শতকের শেষার্ধের আর এক কবি, শাহপরী, হাসন বানু প্রভৃতি উপাখ্যান এবং হায়াতুল ফেকা রচয়িতা মোহাম্মদ আলী তাঁর কাব্যে 'নবী বংশ' এর কথা উল্লেখ করেছেনঃ-

www.pathagar.com

তার কত অব্দ শেষে খলিফা সৃজিছে
তার সন নিরূপণ নবী বংশে আছে।
(৪ পৃষ্ঠা-৫৬)।

সতেরো আঠারো শতকের কবি, মল্লিকার সওয়াল বা 'ফকর নামা' গ্রন্থের লেখক শেরবাজ চৌধুরী তাঁর কাব্যে সৈয়দ সুলতানের নবী বংশ এর কথা উল্লেখ করেছেনঃ-

নৃপতি নন্দিনী বালা কৈল জিজ্ঞাসন
মাতা পিতা বিনে জন্ম বল কোন জন।
আবদুল্লা এ বলে, শুন, আয় দন্ডধর
মাতা পিতা বিনে জন্ম পঞ্চ পয়গম্বর।
প্রথমে আদম সফি দ্বিতীয়ে হাওয়ার
তৃতীএ হইল জন্ম নামে সালেহার।
চতুর্থে হইল জন্ম নামে ইসমাইল
মরিয়ম সুত ইসা পঞ্চমে জন্মিল।
মাতা পিতা বিনে জন্ম এই পঞ্চজন।
নবী বংশে লেখিয়াছে সেইসব কথন।
(২ পৃষ্ঠা-৪২১)।

ককসবাজারের পেতাগাজী পন্ডিত ওরফে হাসান আলী তাঁর 'জমিদার পরিবার' গ্রন্থে কবি হিসেবে সৈয়দ সুলতানের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার চট্টগ্রামবাসী কবি মোহাম্মদ চুহর (১৮০৪-৫০) আজর শাহ সমনরোখ প্রণেতা। তাঁর কাব্যে সৈয়দ সুলতান ও আলাওলকে প্রণাম করেছেন,

আদ্যগুরু কল্পতরু সৈদ সুলতান
কবি আলাওল পীর মোহাম্মদ খান।
(৪ পৃষ্ঠা-৫৩)।

আঠারো শতকে শমসের গাজী নামে এক দুঃসাহসী ব্যক্তি ফেনী অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ত্রিপুরাও (কুমিল্লাও) অধিকার করেছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে ডাকাত বলে অভিহিত করলেও তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা এবং প্রজাবৎসল শাসক। সৈয়দ সুলতান বংশের পঞ্চম পুরুষ অর্থাৎ সৈয়দ সুলতানের পৌত্র মীর মুহাম্মদ শফীর পৌত্র গদা হোসেন খন্দকার ছিলেন শমসের গাজীর পীর। কবি শেখ মনোহর তাঁর 'গাজী নামা'য় বলেছেন যে, আরাকান রাজ সৈয়দ সুলতানকে একখানা তরবারী ও একটি খোড়া উপহার দিয়েছিলেন। গদা হোসেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই তরবারী খানি এবং ঘোড়ার একটি বংশধর একজন অনুচর মারফৎ শীষ্য শমসেরকে উপহার দিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। শেখ মনোহর শমসের গাজীকে দেখেন নি। কিন্তু তিনি ঢাকার নওয়াব দরবারে গাজীর প্রতিনিধি কবির দাদা তাহের উকিলের কাছে শোনা কাহিনী লিখেছেন এভাবে,

www.pathagar.com

গদা হোসেন খোন্দকার পাঠাইছে মোরে
তাহান গোচরে আজু নিবারে তোমারে। ....
নম্রশির হই পীর ভজিলেক গাজী
....
প্রশংসিল পীর মীর আল্লা হৈল রাজি।
তবে তালিব কৈল ভেদাই মঞ্জিল
মারফত ভেদ কহে সকল শিখিল।
দিলেক হাজার তঙ্কা পীর মীর পায়।
পীরও- হাজার তঙ্কাঁ মূল্যের ঘোড়া অস্ত্রবর-
গাজীকে খেলাত দিলা কৃপার সাগর।
পীরে বোলে শুন কহি পিরুবান সুত
এহি ঘোড়া খড়গ জান কিম্মত বহুত।
রোসাঙ্গে মগধ রাজা ধার্মিক আছিল
সৈয়দ সুলতান প্রতি এহি দ্রব্য দিল।
সুলতানে বকসাইল আপনা বেটারে
পর্যাক্রমে আসিয়া ঠেকিল মোর করে।
তাহান বংশের আমি ক্ষুদ্র এক বিন্দু
তপন ভূবন মাঝে সাগরের ইন্দু।
নাসির যাইব মারা পাইবা জমিদারী
রাজবংশ ভঙ্গে দেশ হইবা অধিকারী।
এহি খড়গ অশ্ব তোমা দিনু মত কারণ
যুদ্ধে বিজয় হৈব জানিও আপন।
গাজীএ বুলিলা পীর কথেক বৎসর
পীর রোলে পঞ্চ বিংশ জানিও সত্তর।
এ বুলিয়া পীর মীর চলি গেলা দেশ।
(৪ পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫)।

সৈয়দ সুলতান নবীবংশ, জ্ঞান প্রদীপ ও পদাবলী রচয়িতা এবং জয়কুম রাজার লড়াই নামে একটি স্বতন্ত্র কাব্যেরও রচক। (৪ পৃষ্ঠা-৭০)। সৈয়দ সুলতান শুধুমাত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রভাবশালী কবি। ষষ্টদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন কবি, বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিদের লেখা থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, প্রায় দু'শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যও সাহিত্যিকদের উপর সৈয়দ সুলতানের অসামান্য প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। এই দুই শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা বিচরণ করেছেন, বিশেষ করে চট্টগ্রামে, তাঁদের কেহই এই কবির প্রভাব মুক্ত ছিলেন না।

www.pathagar.com

ত্রিপুরার কবি শেখ চাঁদ, শেখ সাদী, নোয়াখালীর কবি আবদুল হাকিম প্রমুখ সৈয়দ সুলতানের প্রভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে থাকেন।........ কক্সবাজারের লোক-কবি বিশ শতকেও আদি কবি বলে সৈয়দ সুলতানকে স্মরণ করেছেন। এতেই বোঝা যায়, সে যুগে সাহিত্য ও সমাজ ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের ভূমিকা ও ব্যক্তিত্ব গত শতকের রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতোই ছিল। (৪ পৃষ্ঠা-২০৪)।

বস্তুতঃ একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যায় যে, সৈয়দ সুলতান ছিলেন মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী কবি। পরাগলপুরে পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্ঠ পোষকতায় যে সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়েছিল সৈয়দ সুলতানের মাধ্যমে তা, চট্টগ্রামে বিকশিত ও আরাকান রাজসভায় গিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং 'চট্টগ্রামে বিকশিত সাহিত্য পরিশেষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত রচনা করে।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫।

২। পুথি পরিচিতি- আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত ও ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

৩। সাধক কবি হাজী মুহম্মদ-বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ন ১৩৬৭।

৪। ডঃ আহমদ শরীফ-সৈয়দ সুলতান- তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ-বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২।

৫। মুসলিম কবির পদ সাহিত্য।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অন্যান্য কবি ও তাঁদের কাব্য

গোপাল হাল্‌দার তাঁর "বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা"য় ডঃ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"কে একালের বাঙালীর গবেষণা, পান্ডিত্য ও অক্লান্ত সাধনার আশ্চর্য নিদর্শন এবং 'বাঙলা সাহিত্যের কথা'কে তথ্য ঠাসা গ্রন্থ বলে অভিহিত করে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক'এর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস এর প্রাথমিক গ্রন্থ খানার সাথে তুলনা করেছেন। (১ পৃষ্ঠা-৭)। সেই সুকুমার সেন বলেছেন, সপ্তদশ শতাব্দের শেষ হইবার আগেই আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সংস্কৃতির আদর চলিয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ আরাকান রাজ্যে বিশৃংখলা এবং বাঙালী মুসলমানের ক্ষমতা লোপ। তবে চাটিগাঁয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা লুপ্ত হয় নাই। (২ পৃষ্ঠা-৫৪৮)।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গৌড়ে হোসেন শাহ্‌, নসরত শাহের রাজত্বকালে পরাগলপুরে এবং ফিরোজ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়েছিল এবং পরাগলপুরে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর অভ্যুদয়ের পর চট্টগ্রামে মুসলিম সাহিত্যিক শাহ মোহাম্মদ সগীর ও সাবরিদ খান এর সাহিত্য চর্চা এবং পরে আবার পরাগলপুর ভিত্তিক সৈয়দ সুলতানের সাহিত্য চর্চা, জাফরাবাদে বসে দৌলত উজীর বাহরাম খানের লাইলী মজনু রচনা, সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মোহাম্মদ খান কর্তৃক সৈয়দ সুলতানের অসমাপ্ত নবী বংশ সমাপ্ত করন, মুক্তল হোসেন প্রভৃতি রচনা এবং অন্যান্য শিষ্য ভাবশিষ্যগণ কর্তৃক সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দে আরো বহুসংখ্যক সাহিত্যিক বাঙলা সাহিত্য চর্চা করেন।

মুহাম্মদ খানের শিষ্য জেনুদ্দিন 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনা করেন। রসুল বিজয়' হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ। জেনুদ্দিনের রসুল বিজয়ে (৩ পৃষ্ঠা-৪৬৮-৪৬৯) এক ইউসুফ খানের নাম উল্লেখ আছে। এই ইউসুফ খান চাটগাঁ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন বলিয়া মনে হয়। (২ পৃষ্ঠা-৫৫৫)।

কবি হামিদুল্লা 'তমিম্‌ গোলাল্‌ চতুর্থ ছিল্লাল' কাব্য রচনা করেছেন। এটি 'দুইজনের রচনা, অন্ততঃ ভনিতায় তাই পাই-হামিদুল্লার ও মোহাম্মদ রাজার। হামিদুল্লার ভনিতা প্রথম অংশেই বেশী পাওয়া যায়। মনে হয় মোহাম্মদ রাজা (বা রেজা) পূর্বতন অথবা সমসাময়িক কবি হামিদুল্লার কাব্য সম্পূর্ণ অথবা সম্পাদনা করিয়া ছিলেন। শেষে হামিদুল্লার এই পরিচয় আছে-

www.pathagar.com

হীন হামিদুল্লা জান সুজন-তনয়
মোহাম্মদ কজেম নাম পিতা মহাশয়।
ক্ষিতিতলে চট্টগ্রাম রাজধন্য দেশ। ....
(২ পৃষ্ঠা-৫৬১)।

আলী রাজার 'জ্ঞান সাগর' ও 'সিরাজকুলুপ(৪- পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭) বাউল-দরবেশী যোগ সাধন বিষয়ক নিবন্ধ। ইঁহার 'ধ্যান মালা' (৪ পৃষ্ঠা-৭৭-৭৮) সঙ্গীতের বই। আলী রাজা চাটিগাঁয়ের লোক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ভালো পদও লিখিয়া ছিলেন। (২ পৃষ্ঠা-৫৬৪)। আলী রাজার জ্ঞান সাগর আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৪ সালে প্রকাশ করে।

'নসিব নামার' লেখক মর্দনকে চট্টগ্রামের কবি বলে অনুমান করা হয়। কারণ তিনি তাঁর কাব্য আরাকান রাজ সুধর্ম্মার সভায় উপস্থাপন করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সময়ে আরাকান রাজসভায় চট্টগ্রামী সাহিত্যিকদের সম্মান ছিল। মর্দনের 'নসিব নামা'য়' (৩ পৃষ্ঠা- ২৬৮) অদৃষ্টের অব্যর্থতা জ্ঞাপক গল্প আছে। মর্দন তাঁহার কাহিনী উপস্থাপিত করিয়াছেন আরাকানে শ্রী সুধর্ম্মার সভায়ঃ-

প্রণাম করিয়া কহি পন্ডিতের গোচরণ — পুস্তক যেহেন মতে হইল উতপন।
ভূবনে (বিখ্যাত) আছে রোসাঙ্গ নগরী — রাবণের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী।
শ্রী শ্রী সুধর্ম শাহা তথাত ঈশ্বর — কামদেব পরা (জয়) পরম সুন্দর।......
সে রাজ্যেত আছে এক কাঙ্কী নামে পুরী — মোহমিন মোছলমান বৈসে সে নগরী।
আলিম মলনা বৈসে কিতাপ কারণ — কাস্তগণে বৈসে সব (ধর্ম) পরায়ণ।....
সিরেস্তর কাস্থ পিতা প্রণামি তার পদ — তান দুই পুত্র জানি মর্দন মোহাম্মদ।
একদিনে দুই ভাই বসিয়া থাকিতে — দুই সাধু কথা তবে লাগিলা (কহিতে)।...
সৈয়দ ইব্রাহিম পীর রূপে পঞ্চবাণ — কহে হীন মর্দনে নুরুদ্দিন (নন্দন)।
(২ পৃষ্ঠা-৫৫৭)।

দ্বিজ লক্ষীনাথের কৃষ্ণ মঙ্গলের (৪ পৃষ্ঠা-১০৭) এবং ভক্তরাম দাসের 'গোকুল মঙ্গল' (৫ পৃষ্ঠা-৯১) এর পুথি চাটিগাঁয়ে পাওয়া গিয়াছে। (৪ পৃষ্ঠা-২১১)।

চাটিগাঁ অঞ্চলে অনেকগুলি কবিতা পাওয়া গিয়াছে 'রাধার চৌতিশা,' 'রাধার বারমাসী' ইত্যাদি নামে। রচয়িতা আনন্দী সুত-মদন দত্ত, মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর বানিয়া, ক্ষীণ দেবীদাস ইত্যাদি। (৬ পৃষ্ঠা-২১, ৫ ও ৬)।

১১৫৭ মঘীর জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা ভিত্তিতে নারোত্তম কেরানী রচিত বাত্যাবর্ত-বিবরণ (৪ পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬), চাটিগাঁর দেবগ্রাম নিবাসী রাম তনু আচার্যের রাধা মোহন সেরেস্তা দারের কীর্তি, বখশ আলী ফৌজদারের কীর্তি গাথা, গঙ্গারামদাস রচিত 'রাজকুমার বাবুর পরিণাম, দীন দয়াল দাস রচিত 'যুদ্ধকথা', 'দ্বিজ রাম চন্দ্র রচিত নিত্যানন্দ-বৈদ্যের কবিতা, চৌধুরীর লড়াই এবং গুরুদাসগুপ্ত রচিত 'রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত (৪ পৃষ্ঠা-১০৮, ১০৯, ৪০, ৪১) চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। (২ পৃষ্ঠা-৫৪০-৫৪১)।

www.pathagar.com

চাটিগাঁ অঞ্চলে "ভট্টভাষায়" অর্থাৎ ভাটদের (ব্রজবুলি ও মিশ্রহিন্দি) ভাষায় লেখা কিছু কিছু ছোট বড় পৌরাণিক কবিতা মিলিয়াছে। যেগুলি ভাটেরই রচনা। যেমন কালীচরণ ভট্টের রাম-পাঁচালী, তনুরাম ভট্টের বস্ত্রহরণ-গীত, কৃষ্ণদাস ভট্টের শিববন্দনা ও হরগৌরীর কোদল ইত্যাদি। (৪ পৃষ্ঠা-১৫০, ১৫১, ২৫৯-২৬০)।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তমধ্য পর্বের শেষ ভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, চট্টগ্রামের কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণ ১৭০৩-০৪ খৃষ্টাব্দে মনসা মঙ্গল (৫ পৃষ্ঠা-৯) এবং ১৭০৯-১০ খৃষ্টাব্দে আদিত্য চরিত বা সূর্যমঙ্গল পাঁচালী (৬ পৃষ্ঠ ১১) রচনা করেন। দুইটি রচনাতেই রামজীবন আত্মপরিচয়ের প্রারম্ভে বলিয়াছেনঃ-

অল্প বয়স মোর দ্বিজকূল-জাত
পন্ডিত না হম্ মুই কহিল সভাত।
(২ পৃষ্ঠা-২৯৬)।

অব্রাহ্মণের লেখা আর একটি চন্ডীমঙ্গল হইল মুক্তারাম সেনের সারদা মঙ্গল (৭), রচনাকাল ১৭৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দ। মুক্তারামের জাতি বৈদ্য, নিবাস চাটিগাঁর দেয়াঙ্গ গ্রামে।..... সারদা মঙ্গল সংক্ষিপ্ত রচনা। (২ পৃষ্ঠা-৪৪৫)। মুক্তারামের এক ভাই ব্রজলালের ভনিতায় যে চন্ডীমঙ্গল পুথি পাওয়া গিয়াছিল (৪ পৃষ্ঠা-১০০) তা মার্কন্ডের চন্ডি অবলম্বনে লেখা (২ পৃষ্ঠা-৪৪৫)। চাটিগাঁয়ের চক্রশালা গ্রামের কায়স্থ ভবানী শংকর দাস মঙ্গলচন্ডী পাঞ্চালিকা রচনা করেন ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ অন্তমধ্যপর্বের স্বল্পকাল পর)। (২ পৃষ্ঠা-৪৪৬)।

ব্রতকথা ধরনের ছোট ছোট চন্ডী মঙ্গল রচনা অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে।....এগুলি দ্বিজ রঘুনাথের নিয়ত মঙ্গলচন্ডীর পাঁচালি, শিব নারায়ণের নিত্য মঙ্গলচন্ডীর পাঁচালী, দেবী দাস শর্মার নিকট মঙ্গল চন্ডিকা, মদনদত্তের মঙ্গলচন্ডীর পাঁচালী, দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গলচন্ডীর গীত, অজ্ঞাতনামা রচয়িতাদের 'ঘোরমঙ্গলচন্ডী ও জয়মঙ্গলচন্ডী, চৈত্র মহাত্ম্য ইত্যাদি রহিয়াছে। (৪ পৃষ্ঠা ১৫, ২৩, ২৪)। অধিকাংশ পুঁথি চাটিগাঁ অঞ্চলের। (২ পৃষ্ঠা-৪৪৭)।

দ্বিজ রামদেব রচিত 'অভয়া মঙ্গল' হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর বড় চন্ডীমঙ্গল কাব্য। এটি ত্রিপুরা-নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। (২ পৃষ্ঠা-৩০৩)। রামদেবকে অনেকে চট্টগ্রামের কবি বলিয়া অনুমান করেন। রাম দেব লিখেছেনঃ-

কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
সর্বদা মজিয়া রহে চিত।
কবি বিধুসূত রামদেব।
....
দ্বিজ রাম দেবে ভনে স্বপ্ন অনুমতি
কালিকা সঙ্গীত মতে রচ এ ভারতী।

www.pathagar.com

....
ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সমজিত
রচিলেক রাম দেবে সারদা চরিত
অর্থাৎ এটি ১৬৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত। (৮)।

২২ কবির একটি মনসা মঙ্গল কাব্য ১৩৪৩ সালে চট্টগ্রামের সাধারণ প্রেস থেকে চাপা হয়েছে, এতে বলা হয়েছে-

নারায়ণ দেব রচে সরল পয়ার
কহিছে বিজয় গুপ্ত লাচারীর সার।
কহিছে বিজয় গুপ্ত ওঝা হইল সন্তপ্ত
হারাইয়া রোপিত ওষধি
কহিছে বিজয় কবি মনসার পায়
গুপ্ত কবি কহিছেন সরল পাঁচালী।

....
বিনয়ে কয় চাঁদপুত্র হবে ক্ষয়
গুপ্ত কহে পাঠাও সকাল।
কহিছে বিজয় কবি ভাবি বিষহরী
ভনিবেন নারায়ণ ক্রন্দন লাচারী।

....
নব অঙ্ক বাণ বিধু শক নিয়োজিত।
দেবজ্ঞ শ্রী গোপাল চক্র রচিলেক গীতি।

এটা থেকে রচনা কাল ১৬৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু পন্ডিতেরা এই রচনাকে একই সময়ের রচনা নয় বলে মনে করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বিধায় ২২ জন কবিই চট্টগ্রামের বলে ধারণা করা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের সুচক্রদন্ডীর দ্বিজ রতিদেব মৃগলুব্দ (শিবমঙ্গল) কাব্য রচনা করেন। (৯ পৃষ্ঠা-৩৩২)। চাটিগাঁ অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি মৃগলুব্দ কবিতার লেখকের নাম জানা যায়না। (৪ পৃষ্ঠা-১৩৪)। চাটিগাঁয়ের নিধিরাম আচার্য কবিরত্নের কালিকামঙ্গল ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রচিত। যথা-

শকাব্দ ষোড়শ শত জলনিধি বসু
দৈবচিৎ বিরচিল নিধিরাম শিশু।
(৪ পৃষ্ঠা ৩০/৩১)।

বৈষ্ণব বিষয়ক কাব্য, কৃষ্ণদাসের রচনার পুথি চাঁটগাঁয়ে পাওয়া গিয়াছে। (১০ পৃষ্ঠা -১২৬)।

কপিলামঙ্গল ছোট রচনা। প্রধান বিষয় হইতেছে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার গোরু-চুরি।... চাটিগাঁ অঞ্চলের একটি পুঁথিতে রচয়িতার নাম নাই। (৪ পৃষ্ঠা-১৪৪)।

www.pathagar.com

প্রণয় কাহিনী ঘটিত গাঁথা-কবিতা, চাটিগাঁ অঞ্চলে নিত্যপদ বৈদ্য ও শ্রীধর বানিয়ার 'নীলার বারমাস' পাওয়া গিয়াছে। (৪ পৃষ্ঠা-১২৫)।

চট্টগ্রামের নিধিরাম আচার্য কবি ভারত চন্দ্রের সমসাময়িক। ইনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়া ছিলেন। (১১ পৃষ্ঠা-১৫৮)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্য পীরের মত ত্রৈলোক্য পীরের গানও প্রচলিত আছে
(১১ পৃষ্ঠা-১৫৫)।

চন্ডীমঙ্গল রচনা নিতান্তই ক্ষুদ্র। সিলেট চাটিগাঁ অঞ্চলে এই ধরনের ছোট পাঁচালী ব্রত কথার পুথি যথেষ্ঠ মিলিয়াছে। (২ পৃষ্ঠা-৫৮৬)।

চাঁটিগাঁর জোয়ারা গ্রাম নিবাসী রাধাচরণ রক্ষিতের চন্ডিকামঙ্গল মার্কণ্ডের পুরাণ অবলম্বনে লেখা। (২ পৃষ্ঠা-৫৮৬)। মনসা মঙ্গল রচয়িতা হইলেন চাটিগাঁয়ের মধুসদন দৈ (দৈবক) ও শ্রীরাম বিনোদ। (১২ পৃষ্ঠা-৩৭ এবং ৪ পৃষ্ঠা ১৯৪)।

অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে, সুলতান হোসেন শাহের উদার পৃষ্ঠাপোষকতায় হোসেন শাহী আমলে বৈষ্ণব সাহিত্য বিকশিত হয়। অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যে শ্রেণী বৈষম্য ছিল, বাধা ছিল বৈষ্ণব সাহিত্যিকরা তা ভেংগে সাহিত্য সংস্কৃতিকে সাধারণের সম্পদে পরিণত করেন। "চৈতন্য ভাগবত সূত্রে আমরা চারজন পন্ডিতের কথা জানতে পাই; পুন্ডরিক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত এবং গদাধর। পুন্ডরীক মেখলের (হাটহাজারী) এবং বাসুদেব ও মুকুন্দ দত্ত ভ্রাতৃদ্বয় চক্রশালাবাসী (পটিয়া) ছিলেন।

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পন্ডিত
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর
আসিয়া রহিলেন নবদ্বীপে গুরুরূপে
শ্রীমুকুন্দ বেজ-ওজা তার তত্ত্বজানে
একসঙ্গে মুকুন্দেরও জন্ম চট্টগ্রামে।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত....
মুকুন্দের বড়প্রিয় পন্ডিত গদাধর।
(১৩ পৃষ্ঠা-২৫৯)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরশুট অঞ্চল ছিল মুসলমান কবিদের, বিশেষ করে আরবী-ফারসী শব্দ কন্টকিত ইসলামী বাংলা সৃষ্টিকারীদের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই অঞ্চলের কবি গরীবুল্লাহ আমীর হামজা, ইউসুফ-জোলেখা প্রভৃতি লিখেছেন। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে তিনি লিখেছেন,

আল্লাতালা সালামৎ রাখিবে বাদশারে — সের সালমৎ রাখ বাদশার উজীরে।
দোজখ আজব হৈতে জরাও করতারে — ইমান বজায় রাখ মোমিন সবারে।
বজায় সালামৎ রাখ রাজার দেওয়ানে — শিকদার তোকদার ইজারদার জনে।
মন্ডল মকদ্দম আর তামাম প্রজায় — সের সালামৎ আল্লা রাখিবে সবায়।

www.pathagar.com

যেই জন শোনে এই জোলেখার বয়ান দেল রওশন রাখে আল্লা বহাল ঈমান।
এইত গ্রামের বিচে আছে কতজন সবাকারে সালামতে রাখ নিরঞ্জন।
কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি সবাকারে সালামতে রাখিবে রববানী।
আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান।
ইউসুফ-জোলেখার গীত পালা হৈল সায় লেহ ভাই আল্লার নাম দিন বহে যায়।
গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত নায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াৎ।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, বাদশার উল্লেখ হইতে মনে হয় যে নিবন্ধটি কোম্পানীর অধিকারের পূর্বে, অন্ততঃ পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে লেখা হইয়াছিল। (২ পৃষ্ঠা-৫৫২)।

উল্লিখিত কবিতায় গরীবুল্লাহ বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে তিনি (কবি) সহৃদয়তার সাথে হিন্দু-মুসলমান, বাদশাহ-প্রজা/রাজা-প্রজা সকলের জন্যই আল্লাহর আশীর্বাদ কামনা করেছেন। অর্থাৎ কবি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং উদার হৃদয়ের অধিকারী।

দক্ষিণ রাঢ়ের কবি সৈয়দ হামজা জৈগুনের পুথি, হাতেম তাই, মনোহর-মধুমালতী প্রভৃতি লিখেছিলেন।

উত্তর ভারতে মনোহর ও মধুমালতির প্রণয়োপখ্যান অত্যন্ত বিখ্যাত। এই উপাখ্যান অবলম্বনে হিন্দি ভাষায় অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, মনঝনের কাব্য, রচনা আরম্ভকালে ৯৫২ হিজরী বা ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ (১৪ পৃষ্ঠা-১৩৯)।

মধুমালতীর কাহিনী হিন্দি হইতে একাধিক লেখক অনুবাদ করিয়াছিলেন। মধুমালতীর কাহিনী আলাওলেরও জানাছিল। তাই তিনি লিখেছেন-'মধুমালতীর লাগি বিয়োগ হইয়া, মনোহর গেল মা ও বাবা ত্যাগিয়া।''' .....পূর্বতন কবি মোহাম্মদ কবিরের মনোহর মধুমালতী কখন লেখা হইয়াছিল জানা নাই। (২ পৃষ্ঠা ৫৫৩)।

মুহম্মদ কবীর বাংলা ভাষায় এই উপাখ্যান অবলম্বনে প্রথম কাব্য লেখেন। এই কাব্য প্রথম ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। ..... এই মুদ্রিত সংস্করণে কবির এই উক্তি পাওয়া যায়ঃ-

এই সে সোন্দর কেচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশ ভাষাএ মুঞি পাঁচালী রচিল।।

সেই সঙ্গে এই সংস্করণে রচনাকালবাচক এই হেঁয়ালী শ্লোকটি পাওয়া যায়ঃ-

অন্তে অন্তে অন্ত রএ সিন্দু তার পাছ।
পাঞ্চালী ভনিতে গেল হিজিরার পাঁচ।
(১৪ পৃষ্ঠা-১৩৯)।

ডঃ সুকুমার সেন এই হেঁয়ালীকে অবোধ্য বলেছেন। (২ পৃষ্ঠা ৫৫৩)। ডঃ এনামুল হক এই হেঁয়ালীর প্রথম ছত্র থেকে ৯৯৭ হিজরা বের করে এর সমাধান করেছেন। (১৫ পৃষ্ঠা-৯৬-৯৮)। সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ডঃ এনামুল হকের সমাধান গ্রহণযোগ্য। কারণ 'নয়' যখন সর্বশেষ একক সংখ্যা তখন অন্ত বলতে নয়ই বোঝাবে।

www.pathagar.com

অন্তে অন্তে অন্ত রএ-এর মুল পাঠ 'অঙ্ক অন্তে অঙ্ক রএ ও হওয়া অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রথম ছত্র থেকে ৯৯৭ হিজরাই পাওয়া যাবে। (১৪ পৃষ্ঠা-১৩৯)।

ডঃ আলী আহসান মনঝন ও মুহাম্মদ কবিরের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছেন যে, "মনঝনের মধুমালতী অবলম্বন করেই তিনি (মুহাম্মদ কবির) তাঁর মধুমালতী কাহিনী রচনা করছিলেন। (১৬ পৃষ্ঠা ৪৩/৪৪)।

মনঝনের কাব্য রচিত হয়েছিল ৯৫২ হিজরী অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় বাংলা (পশ্চিম বঙ্গ) ছিল মোগল সম্রাট আকবরের অধীন। ঐ সময় উত্তর ভারত ও দিল্লী থেকে অসংখ্য রাজকর্মচারী বাংলায় আসত। সুতরাং তাদের কারো হাতে উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় হিন্দী কাব্য বাংলায় আসা মোটেই বিচিত্র নয়।

সুতরাং কবীর মধুমালতী রচনা শুরু করেছিলেন ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে। কবি বলেছেন, পাঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরার পাঁচ। সুতরাং এটি পাঁচ বছরে অর্থাৎ ১৫৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল।

পশ্চিম বঙ্গের মালদহ থেকে 'আদ্য পরিচয়" নামে একটি কাব্য উদ্ধার করা হয়েছে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্ভনে শেখ জাহিদ লিখিত কাব্যটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা করেন মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ। রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে এটি প্রকাশ করে। সম্পাদক ভুমিকায় বলেন, পুঁথিটি স্বর্গীয় শরৎকুমার রায় কর্তৃক অবিভক্ত বাঙ্গালার মালদহ হইতে সংগৃহীত হয়। গ্রন্থের অনুলেখক শ্রী নিমাই চরণ দাস (গ্রন্থস্থিত বানান নেমাই চরন দাস)। পুঁথিটির লিপিকাল বাংলা ১২০৮ সাল। (১৭ পৃষ্ঠা-৫৫)। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেন ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (২২ পৃষ্ঠা-৬)। কাব্যে রচনার তারিখ সূচক শ্লোকে বলা হয়েছে,

ব্রহ্মার আনন জথ রাবণের করে।
গুনিলে জত হএ সহস্র উপরে।।
এত লোকের মাঝে করিল প্রচার।
পয়ার প্রবন্ধে কহি আঁতুমা বিচার।"

প্রথম সম্পাদক মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী উল্লিখিত সংকেতটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ ব্রহ্মার আনন=৪, রাবনের কর= ২০ অর্থাৎ ৪২০ এবং তার সাথে এক সহস্র যোগ করলে হয় ১০০০+ ৪২০= ১৪২০। অর্থাৎ রচনাকাল ১৪২০ শকাব্দ বা (১৪২০+ ৭৮= ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ। (২৪ ভূমিকা)।

ডঃ এনামুলক হক বলেছেন যে, ব্রহ্মার অপর নাম চতুর্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা চারিমুখ বিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মার আনন কথার দ্বারা চার সংখ্যা বুঝাইতেছে। রাবণের অপর নাম দশানন বা দশমুন্ডধারী। সুতরাং তার হাত ২০টি এবং কর বিশটি। সুতরাং ব্রহ্মার আননের পাশে রাবনের কর যোগ করলে হয় ৪+২০=৪২০। তার সাথে পরবর্তী চরণের সহস্র যোগ

www.pathagar.com

করলে হয় ৪২০+১০০০= ১৪২০। এটি শকাব্দ এবং এর সাথে ৭৮ যোগ করলে হয় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ। এটিই অদ্য পরিচয় রচনার কাল। (২২)। উভয় সম্পাদকই "আদ্য পরিচয় এর রচনা কার ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ বলে নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের মতে এই কাব্যের রচয়িতা শেখ জাহিদ পান্ডুয়ার বিখ্যাত দরবেশ শেখ নুর কুতুব আলমের পৌত্র শেখ জাহিদ ভিন্ন আর কেউ নন। অর্থাৎ উভয় সম্পাদকই কাব্যটির রচনাকাল এবং লেখক সম্পর্কে একমত প্রকাশন করেছেন। (১৭ পৃষ্ঠ-৫১)।

কিন্তু অধ্যাপক আবু তালেব এক প্রবন্ধে কাব্যটির রচনা কাল ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ বলে মেনে নিলেও লেখক শেখ জাহিদ যে পাণ্ডুয়ার শয়খ জাহিদ একথা স্বীকার করেন নি। (২৩)।

ডঃ আবদুল করিম বলেছেন যে, "আদ্য পরিচয়" রচনার তারিখ ১৪২০ শক বা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ নয় এবং রচয়িতা শেখ জাহিদও পান্ডুয়ার শয়খ জাহিদ নন। তিনি দুই সম্পাদকের যোগকরণ পদ্ধতির বিরোধিতা করে বলেছেন, উভয় সম্পাদক ব্রহ্মার আনন' অর্থাৎ ৪-কে শতকের ঘরে বসান এবং ফলে ৪২০ সংখ্যা পান, কিন্তু ৪-কে শতকের ঘরে বসাবার ফলে সংখ্যাটি যে ৪০০ হয়ে গেল তা চিন্তা করেন নি। ইহা শ্লোকের মর্মার্থ বিরোধী। ব্রহ্মার আনন গুণিলে ৪ হয়, তার সঙ্গে রাবণের কর গুণিলে আরো ২০ হয়, অর্থাৎ মোট ২৪ হয়, ৪২০ কোন মতেই হয় না। ডাঃ এনামুল হক বলেন, "প্রথম চরণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত সংখ্যা দুইটি বলার ক্রম অনুসারে পর পর বসাইয়া গুণিলে ৪২০ হয়। কিন্তু পরপর বসাবার কথা কোথাও বলা হয়নি। কাব্যে ৪ এবং ২০ গুণিয়া নিবার কথা বলা হয়েছে, গুণিয়া নিলে ২৪ ই হয় এবং আরও এক হাজার যোগ করলে হয় ১০২৪।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, মনীন্দ্র বাবু এবং ডঃ এনামুল হক নির্ধারিত সন, অর্থাৎ ১৪২০ গ্রহণ যোগ্য নয়। পুস্তক রচনার তারিখ হবে ১০২৪ সন। এই সন (১০২৪) শকাব্দ হতে পারেনা। (কারণ) ১০২৪ শকাব্দের সাথে ৭৮ যোগ করলে ১১০২ খৃষ্টাব্দ হয় এবং ১১০২ খৃষ্টাব্দে কোনো মুসলমান কর্তৃক বাংলা কাব্য রচনার প্রশ্নই ওঠেনা। (কারণ) মুসলমানেরা বাংলা (গৌঢ়) জয় করে আরও একশত বৎসর পরে। অতএব আমরা মনে করি যে, কবি শেখ জাহিদ এখানে হিজরী সন বা বাংলা সন তারিখের উল্লেখ করেছেন। হিজরি সন হলে তারিখটি হয় ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ এবং বাংলা সন হলে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হয়। মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা হিজরি, বাংলা, শক বা মঘী যে কোন অব্দেই কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করতেন। কিন্তু আগেই বলেছি, ১০২৪ সন শকাব্দ হতে পারে না। মঘী সন হওয়াও সম্ভব নয়, কারণ মঘীসন শুধু চট্টগ্রামেই ব্যবহৃত হত। অথচ আদ্য পরিচয় কাব্যটি আবিষ্কৃত হয় বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জিলায়। যেহেতু হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে পুথির রচনাকাল নির্দেশ করা হয়েছে, সেহেতু ১০২৪ বাংলা সন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অতএব ১০২৪ বাংলা সন বা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দেই 'আদ্য পরিচয়' কাব্য রচিত হয়। (১৭ পৃষ্ঠা ৫১)।

www.pathagar.com

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আদ্য পরিচয় রচনাকাল সম্পর্কিত ডঃ আবদুল করিম নির্ধারিত ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ বা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দই সঠিক। অর্থাৎ শ্লোকে উল্লিখিত ১০২৪ হিজরি হলে ১৬১৫ এবং ১০২৪ বাংলা হলে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ সঠিক। কারণ ডঃ করিম এর যুক্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত উভয় সম্পাদকই আদ্য পরিচয়ের লেখক শেখ জাহিদকে পান্ডুয়ার শয়খ নুর কত্তুব আলমের দৌহিত্র শয়খ জাহিদ বলে দাবী করে নানা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে ডঃ আবদুল করিম ঐতিহাসিক তথ্যাদি উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, এই দুই জাহিদ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন এবং তাদের সময়ের ব্যবধানও শত বছরের বেশী।

দ্বিতীয়তঃ আদ্য পরিচয় এর রচনাকাল ১৪৯৮ নয়, ১৬১৫ বা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ বলে প্রমানিত বিধায় শয়খ জাহিদ এই কাব্যের রচয়িতা নন।

এ ব্যাপারে আমাদের আরো সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, শেখ জাহিদের দাদা শেখ নুর কুতুব আলমের অনুরোধে ইব্রাহিম শর্কী গণেশের রাজ্য আক্রমনে এসেছিলেন। (২) গণেশ শেখ জাহিদ এবং তাঁর পিতা শেখ আনোয়ারকে সোনার গাঁয় নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং শেখ আনোয়ারকে যে হত্যা করেছিলেন তা আমরা দ্বীতিয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে শেখ জাহিদ ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা। আদ্য পরিচয় একটি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক গ্রন্থ। সুতরাং শেখ জাহিদের দ্বারা এরূপ গ্রন্থ রচিত হতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ সুলতান হরি বংশ অবলম্বনে কাব্য রচনা করলেও শেখ জাহিদ রচনা করেন নি, এ ধারণা কি ঠিক? এর স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, সৈয়দ সুলতান হরিবংশ অবিলম্বনে যা লিখেছিলেন তা হচ্ছে নবী বংশ, আর জাহিদের কাব্য কোন ইসলামিক গ্রন্থ নয়, পৌরানিক কাহিনী ভিত্তিক গ্রন্থ। (বিস্তারিত জানার জন্যে ২৪ এবং ১৭ এর শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয় রচনার তারিখ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে নসরুল্লাহ খোন্দকার এক বিশিষ্ঠ স্থানের অধিকারী। .... (কবির) "শরীয়তনামা"গ্রন্থ মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত সহায়ক।....বাঙালীদের বোধগম্য করে কবি ফেকাহ শাস্ত্রে শরীয়ত নামা গ্রন্থখানি রচনা করেন। কবি নিজেই বলেছেন-

প্রভুর হুকুম মুছহাফ মাজার।
হাদিসে হুকুম কৈল্য রসুল আল্লার।
সে সব বচন পূর্বে ইমামের গণ।
কিতাব লিখিত সবে বুঝিতে কারণ।
বাঙালে ন বুঝে সেই কিতাব উত্তর।
ন বুঝিয়া মনস্তাপে পাওন্ত বিস্তর।।
তেকাজে কিতাব কথা ভাষে হিন্দুয়ানী।

www.pathagar.com

পদবন্দ কৈল্যুম কথা মছায়েলা বাণী।।
(১৭ পৃষ্ঠা- ৭২, ১০৩ ও ১০২)।

গ্রন্থের শুরুতে কবি গ্রন্থের বিষয় বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ-

শরীয়তনামা বাণী কর অবদান (অবধান)।
অবশ্য মানিব যেবা হয় মুসলমান।।
মুসলমানে মুসলমানী কর্ম না করিলে।
মুসলমান নহে হেন শাস্ত্র মধ্যে বোলে।।
আমার মানাই যত আছে শরীয়তে।
সহরিষে কহি আমি শুন রঙ্গচিতে।।
হুকুম সবেরে শাস্ত্রে আমর বোলয়।
মানারে বোলয়ে নেহী আরবী ভাষায়।।
যতেক হুকুম কৈল্যা প্রভু করতার।
একে একে মানি লইলা রসুল আল্লার।।

বিষয়বস্তু শুরু করে কবি প্রথম নমাজের কথা বলেছেন,

আদ্যে নমাজের কথা কহি পদবন্দে।
একে একে তুমি সবে শুন মহানন্দে।।
কেহ কেহ নমাজ না পড়ে কদাচন।
মসজিদে দুনিয়ার বচন কহন।।
সংসারের কর্ম মসজিদে যুক্ত না হয়।
কত কত পাপিষ্ঠে অখাত বয়ানয়।।
বিনি সে বাহেতু মসজিদে ন যাইবা।
যদি যায় নিরন্তরে প্রভুকে সেবিবা।।

কবি মুসলমান সমাজের কতগুলি কুসংস্কারের কথা আলোচনা করে সেগুলি বর্জন করতে বলেছেন-

গুনীগণে কহিচন্ত কিতাব অন্তরে।
নারীর উচিত রইতে গুপ্ত কিবা ঘরে।।
নারী হন্তে নিশ্চিন্তে নারইও কদাচন।
যদিও হয় শুদ্ধমতি প্রভুগত মন।।
বান্ধিতে উচিত কিবা গর্দভ সমন।
চোরের প্রত্যয় কিবা হইলে মিত্রজন।।
এতেক জানিয়া বন্ধ কর নিজ নারী।
নতু ধেনু বৃষের কারণ দেও ছাড়ি।।
....
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ যে নারী দেখাইল।

www.pathagar.com

আপনার সোয়ামীর দাড়িতে অগ্নি দিল।
নারীর বচন যদি শুনে ভিন্ন জনে।
আপনার সোয়ামীর মাথা মুড়াইল শানে।।
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ দেখাইলে নারী।
নরকের হুতাশনে যাইবেক পুড়ি।।

এর পর মৃত্যুর কথা বলেছেন-

এবে কহি গুণীগণ হইয়া শুন একমন
কথিঞ্চত বচন মওতার।
আকাশেত এক বৃক্ষ পত্র ধরে লক্ষ লক্ষ
দেখিতে সুন্দর অতিশয়।।
সৃজন আছএ যত নাম লেখাপত্র তত
বিনি নামে এক পত্র নাঞি।
যার নাম মৃত্যুপতি আজরাইল মহামতি
সেই বৃক্ষ তলে তান ঠাঁঞি।
....
হইলে পূণ্যবন্ত জন পাপেতে ন দিলে মন
দূত স্থানে পুণি পুণি কহে।
কাড় গিয়া তার প্রাণ হৈয়া তুমি সাবধান
যেন মতে দুঃখ নাহি পায়।
যদি হয় পাপকারী বুলে তারে চাপি ধরি
প্রাণ নিতে লোহার সাঁড়াশে।। ইত্যাদি

মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন, ফাতেহা প্রভৃতি সম্পর্কে বলেছেন-

মৃতরে গোছল দিতে গোছলের স্থান।
অতিযত্নে ধরিয়া যে করাইবা স্নান।।
চাপি না ধরিবা ন ধরিবা মুষ্ট ভিড়ি।
শীতল তাতল জলে ধুইবা যত্ন করি।।
পুরুষের পুরুষে গোসল করাইবা
নারী হইলে নারীগণে অবশ্য ধুলাইবা। ইত্যাদি।
....
পারিলে কাফন দিবা না পারিলে নাই।
ন জুড়িলে যুক্ত নহে পড়শীর ঠাঁই।।
ধনবন্ত যেবা হয় দিবেক কাফন।।
নতু খুঁজি লইবেক অল্প অল্প ধন।।
পড়শীর পর ফরজ দিবার কাফন।

www.pathagar.com

কাফন দিলে নারে দিবার কাফন।।

কাফন ন জুড়ে যেই পার সেই দিবা।
নবীন কি পুরান বিচার না করিবা।।

....

যেই যেই দিনে রুহ ফিরয় আসিয়া।
ফাতেহা করাও যত্নে শাস্ত্র নিরক্ষীয়া।।
বচ্ছরে বচ্ছরে যদি ফাতেহা করায়।
ফাতেহা করায়ে জনে বহু পূণ্যপায়।।

....

মরার শরীর যদি অপবিত্র হইত।
সমুখে রাখিয়া কেনে জানাজা পড়িত।।
কদাচিত না পরাইত শুক্ল বসন।
পয়গম্বরে ন কহিত দিবারে কাফন।
ঈদের দিবসে যেন করিয়া গোছল।
শুভ্র বসন পিন্দি যায় ঈদস্থল।।
তেহেন জানিও নহে এই মতে বহুর।
সুবাস পিন্দিয়া যায় অবিনাশপুর।।
যার সঙ্গে শতে শতে লোক চলে পাশে।
রাব্বি নাম বুলি হেন কেতাবেত আছে।।
রমণী উদ্দেশে যেন বিবাহের কালে।
যেন নব দুলা চলি যায় শ্বশুরালে।।
বিনি শ্বশুরালে যেন ন মিলে রমণী।
বিনি গোরে কদাচিত ন মিলে ভাবিনী।।

সামাজিক কুসংস্কার ও পর্দা সম্পর্কে বলেছেন.,

কত কত মনিষ্যের কুরসিৎ ধরন।
আপনা রমণী প্রতি দয়া ন করণ।।
আপনার পরিধান শুক্ল বসন।
দেখতে কুলীন কুল মোহন্ত লক্ষণ।।
সে সব নারীর শিরে ন দেখিয়ে বাস।
একএক নারীর মুখযেন রবি হাস।।
নারীর যে সর্ব অঙ্গ মহাগুপ্ত স্থান।
মাত্র কর পদ যুগ আর যে বয়ান (নয়ন)।

শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ সম্পর্কে বলেছেন,

যে সব মওলানা জান মলিন হৃদয়।

www.pathagar.com

তা হন্তে অধিক ভাল মুরুক্ষু নিশ্চয়।।

কবি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ও ভন্ড মওলানাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন,

তুমি যেন শাস্ত্র জান মহাপন্ডি (ত) গুণ বান
তেন বহু মওলানারগণ।
শিরে বান্দি মহাপাগ জুব্বা রাখি পৃষ্ঠভাগ
পরি মহাশ্বেত পিরহান।।
হস্তে আছা (লাঠি) দন্ডে ভারি অধিক দীঘল দাড়ি
দেখিতে ফেরেশতা সমতুল।
নমাজ ন পড়ে ঘরে লোকের সম্মুখে করে
ধীরে ধীরে দীর্ঘল বুইল।।
ঘরে ঘরে নিতি ফিরে লোকেরে মুরিদ করে
আপে যেন তেহেন লোকের।
কিঞ্চিত পাইয়া ধন ন বিচরি কন জন
খেলাফত দেওন্ত সত্বরে।। ইত্যাদি।

(১৭ পৃষ্ঠা-৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৭, ও ১০৮)।

ডঃ আবদুল করিম বলেছেন, ".... কবির (নসরুল্লাহ খোন্দকার) আলোচনায় দেখা যায় কবির সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মুসলমান সমাজে মুর্খ ও ভন্ড মওলানা প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলে মুসলমানদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এমন অনেকগুলি কুসংস্কার ঢুকে পড়ে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শাস্ত্র সম্মত নয়।..... তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত এবং তিনি যে সকল আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছেন সেগুলি সত্যই শাস্ত্র বিরোধী।... তাঁর ছন্দ চাতুর্য পাঠককে মুগ্ধ করে এবং আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলা শব্দের সংগে একাকার হয়ে মিশে গেছে। (১৭ পৃষ্ঠা-১০৯, ১০১, ও ১০২)। আগেই বলা হয়েছে যে, বাংগালীদের বোধগম্য করে কবি ফেকাহ শাস্ত্রে শরীয়তনামা' গ্রন্থ খানি রচনা করেন।

বস্তুতঃ বাঙালী মুসলমান সমাজে সামাজিক প্রভাবে ধর্মীয় আচার আচরণে যে সব কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল তা, থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করে ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরণ করে চলার পথনির্দেশ করার জন্যেই শরীয়তনামা লিখিত হয়েছিল।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কবির কাল নির্নয়ের কোন চেষ্টা করেন নি। ডঃ এনামুল হক কবির রচিত কোনো গ্রন্থের রচনার তারিখ পাননি। তাই তিনি আত্মবিবরণীর সাহায্যে কবির কাল নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। "শরীয়তনামা" গ্রন্থের আত্মবিরণী বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, কবি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং "জঙ্গনামা"র আত্মবিবরণী আলোচনা করে ডঃ এনামুল হক মনে করেন যে, ১৫৬০ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কবির আর্বিভাবকাল নিরূপণ করা যায়। (১৭ পৃষ্ঠা-৮০)।

শরীয়ত নামা গ্রন্থের আত্মবিবরণী হচ্ছেঃ-

www.pathagar.com

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
নামে হামেদ্দীন মতির মান।
গৌড়দেশ বাঙ্গালা নাম রসে কষে অনুপাম
শেবুহ পাল উজীর প্রধান।।
তানপুত্র গুণবান অস্ত্রে শস্ত্রে পূজ্যমান
জগে ঘোষে বুরানুদ্দীন নাম।
দৈবগতি দেশ ছাড়ি ইষ্ট মিত্র সঙ্গে করি
রোসাঙ্গ দেশেতে কৈল্য ধাম।।
তখনে রোসাঙ্গ দেশে কিবা আদ্যে কিবা শেষে
অশ্ব আছেয়ার ন আছিল।
হয় গজ বহু সঙ্গে দেখি তানে নৃপরঙ্গে
লস্কর উজীর তানে কৈল্য।
ইবরাহিম তান সূত রূপে গুণে অদ্ভুত
অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ
সুজাউতদ্দীন নাম অস্ত্রে শস্ত্রে অনুপাম
নাম ধরে তাহান নন্দন।।
শেখ রাজা তান পুত্র প্রভুগতে সুপবিত্র
লোকে ঘোষে ফকির মোড়ল।।
তান সূত গুণধাম কাজী ইসহাক নাম
ছিল দীন তা হন্তে উজ্জ্বল।
তাহান ঔরসে কর্ম সৈয়দানীর গর্ভে জন্ম
শরীফ মনসুর খোন্দকার।
নসরুল্লাহ সূত জান হীন বুদ্ধি পশুজ্ঞান
রচিলেক পঞ্চালী পয়ার।। (১৮)

'জঙ্গনামা' গ্রন্থের আত্মবিবরণী নিম্নরূপঃ-

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পিতামহ হামিদুল্লাহ খান।
তানপুত্র কল্পতরু, বোরহানদ্দি জগগুরু,
রূপান্তর ইছুক সমান।।
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে।
তানপুত্র মহাবীর অস্ত্রে শস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহীম খান নাম ধরে।।
তান পুত্র জ্ঞান বান, শ্রী সুজাওদ্দি খান,

www.pathagar.com

পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান বেলা।
অনেক গ্রামের পতি যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা।।
তানপুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবু খান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যাজিয়া সংসার মায়া, প্রভুভাবে চিত্ত দিয়া
করিলেন্ত আগমে গমন।।
আছিলেন পুত্র তান, শ্রী ইছহাক খান,
শরীয়ত খাদেম প্রধান।
তানপুত্র শীল ধর্ম ছৈদানী উদরে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান।।
তানপুত্র অল্প জ্ঞান হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালী রচিল শিশু বুদ্ধি।
শুন সব গুণিগন কৌতুহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি।।

(১৯ পৃষ্ঠা ৩৮)।

জঙ্গনামার অন্য এক স্থানে কবি লিখেছেন,

"কল্পতরু জগগুরু, শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজী ইসহাক গুণবান।।
তানপুত্র শরীফ মনসুর খোন্দকার।

....

রাম্ভুদেশ নরগতি নামে ফতে খান।
যাকে মান্য করি রসাইল বিদ্যমান।।
রোসাঙ্গের নরপতি ভূবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাৎ।।
গ্রামভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর ব্যূহে যেবা গিয়া।।
হেন জনে যাহোক করিয়া আগুয়ান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুসলমান।।
যাহার মধুর স্বর খোতবা শুনন্ত
যাহোক আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত।

....

তানপুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণীগণ স্থান।।" (২০ পৃষ্ঠা-১৭৩)।

www.pathagar.com

ডঃ করিম বলেন, তিনি বানানে কিছু রদবদল করেছেন)।

ডঃ আবদুল করিম ডঃ মুহাম্মদ এনামূল এবং অন্যান্য পন্ডিতদের মতামত ও যুক্তি সম্পূর্ণ খন্ডণ করে বলেছেন, "..... কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের কাল-নির্ণয়ের উপযোগী অকাট্য প্রমাণ কবির রচনার ভিতরেই রয়েছে। এই প্রমাণগুলি ডঃ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বা ডঃ আহমদ শরীফদের হস্তগত হয়নি।

এখন এই প্রমাণগুলি আলোচনা করা হচ্ছেঃ-

১। শরীয়তনামা গ্রন্থের একস্থানে আছে

একদিন দোহাজারী শহরেতে রঙ্গে।
বসিছিলুম কতজন অশ্ববার সঙ্গে।
তার মাঝে কহি এক অপূর্ব কথন।
পন্ডিতে জানি বা যেন অমুল্য রতন।।

দোহাজারী নামের উৎপত্তি একটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। (দোহাজারী চন্দনাইশ থানার একটি রেলষ্টেশন।) ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সুবাদার শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম অধিকৃত হয়। আরাকান-রাজ চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত হন এবং মীর মর্তুজার নেতৃত্বে মোগল সৈন্যরা রামু জয় কর নেন। কিন্তু মগেরা প্রায়ই দক্ষিণ চট্টগ্রামে হানা দিত। তাই (মোঘল শাসক কর্তৃক)। শঙ্খ নদীর তীরে আধু খান হাজারী এবং লক্ষণ (লচসন) সিংহ হাজারীকে সীমান্ত পাহারার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। দুই হাজারীকে নিযুক্ত করায় ঐ স্থানের নাম দোহাজারী হয়। তাঁদের বিশেষ জায়গীর দেওয়া হয় এবং তাঁরা নদীর তীরে দুর্গ তৈরী করে সেখানে পাহারা দিতে থাকেন। অবশ্য পরে বংশ পরম্পরায় তাঁরা সেখানে থেকে যান। (২১ পৃষ্ঠা-৬৩-৬৫)। সুতরাং দোহাজারী নামের উল্লেখ থাকায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পরে তাঁর "শরীয়তনামা" গ্রন্থ রচনা করেন।

২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত "শরীয়তনামা" গ্রন্থের পান্ডুলিপিতে গ্রন্থের রচনাকাল পাওয়া গেছে। রচনাকাল সূচক শ্লোকগুলি নিম্নরূপঃ-

"এবে কহি তুমি সবে শুন মন দিয়া।
পুস্তক আদায় সন লওত গুণিয়া।।
চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস।।
পুস্তক গ্রহণ দুঃখ কহন ন যায়।
মাত্র যেই নারী বালক প্রসবায়।।
যত দুঃখ পাইলাম আমি মুরুক্ষের কারণ।
অবশ্য দুঃখের ফল দিব নিরঞ্জন।।

....
শরীয়ত নামা বাণী লেখা সাঙ্গ ভেল।

www.pathagar.com

সন তারিখ লেখিবারে শ্রদ্ধা বাড়ি গেল।।
চতুর্বিংশ আঘ্রানের জোহর সময়।
বিংশগ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয়।।
আছিল ঈদের দিন রোজ সমবার।
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার।।
যত অলিগণ আছে ভরিয়া গেরাম।
শুন জন মোমিন পদে হাজার সালাম।।।

অতএব গ্রন্থ রচনার তারিখ "চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস। চন্দ্র-১, ঋতু-৬, সিন্ধু-৭ এবং গগন-১, অর্থাৎ গ্রন্থ রচনার তারিখ ১৬৭১।

প্রকৃত তারিখ বলতে গিয়ে কবি বলেছেন যে গ্রন্থ রচনা শেষ হয় অগ্রহায়ণ মাসের ২৪ তারিখ মোতাবেক শওয়াল মাসের ১লা তারিখ, রোজ সোমবার জোহরের সময় বা মধ্যাহ্নের সামান্য পরে। কবি এক চরণে বলেছেন, "বিংশ গ্রহ রমজানের চাঁন্দের নির্ণয়" এবং অন্য চরণে বলেছেন, "আছিল ঈদের দিন রোজ সমবার"। গ্রহ অর্থে নয়, অতএব বিংশ গ্রহ অর্থ ২০+৯= ২৯ অর্থাৎ এ সনে ২৯ দিনের রমজান মাস ছিল। ১৬৭১ সন কি হিজরী সন বা অন্য কোনো সন তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনও রয়েছে। সাধারণত মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা হিজরি সন ব্যবহার করতেন। তবে চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে বাংলা সন এবং মঘীসন ব্যবহারের রেওয়াজও দেখা যায়। কিন্তু ১৬৭১ সন হিজরী, বাংলা বা মঘী সন হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। (ঐ সন গুলো এখনো ১৬০০ বছরে পৌঁছে নি)। সুতরাং ১৬৭১ নিশ্চিতভাবেই শকাব্দই হবে এবং গ্রন্থ রচনা কাল ১৬৭১+৭৮=১৭৪৯ খৃস্টাব্দ। অতএব শরীয়ত নামা গ্রন্থে দোহাজারী নামের উল্লেখ এবং রচনাকাল সূচক শ্লোকের সাহায্যে আমরা মনে করি যে, কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শরীয়তনামা গ্রন্থ রচনা করেন। এই হিসাবে কবি সপ্তদশ শতকের শেষপাদে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত (বেশী না হলে) জীবিত থাকেন। (১৭ পৃষ্ঠা ৮৯, ৯০, ৯১)।

বস্তুতঃ ডঃ করিম নির্ধারিত নসরুল্লাহ খোন্দকারের কাল এবং শরীয়তনামা রচনার সময় সম্পূর্ণ সঠিক।

আবদুল কমির সাহিত্য বিশারদ এর মতে নসরুল্লাহ খোন্দকার চারটি গ্রন্থ (১) জঙ্গনামা, (২) মুসার সওয়াল, (৩) হেদায়তুল ইসলাম ও (৪) শরীয়তনামা" লিখেছেন। ডঃ আবদুল করিম প্রাপ্তসব পান্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে, হেদায়তুল ইসলাম শরীয়তনামারই একটি অংশ। সুতরাং নসরুল্লাহ খোন্দকার (১) জঙ্গনামা, (২) মুসার সওয়াল এবং (৩) শরীয়তনামা-এই তিনটি গ্রন্থ লিখেছেন। ডঃ করিমের এই ব্যাখ্যা সঠিক।

www.pathagar.com

কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার তাঁর গ্রন্থে, বিশেষ করে শরীয়তনামায় ইসলামী শরীয়তের বিধান সমূহ আলোচনা করেছেন, স্থানীয় অমুসলিম সমাজে প্রচলিত যে সব নিয়মকানুন অজ্ঞতার কারণে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছিল সেগুলো বর্জন করার কথা বলেছেন এবং ইসলামের নামে যারা ভন্ডামী করে সেসব অর্ধশিক্ষিত আলিমদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতেও বলেছেন।

বস্তুতঃ নসরুল্লাহ খোন্দকার তাঁর যুগে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) মুলসমানদের ধর্মপথে চলার নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। কবির সময়ে ফেকাহ্ শাস্ত্রের প্রমাণ্য গ্রন্থ ছিল বলে কোন প্রমান নেই। হস্ত লিখিত আরবী ফার্সী বই ছিল দুস্প্রাপ্য এবং তা অশিক্ষিত বাঙ্গালীদের বোধগম্য ছিল না।

বস্তুতঃ আলোচ্য কবিগনই মধ্য যুগে অর্থাৎ ১৭৫০-৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা করেন। সুতরাং দেখা যায় যে, কবির সংখ্যা ও গ্রন্থের সংখ্যা বিচারে মুসলমানের সংখ্যা ও মুসলিম রচিত গ্রন্থের সংখ্যাই বেশী। অন্যদিকে আলোচ্য সময়ে হিন্দু কবিগণের উপজীব্য ছিল শুধুমাত্র সংস্কৃতে রচিত বেদপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত কাহিনী, কিন্তু মুসলমান কবিরা আরবী, ফারসী, হিন্দি, সংস্কৃত সাহিত্য, দেশে বিদেশে প্রচলিত রূপ কথা উপকথাকে বাংলা সাহিত্য রচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত মুসলমান লেখকেরা তাঁদের রচনায় সহজবোধ্য আরবী-ফারসী-হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেন। ফলে তাঁদের রচনা হয়ে ওঠে রসগ্রাহী। এজেন্যই দেখা যায় যে, পরবর্তী কালের, অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রও তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সাবলিলভাবে আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে যে সাহিত্যের সূচনা, পরাগলপুরে তা হয় পল্লবিত, চট্টগ্রামে বিকশিত এবং আরাকানে সমৃদ্ধ হয়ে সেই সাহিত্যই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত রচনা করে।

তাই একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগে পরাগলপুর ছিল বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগার, চট্টগ্রাম ছিল বিকাশ ক্ষেত্র আর আরাকান ছিল সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করন কেন্দ্র।

সৈয়দ সুলতানের মতো আলাওলও ছিলেন যোগী সাধক ও সুফী সাধক, পদাকার কবি ও গায়ক। সৈয়দ সুলতান ষষ্ঠদশ এবং আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে আলাওল সৈয়দসুলতানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ভাষা বিন্যাস ও শব্দ প্রয়োগ থেকে এটাও স্পষ্ট যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের উপর সৈয়দ সুলতান ও আলাওলের প্রভাব পড়েছিল।

তথ্য পঞ্জী

১। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা- প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০

www.pathagar.com

২। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ), ইষ্টার্ন পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৩। পুথি পরিচিতি-আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত ও ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

৪। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-১৯।

৫। সাহিত্য-১৩১০।

৬। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-১-২।

৭। মুক্তারাম সেন-সারদা মঙ্গল-সম্পাদক-আবদুল করিম, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-১৩২৪।

৮। দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল-আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭) প্রকাশিত। (বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-৩-৪ পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭)।

৯। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-৪

১০। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-৯

১১। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

১২। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-২

১৩। ডঃ আহমদ শরীফ-সৈয়দ সুলতান-তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭২।

১৪। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম। বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৯৩ ইং

১৫। ডঃ এনামুল হক-মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য। ঢাকা, ১৯৫৫।

১৬। সাহিত্য পত্রিকা-৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

১৭। ডঃ আবদুল করিম-বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪।

১৮। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত শরীয়তনাম'র পান্ডুলিপি, (পান্ডুলিপি ক্রমিক নং-২৫৪)।

১৯। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খন্ড ১ম সংখ্যা।

২০। ডঃ এনামুল হক- মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য , ঢাকা, ১৯৫৫।

২১। S. M. ALi- History of Chittagong Standard Publishers, Dkaka,

২২। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বাবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষা, ১৩৮৬, বাংলা।

২৩। মাসিক কলম, ঢাকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮৫।

২৪। আদ্য পরিচয়। মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত। রাজশাহী, ১৯৯৪

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে আরাকানের রাজসভায়ই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করে

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলায় হোসেন শাহের রাজত্বকালে পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রাম বাংলা সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ 'পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে চাটিগাঁ বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হইয়াছিল।...চাটিগাঁ হইতে এই সংস্কৃতির ঢেউ অনতিবিলম্বে তথাকার রাজসভাসদদের মারফৎ আরাকানে পৌছিয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-৩৪৩-৪৪)। প্রতিবেশী দেশ আরাকানের সঙ্গে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে....এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। তখন হইতে চাটিগাঁ ও নিম্নবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষিত মুসলমানেরা আরাকানে গিয়া রাজসভা জাঁকাইয়া বসিতেছিলেন।....এই সব কর্মচারীর প্ররোচণায় এবং গৌড়দরবারের অনুকরণে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও পোষকতার সূত্রপাত। (২ পৃষ্ঠা-৯৫)। রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজঅমাত্যেরা বেশীর ভাগ ছিলেন সিলেট-চাটগাঁ অঞ্চলের মুসলমান। ইহাদের প্রভাবেই সপ্তদশ শতাব্দে আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালার সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিগৃহীত হইয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-৩৪৪)।

সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় মুসলমান প্রভাব এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের অভিষেকে ভিক্ষুরা পৌরোহিত্য না করে সেখানকার রাজসভার মুসলমান মন্ত্রীরা পৌরোহিত্য করতেন। আরাকান রাজ সান্দু-থু-ধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খৃঃ) অভিষেকে তদীয় মুসলমান প্রধান মন্ত্রী নবরাজ মজলিশ শপথ বাক্য পাঠ করান। (৮ পৃষ্ঠা-১৩৫-১৩৬)।

শপথ বাক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,---

হেন, ধর্মশীলরাজা অতুল মহত্ত।
মজলিশ নবরাজ মহামাত্য।।
রোসাঙ্গ দেশেত আছে যত মুসলমান।
মহাপাত্র মজলিশ সবার প্রধান।।
মজলিশ পাত্রের মহত্ত শুন এবে।
নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে।।
যুবরাজ আইসে যবে পাটে বসিবারে।
দন্ডাইল পূর্বমুখে তক্তের বাহিরে।।

www.pathagar.com

মজলিশ পরি দিব্য বস্ত্র আবরণ।
সম্মুখে দন্ডাই করে দড়াই বচন।।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবে নিরন্তর।
না করিবে ছল বল লোকের উপর।।
শাস্ত্রনীতি রাজকার্যে হৈবে ন্যায় বস্তু।
নির্বলীরে বলী না করৌক বলবন্ত।।
দয়াল চরিত্র হৈবে সত্য ধর্মবন্ত।
সুজনেরে সন্তোষিবে নাশিবে দুরন্ত।।
ক্ষমা ধর্ম আচরিবে চঞ্চল না হইবে।
পূর্ব অপরাধে কারো মন্দ না করিবে।।
আরো নানাবিধ প্রকাশন্ত রাজনীতি।
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি।।
প্রথমে মজলিশে তবে সালাম করএ।
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ।।
(৯ পৃষ্ঠা ২৬)।

উপর্যুক্ত বর্ণনার সারমর্ম হলঃ রোসাঙ্গ বা আরাকানের মুসলমান অধিবাসীগনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মসলিশ নবরাজ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আরাকান রাজের পরলোক গমনের পর যুবরাজের অভিষেককালে তিনি তাঁকে (যুবরাজকে) শপথ বাক্য পাঠ করান। অভিষেককালে যুবরাজ সিংহাসনের বাইরে পূর্বমূখী হয়ে দাঁড়ালেন। প্রধানমন্ত্রী মজলিশ নবরাজ যুবরাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান যে, প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করবেন। তাদের সাথে ছলনা বা বলপ্রয়োগ করবেন না। সবলকে দুর্বলের উপর বলপ্রয়োগ করতে দেবেন না। সজ্জনকে রক্ষা এবং দুর্জনকে দমন করবেন। পূর্বকৃত অপরাধের জন্য বর্তমানে কাউকে শাস্তি দেবেন না। ধর্মীয় বিধান অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করবেন। নিজে সচ্চরিত্র ও ধর্মশীল হবেন। কোন সময় চঞ্চল হবেন না, সকলকে ক্ষমার চোখে দেখবেন। অতঃপর রাজা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশকে সালাম, পরে রাজপরিবারের বয়োবৃদ্ধদের প্রণাম করেন। (৮ পৃষ্ঠা-১৩৬/১৩৭)

সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা অন্তত দুইজন খুব শক্তিশালী কাব্য রচয়িতা পাইতেছি-দৌলৎ কাজী এবং আলাওল। দুইজনেই আরাকানের রাজার ও রাজসভাসদদের সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। (২ পৃষ্ঠা-৯৫)। আরাকান রাজসভার মারফৎ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব্য উপন্যাস জাতীয় গল্প, রূপকথা ও লৌকিক কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আমদানি হইয়াছিল। (২ পৃষ্ঠা-৯৫)। বস্তুতঃ 'আরাকান রাজসভায় সংবর্ধিত সব বাঙালী কবিই মুসলমান'। (ঐ পৃষ্ঠা ঐ) সুতরাং মুসলমান কবিদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী এবং ফার্সী লৌকিক কাহিনী আমদানী করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা, বাংলার মুসলমানেরা অনেক কাল পূর্ব হইতেই মনেপ্রাণে

www.pathagar.com

বাঙালী। (ঐ পৃষ্ঠা ঐ)। তাই বাঙালী মুসলমান কবিরা ইতোপূর্বেই ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনার সাথে সাথে আরবী, ফার্সী ও হিন্দি উপাখ্যান ভিত্তিক ইউসুফ-জোলায়খা, লায়লী-মজনু, নবী বংশ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন। এজেন্যই বাংলা সাহিত্য সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। (৩ পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০)। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যকারের যে রাজসভার নাম চিরসমুজ্জ্বল, সে হচ্ছে রোসাঙ্গের রাজসভা। রোসাঙ্গ ছিল আরাকানের রাজধানী।........আরাকানের রাজারা ছিলেন 'মগ'--ধর্মে-বৌদ্ধ।.... মগী ভাষাই তাঁরা বলতেন। কিন্তু বাংলা ভাষাও চলত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে মগের অত্যাচার ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের বাঙালী জনসাধারনের জীবন দুর্বীসহ হয়েছিল, একথাও বিস্মৃত হবার নয়। মগের মুল্লুক কথাটা তাদের সেই কুকীর্তির স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। দয়াধর্ম-সদাশয়তা, এমনকি স্থায়ী রাজনৈতিক বুদ্ধি, এসব কোন গুণ তাঁদের বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না; কিন্তু ছিল সম্ভবত একটা রাজকীয় গুণ- ধর্ম-সংকীর্ণতাবর্জিত অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা। অন্তত কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ এ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না।.... তাই রোসাঙ্গের রাজসভায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দায়ে বর্জন বুদ্ধির স্থান হয়নি।... এই রোসাঙ্গের রাজসভায় আমরা বাঙলা ভাষার প্রথম শক্তিশালী মুসলমান কবির দর্শন পাই, এবং প্রথম আদরণীয় মানবীয় প্রণয়কাহিনীর পরিচয় লাভ করি;-বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুইটি বস্তুরই গভীর অর্থ আছে। (৩ পৃষ্ঠা-১৪৮/১৪৯)।

আরাকান রাজ সভার আনুকূল্যে বাঙলা সাহিত্যের দুইজন বড় কবি (দৌলৎকাজী ও আলাওল) প্রণয়কাব্য রচনা করেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বাহিরে লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা হইতেছেন দৌলৎ কাজী। দৌলৎ কাজীর কাব্যের নাম সতীময়না বা লোর চন্দ্রানী। (৪ পৃষ্ঠা-৫৬)। দৌলৎ কাজী তাঁহার কাব্যের কাহিনীভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন হিন্দী কবি সাধনের কাব্য মৈনাসত হইতে। (২ পৃষ্ঠা-৯৬)। রোসাঙ্গের (আরাকান) রাজা থিরি থু ধর্মার (১৬২২-১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ) সেনাপতি (লস্কর উজীর) আশরাফ খানের অনুরোধে দৌলৎ কাজী কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। (১ পৃষ্ঠা-৩৩৮)। আশরাফ খান-এর কাজীর প্রতি কাব্য রচনার অনুরোধ সম্পর্কে কবি লিখেছেন--

ধর্ম রাজপাত্র শ্রী আশরাফ খান
হানিফী মোজাব ধরে চিশতিয়া খান্দান।.........
পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর
দীঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর।
সৈয়দ শেখ আর মোগল পাঠান
স্বদেশী বৈদেশী বহুত হিন্দুয়ান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর
সারি সারি বসিলেক মনুষ্য সকল।..........

www.pathagar.com

শ্রীযুত আশরাফ খান পণ্ডিত প্রধান
ষোলকলাপূর্ণ যেন চন্দ্রিকা সমান।
নীতি-বিদ্যা কাব্যশাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দহৃদয়।
হেনমতে সভা করি বসি থাকে নিতে
কহন্ত আনন্দচিত্তে কিতাব রচিতে।
আরবী ফারসী নানা উত্তম উপদেশ
বিবিধ প্রসঙ্গ-কথা আছিল বিশেষ।

তিনি কাজীকে দেশী ভাষায় সতী ময়না রচনার নির্দেশ দিলেন-

ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।
দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ।
তবে কাজী দৌলতে সে বুঝিয়া আরতি
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।
(১ পৃষ্ঠা-৩৩৮/৩৯)।

কাজী দৌলৎ যখন কাব্য রচনা হাতে নেন তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় দেবীমাহাত্ম্যমুক্ত এবং মানবীয় প্রণয় মূলক কোন কাব্য রচিত হয়নি। অথচ লোকসমাজ চিরদিনই প্রণয় কাহিনী শুনতে, রোমান্টিক প্রণয়লীলা জানতে আগ্রহী। 'ভারত বর্ষের হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দিককার রচনায়ও সে ধারার (রোমান্টিক মানবীয় প্রণয়) সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলায় কিন্তু ধর্ম সংস্কার-মুক্ত এরূপ ঐহিক কাব্যকথা নেই; এমনকি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও বাংলায় ধর্মের খোলসটি পড়ে দেখা দেয়, সে খোলস বজায় রেখে চলে। অথচ সাহিত্য যতক্ষণ পরলোক ও ধর্মের এই গাঁটছড়া ছেড়ে মর্তলোক ও মানব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলন-সূত্র খুঁজে না পায়, ততক্ষণ সাহিত্য আত্মপ্রতিষ্ঠিত নয়। কবি দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রানী বা সতীময়না এই হিসাবে বাংলা কাব্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন প্রয়াস, তা ধর্ম-সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর প্রথম একটি কাব্য। (৩ পৃষ্ঠা-১৫০)।

দৌলৎ কাজী কাব্য রচনা করতে শুরু করলেও তা, সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন আলাওল, তাও প্রায় ২০ বছর পর (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ)। দৌলত কাজী পাঞ্চালীর ছন্দে যে ময়নার ভারতী' লিখলেন কথা-বস্তুতে তা হিন্দ্-ফারসী প্রণয়-কথা, কিন্তু রূপে ও ভাবে তা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কাব্যাদর্শে ও সংস্কৃত-বাংলা ঐতিহ্যে রচিত, বিদগ্ধ ও বিশুদ্ধ বাঙলা কবিতা।...দৌলৎ কাজী গীতি-কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। (৩ পৃষ্ঠা-১৫২-৫৩)।

তাই এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে দৌলত কাজীই প্রথম শক্তিশালী বাঙালী মুসলমান কবি; 'লোর চন্দ্রানী' বাঙলা সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় সেকুলার বা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয় কাব্য এবং রোসাঙ্গের রাজসভা এ ধারার উদ্ভব ক্ষেত্র। (৩ পৃষ্ঠা-১৫১)।

www.pathagar.com

দৌলৎ কাজী যে শক্তিশালী কবি ছিলেন তাঁহা তাহার এই অসমাপ্ত কাব্যটি হইতে বোঝা দুরূহ নয়। ময়নাবতী ও মালিনী-দূতীর সংলাপ সমন্বিত বারমাসিয়া অংশের দুইটি পদ উধৃত করিয়া দৌলৎ কাজীর রচনা-সৌষ্ঠবের পরিচয় দিতেছিঃ-। মালিনী বলছে–

তোর দুঃখ দেখি	মুঞি মরি যাম	বোল ছাড়ি দেও বাণী
মালতী ভোমরা	যেন সমাগম	চারু ছৈলা দেও আনি।
দেখ ময়নাবতী	প্রথম আষাঢ়	চৌদিকে সাজে গম্ভীর
বধুজনপ্রেম	ভাবিতে পন্থিক	আইসএ নিজ মন্দির।
যার ঘরে কান্ত	সব সোহাগিনী	পূরএ মনোরথ কাম
দুর্লভ বরিয়া	তামসী রজনী	নির্জন সঙ্কেত ঠাম।
দারুণ ডাউক	দাদুরী ময়ুর	চাতক নিনাদে ঘন
তা ধ্বনি শুনিতে	শ্রবণে বিরহিণী	ছোহএ মনে মদন।
যাবতে বয়েস	কেলিকলারস	পূরএ মনোরথ জানি
হঠ-পরিপাটি	মান উপরোধ	চাতুরী তেজ কামিনী।
বৃদ্ধ হৈলে নারী	যুবকের বৈরী	ফিরি তাকে না পুছারি
যাইব যৌবন	নিশির স্বপন	জীবন দিবস চারি।
হরি মধুপতি	মান রসবতী	মতি ভোর তোর সাঞি
অবধি অন্তর	ফিরি না পুছল	আর তোর কি বড়াই।
তোরো দুখ সুনত	মরতি হৌ মৈনা	বোল বাঁহ দৈ মোহি।
জিসি মালতি	কৌ ভঁমরা	আমি মিলাবহু সোহি।
শুনহ উকতি	করহুঁ ভকতি	মানহ সুরতি রাই
নাগর সুজন	মিলাইয়া দেওঁ	রাধার কোলে কানাই।
কহেন্ত দৌলত	সতী সৎপথ	না ত্যজে বাতে প্রাণ
লস্কর নায়ক	রস-বাণিজার	শ্রীযুত আশরফ খান।

ময়নাবতীর উত্তরঃ-

আএ ধাঞি কুজনি	কি মোক শুনাঅসি	বেদ-উকতি মহে পাঠং
লাখ উপাএ	মেটিতে কো পারএ	যো বিধি লিখনং ললাট।
	মালিনী বোলাসি	অনুচিৎ বাণী
ধরম ন ছোঅতি	তেজিআ সৎমতি	লোর-প্রেম করাঅসি হানি।
মোহোর সুনাঅর	গুণের সায়র	মধুর মুরতি বেশ
সো মধু তেজিয়ে	কৈছে বিখ পানাও	ভাল ধাঞি কহ উপদেশ।
তুমি বড় পাপিনী	পাপ শুনাঅসি	ধরম করা অসি বাম
পাতক ঘাতক	ধাঞি মোর চিন্তসি	জাতিকূল করহ নির্ণাম।
দুরন্ত দুরতি	দূতীপনা দূর কর	চিন্তহ মোহোর কল্যাণ
কাজী দৌলৎ ভনে	দাতা মনোভব মনে	শ্রীযুত আশরফ খান।

বিরহ বর্ণনায়ঃ-

www.pathagar.com

মালিনী কি কহব বেদন-ওর
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।
শাঙন-গগন সঘন ঝরে নীর
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা
থরকএ যামিনী কম্পয় দেহা
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল।
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ।
গরল-সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ
দংশিয়া পলায় যেন এ কালভুজঙ্গ।
তাহা সনে পালয়ে যে প্রেমের অঙ্কুর
ধীর না রহে জাতি-পিরীতি দুহুঁকূল।
তেঞি ঋতু মানিএ আওএ লোর
ন তু জীবন যে মরণ-সম মোর।
তছু পএ সাজয়ে শাওন-রস-আশ
অবিরত কান্ত ন ছোড়ে কান্ত-পাশ।
বিরহ পীড়ারি ধনী জপয়তি নাহা।
আশরফ নায়ক রসগুণগাহা।
(১ পৃষ্ঠা-৩৪০, ৪১, ৪২)।

রাজা থিরি-সান্দ-থু-থম্মার (১৬৫২-৬৪) মহাপাত্র সুলেমানের অনুরোধে আলাওল দৌলৎ কাজীর কাব্যের বাকী অংশ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আলাওল লিখেছেনঃ----

আশরফ-আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর
রচিল চন্দ্রাণী-কথা অতি সুরুচির।........
আশরফে আদ্য বারমাস আরম্ভিল
বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিল।
তবে কাজী দৌলৎ স্বর্গেত হৈল লীন
খন্ডবাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন।.........
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়
শ্রীচন্দ্র-সুধর্মা সে নৃপতি মহাশয়।........
তান মহাপাত্র শ্রীমন্ত সুলেমান
নানা বিদ্যা শাস্ত্র গুণে শত-অবধান।
প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রাণীর কথা

www.pathagar.com

অসাঙ্গ রহিল এই কাব্য রসগাথা।........
এতেক ভাবিয়া সুলেমান মহামতি
হরষিতে আদেশ করিল আমা প্রতি।.......
এই খন্ডপুস্তক পুরাও মোর নামে
দুগ্ধ মধু দোঁহ আনি মিলাও একঠামে।........
মহন্ত আরতি সে শুনি আলাওল
অঙ্গীকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫৫-৩৫৬)।

সতী ময়না শেষ করতে গিয়ে কাজী দৌলতের কীর্তি উল্লেখ করে আলাওল বলেছেনঃ---

"তান সম আমার না হয় পদ গাঁথা।
গুণীগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা।"

সতী ময়না শেষ করেছেন এই বলে,

"মুই মোহা পাতকীর পাপ নাহিওর
আশীর্বাদ কর স্বর্গগতি হোউক মোর। (৩ পৃষ্ঠা-১৫৪)।

দৌলত কাজীর কাব্যের পূর্ণ অংশ এবং আলাওলের সম্পূরক অংশ এখানে পুরা উধৃত করা হয়নি। উদ্ধৃত অংশ থেকে পাঠকের পক্ষে পুরা কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্যে এখানে হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপরিহার্য। কাহিনী হচ্ছেঃ-

গোহারী দেশের রাজা লোর সুন্দরী স্ত্রী ময়নাবতির সাথে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমনি সময়ে একযোগী একদিন রাজা লোরকে মোহরা দেশের সুন্দরী রাজকন্যা চন্দ্রানীর চিত্র দেখিয়ে রাজাকে চন্দ্রানী লাভে উদ্বুদ্ধ করে। চন্দ্রানী কিন্তু কুমারী নয়, বিবাহিতা। তার স্বামী বামন, বীর যোদ্ধা কিন্তু নপুংসক। যোগীর কথায় লোর চন্দ্রানীকে পেতে আগ্রহী হয়ে মোহরা দেশে রওনা হন। মোহরাতে গোপনে চন্দ্রনীর সাথে লোর এর দেখা হয়। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মিলনের অভিসারে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে দেখে তারা গোপনে গোহারির পথে মোহরা ত্যাগ করে। কিন্তু পথে বন মধ্যে চন্দ্রানীর স্বামী লোরকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে বামন বীর নিহত হয়। কিন্তু চন্দ্রানীকে স্বর্প দংশন করে। সংবাদ পেয়ে চন্দ্রানীর পিতা সেখানে উপস্থিত হন। চিকিৎসায় চন্দ্রানী বেঁচে উঠে। রাজা লোর চন্দ্রানীকে মোহরা নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেন এবং লোর এর হাতে রাজ্য ছেড়ে দেন। লোর মোহরা রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এতটুকু হচ্ছে প্রথম খন্ড-'লোর চন্দ্রানী।' দ্বিতীয় খন্ড হচ্ছ 'সতী ময়না।' স্বামীর বিরহে গোহারীর রানী ময়নাবতীর দুঃখে দিন কাটছিল। এক সময় প্রতিবেশী এক রাজপুত্র ময়নাবতীকে পেতে চেয়ে দূতী পাঠালে স্বামী শোকে বিহবলা ময়নাবতী তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। (এতটুকু পর্যন্ত দৌলৎ কাজীর রচনা।) তাহার পর সখীর পরামর্শে ময়নাবতী এক ব্রাহ্মণকে নিজের পালিত শুক পাখী

www.pathagar.com

সহ স্বামীর সন্ধানে পাঠান। শুক পাখী দেখে লোরের ময়নাবতী ও রাজ্যর কথা মনে হয়। তাই পুত্রের হাতে মোহরার রাজ্যভার ছেড়ে চন্দ্রানীকে নিয়ে গোহার রাজ্যে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে যান। (৩ পৃষ্ঠা-১৫২-৫৩)।

রোসাঙ্গ-রাজসভার দ্বিতীয় কবি আলাওল। ......আলাওল পন্ডিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। অনেকগুলি ভাষায়, আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাঙলায় ও হিন্দীতে তাঁহার অল্প বিস্তর অধিকার ছিল। সঙ্গীত-নাট্যকলায়ও তাঁহার দখল ছিল। সামান্য রাজ-আসোয়ারের এমন অসামান্য গুণ গুণিপোষক রাজার দেশে বেশী দিন ছাপা থাকিবার কথা নয়। রোসাঙ্গের মুসলমানেরা "তালিম আলিম বলি আদর করেন্ত।"...... আলাওলের যশ রাজমন্ত্রী সোলেমানের কর্ণগোচর হইল। তিনি আলাওলকে সৈন্যদল হইতে ছাড়াইয়া নিজের সভাসদ করিলেন। আলাওল লিখিয়াছেন,

শ্রীযুত সোলেমান মহাগুণবন্ত
পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষেন্ত।
মহাহরষিত হৈল পাইয়া আমারে
অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোষেন্ত আমারে।
(১ পৃষ্ঠা-৩৪৩/৩৪৪)।

সোলেমানের অনুরোধে রচিত 'সতীময়না' (কাজী দৌলৎ এর কাব্যের অবশিষ্ঠাংশ) আলাওলের প্রথম রচনা। আলাওলের দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 'পদ্মাবতী'। এটির রচনা সমাপ্ত করা হয় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। অযোধ্যা প্রদেশের জায়স গ্রাম নিবাসী মালিক মোহাম্মদ জায়সী রচিত পদুমাবৎ (যা জায়সীর পদুমাবৎ নামে পরিচিত) এর স্বাধীন অনুবাদ পদ্মাবতী। জায়সী এই কাব্য রচনা করেন ১৫২০ থেকে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, আর আলাওল তা অনুবাদ শেষ করেন ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে। (১ পৃষ্ঠা-৩৪৬)।

মাগন ঠাকুর ছিলেন আরাকানের রাজা থদো মিনতারের (১৬৪৫-৫২) কন্যা যশস্বিনীর পালিতপুত্র ও প্রধান অমাত্য এবং পীর খোন্দকার মাসুম শাহার শীষ্য। রাজা থদো মিনতারের মৃত্যুর পর তার কন্যা যশস্বিনী এবং পুত্র থিরি সান্দ থুধম্মা যৌথভাবে আরাকানের শাসকহন। কন্যা বয়সে বড় বলিয়া "মুখ্য পাটেশ্বিরী" হন এবং প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর হন অমাত্য মহাজন। আলাওল ছিলেন মাগন ঠাকুরের সভাসদ। একদিন সভায় জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের প্রসঙ্গ উঠলে মাগন আলাওলকে বাংলায় পদ্মাবতী লিখতে বলেন। মাগনের বক্তব্য আলাওল এভাবে বর্ননা করেনঃ--

এই পদ্মাবতীর সরস রস কথা
হিন্দুস্থানীভাবে শেখে রচিয়াছে পোথা।
রোসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এ ভাষা
পয়ার রচিলে পুরে সভাকার আশ।
যেহেন দৌলৎ কাজী চন্দ্রাণী রচিল

www.pathagar.com

লস্কর উজির আশরফে আজ্ঞাদিল।
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি.......

আলাওল লিখেছেন,

ভাগ্যোদয় হইল মোর বিধি-পরসন্নে
দুঃখনাশ হেতু তান সহিত মিলনে।
অনেক আদর করি বহু সম্ভাষণে
সদত পোষেন্ত মোরে অন্নবস্ত্র-দানে।
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন
তান গুণসূত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন।
গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি
গীতনাট যন্ত্রতন্ত্র রঙ্গঢঙ্গ করি।
নানান প্রসঙ্গ কথা কহিয়া রসদ
তান সভামধ্যে থাকি হৈয়া সভাসদ।
(১ পৃষ্ঠা-৩৪৬/৩৪৭)।

পদ্মাবতীর কাহিনী বর্ণনা শুরু করার আগে আলাওল যে বন্ধনা করেনঃ-

প্রথমে প্রণাম করুঁ এক করতার।
যেই প্রভু জীবন দানে সৃজিলা সংসার।।
করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তারপরে প্রকট করিলা কবিলাস।।
সৃজিলেন্ত আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গে সৃজিলেন্ত করি নানা ভাঁতি।।
সৃজিলেন্ত পাতাল মহি সর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বর্ণ করিলা প্রচার।।
সৃজিলেন্ত দিবাকর শশি দিবারাতি।
সৃজিলেন্ত নক্ষত্র নির্মল পাঁতি পাঁতি।।
সৃজিলেন্ত শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর।
করিলা মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার।।
সৃজিলেন্ত সপ্তমহী সপ্তব্রহ্মান্ড।
চতুর্দশ ভূবন সৃজিলা খন্ড খন্ড।।
(৫ পৃষ্ঠা-১৩১)।

স্বাধীন অনুবাদ প্রসঙ্গে আলাওল নিজেই বলেছেনঃ-

এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে ✳করি ভক্তি
স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজ মন-উক্তি।
(১ পৃষ্ঠা-৩৪৭)। ✳জায়সী।

www.pathagar.com

পদ্মাবতী চিতোরের পদ্মিনীর উপাখ্যান। রত্নসেন স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে যাচ্ছেন। এই সময় পদ্মাবতী সখীদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এই বিদায় দৃশ্য আলাওল বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ--

একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা।
ছাড়িয়া নাইয়র ঘর বান্ধবসমাজ
একসরি হইয়া চলিলোঁ ভিন্ন রাজ
তোমরা সবেরে কোনমতে পাসরিব
স্মরণ হইলে মনে জ্বলিয়া মরিব।
শুন প্রাণসখী আমি চলি যাব যথা
তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা।
যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভীত
সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত।
ছত্রশালা বৃন্দাবন কেলিসরোবর।
প্রাণপ্রিয়া সখীগণ প্রাণের দোসর।
একদিনে ছাড়িল সিংহল-কইলাস
বিধিবশে হৈল মোর দূরদেশে বাস।
পরদশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও
অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও।
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশে
মোর মনে রহিলেক এ জনম-ক্লেশে।
আশীর্বাদ আমারে করিও একমনে
সদত পিরীতি যেন থাকে স্বামী সনে।
আজন্ম বিচ্ছেদ দুঃখ দিলেন গোসাইঁ
ছাড়িল সিংহল দ্বীপ আর দেখা নাই।
যেই কিছু ধিকাধিক বলিল যখনে
দুঃখিনীরে ক্ষমা কর না রাখিও মনে।..........

এই বিদায় পর্ব জায়সী লিখেছেন এভাবেঃ--

হমতুম মিলি এঁকে সঙ্গে খেলা
অন্ত বিছোহ আনি গিউ মেলা।
তুম্হ অস হিত সংঘতী পিয়ারী
জিয়ত জিউ নহি করোঁ নিনারী।
কন্ত চলাঈ কা করৌ আয়সু জাই ন মেটি
পুনিহম মিলহিঁ কি না মিলহিঁ লেহু সহেলী ভৌটি।

www.pathagar.com

ধনি রোধত রোবহিঁ সব সখী
হুম তুমহ্ দেখি আপু কহঁ ঝঁখী।
তুম্হ ঐসী জৌ রহৈ ন পাঈ
পুনি হম কাহ জো আহিঁ পরাঈ।
আদি অন্ত জো পিতা হমারা
ওহু ন য়হ দিন হিয়ে বিচারা.......।

বস্তুতঃ এখানে আলাওলের বর্ণনা অনেক বেশী বাস্তব ও আন্তরিক।
(১ পৃষ্ঠা-৩৪৮/৩৪৯)।
আলাওল তাঁর লেখায় জায়সীর লেখাকে অনেক কাটছাটও করেছেন। যেমন, জায়সী লিখেছেনঃ-

কীন্হেসি সাত সমুঁদ অপারা।
কীন হেসি মেরু খিখিন্দ পহারা।
কীনহেসি নদী নার অউ ঝরনা।
কীনহেসি মগর মচ্ছ বহুবরণা।
কীনহেসি সাপ মোতী তেহী ভরে।
কীনহেসি বহুতৈ নগ নিরঝরে।।
কীনহেসি বনখঁন্ড ঔ জরি মূরী।
কীনহেসি তরিব তার খজুরী।।
কীনহেসি সাউজ আরন রহহীঁ।
কীণহেসি পংখি উড়হিঁ জহঁ চহহীঁ।
কীনহেসি বরণ সেত ঔসামা।
কীনহেসি নীদঁ ভূখ বিসরামা।।
কীনহেসি পান ফুল রস্ ভোগূ।
কীনহেসি বহু ঔখদ বহু রোগু।
নিন্মিখ ন লাগ করত ঔহি সবৈ কীন্হ্ পলএক।
গমন অঁতরিখ রাখা বাজু খম্ভ বিলু টৈক।।

বাংলা অনুবাদঃ-

তিনি অপার সপ্তসমুদ্র সৃজন করেছেন। মেরু ও কিষিন্দা পাহাড় নির্মাণ করেছেন। নদী নালা এবং ঝর্ণা নির্মাণ করেছেন। অনেক প্রকারের কুমির এবং মাছ সৃষ্টি করেছেন। শুক্তির মধ্যে মুক্তা ভরেছেন। অনেক প্রকারের নির্মল মণি তৈরী করেছেন। বন বানিয়েছেন এবং শিকড়, খেজুর ও তালবৃক্ষ বানিয়েছেন। শিকার করবার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, যারা বনে ঘুরে বেড়ায়। পাখী সৃষ্টি করেছেন, যারা যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়। শ্বেত এবং শ্যামবর্ণ সৃষ্টি করেছেন। ভোগের জন্য পান ফল সৃষ্টি করেছেন। অনেক ঔষধ সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক রোগ। এসব করতে তাঁর এক নিমেষও লাগেনা। এক পলকেই তিনি সব কিছু করেন। গগণ অন্তরীক্ষকে স্তম্ভ ছাড়াই স্থির রেখেছেন। আলাওল লিখেছেনঃ-

www.pathagar.com

সৃজিলেন্ত সমুদ্র মেরু জলচর কুল।
সৃজিলেন্ত ছিপিতে মুক্তা রত্ন বহুমূল।
সৃজিলেন্ত পান ফুল বহু ভোগ্য স্বাদ।
সৃজিলেন্ত নানা রোগ নানান ঔষধ।।
এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গগণ রাখিছে বিনি স্তম্ভ।

এই অনুবাদে জায়সীর তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণ এবং ৭ থেকে ১২ চরণ নেই। (৫ পৃষ্ঠা-১৩২-১৩৩)। কিন্তু এটা সত্য যে, জায়সী ১৬ চরণে যা বলতে চেয়েছেন আলাওল তার অর্থ উপরোক্ত ছয় চরণেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আলাওল সুফী সাধক ছিলেন।.... পদ্মাবতীর মধ্যে স্থানে স্থানে আলাওল সুফী প্রেম-সাধনা সমন্ধে গভীর ও রসগর্ভ উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে আলাওলের অনুবাদ যেন মূলের অতিরিক্ত মুল্য পাইয়াছে। যেমনঃ-

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস
ত্রিভূবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।
যাঁর হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর।
প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিন অক্ষর
পঞ্চাক্ষরে বিরহিণী লক্ষ্য পঞ্চশর।
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল
সুখদুঃখ প্রতি তার আপদ তরিল।
বিরহ-অনলে যার দহিল পরাণ
পিতল আঙ্গটি করে হেম-দরশন।
যাহার বচনে হয় বিরহের মায়া
কিবা তার রূপরেখা কিবা তার কায়া।
আন বেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর
গোপনে মাণিক্য যেন ধূলির ভিতর।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫০-৩৫১)।

যোগ সাধনা সম্বন্ধে কবির জ্ঞান সুগভীর।..... হিন্দু যোগ ক্রিয়া এবং মুসলমান যোগক্রিয়া দুইই ছিল কবির সুবিদিত। হিন্দু যোগের কথা, যেমন-

উড়িয়ান-বন্ধ কটি-পরন কৌপীন
অনাহত শব্দমধ্যে মন কৈল লীন।.........
তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রারত
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্মার পথ।
(৩ পৃষ্ঠা-১৫৮)।

www.pathagar.com

এবং অধোমুখে চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে
উর্ধমুখী হইয়া কুণ্ডলী সব চোষে
দরশণ নহে পুনি শক্তি আর শিব
এই সে কারণে মরে সংসারের জীব। .....
বিচারি কহিলে সব যোগের লক্ষণ
পুস্তক বিশাল হয় শুন মহাজন।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫১)।

মাগনের আদেশে "ভাঙ্গিয়া চৌপাঈ ছন্দ রচিল পয়ারবন্ধ" বলে আলাওল যে পদ্মাবতী রচনা করেন তা জায়সীর পদুমাবৎ এর অনুবাদ হলেও এই অনুবাদ কখনো আক্ষরিক, কখনো ভাবানুগত এবং কখনো স্বাধীন। কোন কোন প্রসঙ্গ ছাঁটিয়া ছোট করা হইয়াছে, কোন কোন প্রসঙ্গ টানিয়া বাড়ানো হইয়াছে।. ...জায়সীর কাব্য কাহিনীতে আলওল যে অল্প অল্প পরিবর্তণ করিয়াছেন তাহা প্রায়ই অসঙ্গত হয় নাই। জায়সীর কাব্যে কথায় কথায় বিরহী-বিরহিনীর দীর্ঘ বিলাপমালা বিরক্তিকর। আলাওল তাহা যথাসম্ভব বাদ দিয়াছেন। "সাত সমুদ্র খণ্ড" ও "স্ত্রী-ভেদবর্নন খন্ড" বাদ দেওয়া কাব্যের পক্ষে ভালোই হইয়াছে। রত্মসেনকে শূল হইতে বাঁচাইবার জন্য জায়সী মহেশ-পার্বতীকে ভাট-ভাটিনীরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। আলাওল এখানে রত্মসেনের একজন অনুচরকে ভাট বানাইয়া কাহিনীকে বাস্তব-অভিমুখি করিয়াছেন। পদ্মাবতীর বাল্যসখী প্রভৃতি ভূমিকাগুলি স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়াও আলাওল কাহিনীর বাস্তবরস পরিবর্ধিত করিয়াছেন। আলাওল বাঙালী কবি। সুতরাং তাঁহার কাব্যে নারীভূমিকাগুলি বাঙালী মেয়ের রূপ নেওয়ায় ভালোই হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গটি ইতোপূর্বে পদ্মাবতীর বিদায় পালায় উল্লেখ করা হইয়াছে।)...

আক্ষরিক অনুবাদে আলাওল অনেক সময় জায়সীকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। যেমনঃ--

মরণেত মুক্তি হেন যার মনে বাসে
শাল দেখি সেই চোর খলখল হাসে।
প্রেমপন্থে চলি যদি অন্ত নাহি পায়
সেই পন্থে ভাবকের মরণ জুয়ায়।
(১ পৃষ্ঠা-৩৪৭, ৩৪৮ ও ৩৫১)।

আলাওল পদাবলী কবিদেরও স্বজাতি। আন্তরিকতার স্পর্শে আলাওলের সব পদ ও গান সত্য সত্যই সমৃদ্ধ। (৩ পৃষ্ঠা -১৫৮)।

আলাওলের ব্রজবুলিঃ-

তুয়া পদ হেরইতি বাতুল যুবতী
কাহিনী-মোহন কটাক্ষে হীন ভেলা।
প্রেম মদে বিভোল, সতত বহয় লোর,
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধবুদ্ধি হরি গেল।।
চন্দন চন্দ্রকিরণ মানে আনল সমান

www.pathagar.com

সৌরভ বিশিখ তবে লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনি অতি পরাভব
মন্মথ- বাণ-আনল পরে জাগে
কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধুক ধুক তুয়া আশ্বাসে।
শ্রীযুত মাগন, রসিক সুজন, আরতি বিহীন
আলাওলে ভাষে। (৩ পৃষ্ঠা-১৫৯)।

আলাওল পদ্মাবতী কাব্যে জায়সীর বর্ণনার সাথে কিছু কিছু নিজস্ব বক্তব্যও যোগ করেছেন। যেগুলো অনুবাদ বা ভাবানুবাদ নয়। যেমনঃ-

পূর্বেত আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেন্ত নিজরূপ করিতে প্রচার।।
নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথম সৃজিলা।
সেই জ্যোতি মূলে ত্রিভূবন নিরমিলা।
সে সকল জ্ঞান কথা কহিতে অপার।
সমুখে পুস্তক কথা আছে মোর ভার।।
সেই দীপ জ্যোতিএ উজ্জ্বল ত্রিভূবন।
হইল নির্মল জগৎ পতেক নাশন।।
ঘোরাকার ছিল পন্থ নর পাপলীন।
পূণ্যের প্রকাশ হেতু হৈল তান দীন।।
তাহাকে পীরিতে প্রভু কাজিলা সংসার
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার।
আঙ্গুল ইঙ্গিতে যার চন্দ্র দুই খন্ড।
ঘনমালা যার শিরে ধরে নব দন্ড।
বনমৃগী যাহারে লগ্নকা আরপিয়া।
বনান্তরে যাই পুনি আইল ফিরিয়া।।
ছায়াহীন কায়া না পরশে মক্ষিকায়।
বাক্যধারী হৈয়া সর্প যার গুণ গায়।
মহিমা কতেক কইব মুঞি মতিহীনে।
যার গুণ কোরানেতে কহিছে নিরঞ্জনে।।
জন্মিয়া যেই জন না লৈল তান নাম।
তাহান হৈব নরকের মাঝে ঠাম।।
পাপ পূণ্য যখনে পুছিব করতার।
আগু হই করিবেন্ত নারকী উদ্ধার।।

www.pathagar.com

জায়সী তাঁর কাব্যে শের শাহের গুণকীর্তণ করেছেন। আলাওল সেস্থলে রোসাঙ্গ এর অধিপতির প্রশংসা করেছেন। আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুরের পরিচয় দিয়েছেন, আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।
(৫ পৃষ্ঠা-১৫০, ১৫১, ১৫২)।

আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আর একটি কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল (সৈফুল মুলুক বদিউজজামাল)। পদ্মাবতী শেষ করার আগেই তিনি এটি রচনা শুরু করেছিলেন।
রাজমন্ত্রী সোলেমান (রাজা থিরি সান্দ থু ধুম্মার (১৬৫২-৬৪) মহাপাত্র) একদিন এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন। তাহাতে মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুস্তাফা (মাগন ও সোলেমানের পীর মাসুম শাহার পুত্র) এবং "আর বহু আলিম রসিক গুণবাণ" নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অনুষ্ঠানে মাগনের অনুরোধে গুরুপুত্র মুস্তাফা সৈফুল মুলুকের গল্পটি বলেন। শুনিয়া মাগন আলাওলকে অনুরোধ করেন, "সকলে না বুঝে এহো ফারসীর ভাব পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব।" অতঃপর আলাওল এটি রচনা শুরু করেন। তিনি বলেন,

যার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য লাঙ্ঘিলে হয় পাপ
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ।
তাহান আদেশ-মাল্য ধরি শির-পাগে
অঙ্গীকার করিল রচিতে পঞ্চরাগে।

এই কাব্যের দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর মাগন ঠাকুরের মত্যু হইল। লেখাও বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর আলাওলের জীবনে দারুণ দুর্বিপাক আসিল। কুচক্রির চক্রান্তে আলাওল সর্বস্বান্ত হইয়া কারাগারে পড়িলেন। মুক্তি পাইবার পরও তাঁহার দুর্ভোগ ঘুচিল না। অবশেষে তিনি "নৃপতির মুখ্যপাত্র" সৈয়দ মুসার নজরে আসিলেন। তখন হইতে তাঁহার সাংসারিক দুঃখ কষ্টের অবসান হইল। তবে তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সৈয়দ মুসা তখন আলওলকে অসমাপ্ত কাব্য সৈফুল মুলুক বদিউজ্জামাল সম্পূর্ণ করার অনুরোধ জানাইলে আলাওল তা এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলেন,

বৃদ্ধকালে গ্রন্থকার্য না হয় উচিত।
রচিনু পুস্তক (আমি) নানা আলাজালা
বৃদ্ধকালে ঈশ্বরভাবেতে রৈলে ভালা।
বিশেষ অস্থানে পড়ি চিন্তাযুক্ত মন
অসার্থক ভিক্ষাবৃত্তি যাহার জীবন।
হেনকালে কষ্টকর্ম আদেশ করহ
বিফলতা আমার মনেতে না ভাবহ।

প্রত্যুত্তরে সৈয়দ মুসা বলেনঃ--

অন্যজন নহ তুমি আলাওল গুণী।
যাহার বচনে লোক পায় উপদেশ

www.pathagar.com

তাহান মৌনতা যুক্ত না হয় বিশেষ। .....
তুমি না রচিলে খন্ডবাক্য রসকথা
এরূপ রচিতে আর কেবা আছে হেথা।
তিন-মতে কাব্য সাঙ্গ করিতে উচিত
প্রথমে মাগন মিষ্ট বচন বিদিত।
দ্বিতীয়ে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে
পড়িলে পুস্তক দুঃখ উপজয় মনে।
তৃতীয়ে আমার প্রেম রাখিতে জুয়ায়
এড়াইতে নারিয়া রচিবা সর্বথায়।

অগত্যা আলাওল রাজি হইলেন। তিনি লিখলেন,

শ্রীযুত মাগন ধীর বিদগ্ধ রায়
তাঁহার আদেশে হীন আলাওল গায়।
শ্রীযুত ছৈয়দ মুছা তার অনুমতি
হীন আলাওলে কহে মধুর ভারতী।

কাব্য সমাপ্তিতে আলাওল লিখেছেন,

রোসাঙ্গের রাজপুত্র শ্রীযুত মাগন
ছয়ফুল-মুলুক গ্রন্থ করালা রচন।
সমাপ্ত না হইতে গ্রন্থ তিনি পরলোক
কতকাল মনেতে আছিল মহাশোক।.......
এহিমতে বহি গেল নবম বৎসর
খন্ডবাক্য পুস্তক রহিল মনোহর।
ছৈয়দ মুছা নামে পুরুষ মহন্ত
অভিন্ন মদন রূপ মহাগুণবন্ত
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসপ্রমাণ
নৃপতি-বিষয়দার সবার কল্যাণ।......
আমি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতি বহুতর
তালিব আলিম বলি করেন্ত আদর। ......
একদিন ডাকি আমা তাহান আলয়
যতন করিয়া বহু কহিল মহাশয়।
পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন
আছিল তোমার শিষ্য মোর বন্ধুজন।
খন্ডবাক্য রহিল পুস্তক মনোহর
সমাপ্ত হইলে রস হয় বহুতর।
আমার গৌরব মান তাহান বচন
শান্তি করি তোষ যত পাঠকের মন।

www.pathagar.com

উপসংহারে কবি বলেনঃ--

যদি মোর কাব্যরসে সুখ লাগে মনে
আর্শীবাদ কর মোরে ফকিরি কারণে।
ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিয়া
পড়িও ফতেহা এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫২ থেকে ৩৫৫)।

সুলেমানের নির্দেশে আলাওল তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ 'তোহফা' রচনা করিয়াছিলেন। বইটি ধর্মগ্রন্থ, ইউসুফ গদা রচিত ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। (৭ পৃষ্ঠা-১১৮)।

আলাওলের পঞ্চম রচনা হইতেছে সপ্ত পয়কর (হপ্ত পয়কর)। নিজামীর ফারসী কাব্য 'হপ্ত পৈকর' আলাওলের উপজীব্য। এটি লেখা হয়েছিল থিরি সান্দ থুধম্মার সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের নির্দেশে। আলাওল বলেছেনঃ-

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল নাহি তাহে বলাবল
হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত......
তাহে নৃপ অনুপাম শ্রীচন্দ্র -থুধর্মা নাম
খলনাশ দুঃখিতের গতি....
যেহ মহারাজ্যেশ্বর অখণ্ড-সম্পদ
তান মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ।....
আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত
অন্নবস্ত্র-দানে আমা পোষেন্ত সতত।...........
আমা প্রতি কৈলা আজ্ঞা হরষিত মনে
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে।
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর
মনোগত প্রকাশিলুম তাহান গোচর।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫৬-৩৫৭)।

আলাওলের ষষ্ঠ এবং শেষ রচনা "সেকান্দর নামা।" এটিও নিজামীর লেখা ফারসী কাব্য 'ইসকান্দরনামা'র অনুবাদ। আলেকসান্দরের বিজয়-অভিযান সম্পর্কে যে সব গল্প ইরানে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই কয়েকটি হইতেছে এই কাব্যের বিষয়। সৈফুল-মুলুক সমাপ্তির দুই বৎসর পরে (১৬৭১) মজলিস নবরাজের নির্দেশে আলাওল এই কাব্য রচনা করেন। মজলিস নবরাজ সম্ভবতঃ আরাকানের কোন আমীর অথবা রাজমন্ত্রী ছিলেন। গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে আলাওল বলেনঃ--

শ্রীযুত মজলিস অতুল মহন্ত
মজলিস পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত।
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ
সাদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ।

www.pathagar.com

অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর
তানদানে সুষম শোধম রাজকর।
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভায়
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতি ভায়।
একদিন পরিপূর্ণ করি মেহমানী
মহা মহা মোছলমান ভুঞ্জাইল-আনি।.......

আহারে ও গীতবাদে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা পরিতুষ্ট হইয়া মজলিসকে ধন্য ধন্য করিয়া বলিতে লাগিলঃ--

আনন্দের স্থল মাত্র তোমার সমীপ
মোছলমানি দীনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ
মসজিদ পুষ্কর্ণী দিয়া কৈলা বহু কাম
স্বদেশে বিদেশে পূণ্য তোমা কীর্তিনাম।
হিন্দুজাতি নানা দুঃখে উপার্জয় মাল
মছজেদ পুষ্কর্ণী দেয় কতেক জাঙ্গাল।
সুজনে বাড়ায় বৃত্তি অনুরূপ পূণ্য
অন্তকালে নাম রহে সেই মহাধন্য।

শুনে মসলিস হেসে বলেন--

মছজিদ পুস্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে
গ্রন্থকথা যথা তথা ভক্তিভাবে কহে।
গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্ত হয় মন
নাম স্মরি মহিমা করয়ে কত জন।

অতঃপর তিনি আলাওলকে বলিলেন "মোর নামে গ্রন্থ রচ কহিনু বিশেষ।" আলাওল বলিলেন,

সেকন্দর-নামা সম গ্রন্থ নাহি আর।
রসভাব-যুক্ত কথা নাহি ততোধিক
আলিম সবার মন অমূল্য মানিক।............
নেজামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ
ভাঙ্গিয়া কহিলে তাতে আছে বহু রস।

মজলিস সন্তোষ প্রকাশ করায় কবি বলেন,

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল
বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল।
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি-
তাহা শুনি মজলিস দয়া হৈল অতি।
ভক্ষ্য বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া

www.pathagar.com

আর নানা বিধি দানে মন সন্তোষিয়া।
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার
ভাঙ্গিয়া বয়াত-ছন্দ রচিতে পয়ার।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯)।

রচনার মধ্যে আলাওল সর্বত্র ভনিতায় মজলিস নবরাজের নাম করিয়াছেন। যেমনঃ-

মজলিস-মণি নবরাজ গুণী যশপূর্ণ ভূমন্ডলে
তাহান আরতি মধুর ভারতী কহে হীন আলওলে।
(১ পৃষ্ঠা-৩৫৯)।

আলাওল আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। (৭ পৃষ্ঠা-৭০)। কিন্তু এই ধারনার কোন সত্যতা আজো প্রমাণিত হয়নি।

হিন্দু পুরাণ কথা আলাওলের ভালোভাবেই জানা ছিল। পদ্মাবতী কাব্যে রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীর উল্লেখ অনেকবার আছে। তখনকার বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাও তাঁহার অপরিচিত ছিলনা। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব পদ্মাবতীর গানগুলিতে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। গোরক্ষনাথের এবং গোপীচন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ ও পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীরও আভাষ আছে। সংস্কৃত অলঙ্কার ও সঙ্গীত শাস্ত্রে আলাওলের বেশ দখল ছিল। সর্বোপরি আলাওল ছিলেন সুফী-সাধক। তাই তাঁহার এই রোমান্টিক কাব্যটিতে প্রচলিত কাব্যকলার সঙ্গে আধ্যাত্ম-অনুভূতির সংযোগ হইয়া অভিনব রস সৃষ্টি হইয়াছে। কবি বলিয়াছেনঃ-

প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক
অন্তরে প্রবল পূণ্য প্রভুর আশক।

....
হীন আলাওল বাণী সুরস পয়ার খানি
পদে পদে অমৃতসিঞ্চণ।
(২ পৃষ্ঠা-৯৯-১০০)।

রচনা ভঙ্গির স্বাচ্ছন্দ ও সরসতা বিচার করিলে এবং সপ্তদশ শতাব্দের বাংলা কাব্যের অবস্থা স্মরণ করিলে আলাওলের এই উক্তি (উপরোক্ত উক্তি) আতিশয্যপূর্ণ ও অহঙ্কারদুষ্ট বোধ হইবে না। (১ পৃষ্ঠা-৩৫২)। তাই 'কবির কথায় আমরাও প্রতিধ্বনি করিতে পারিঃ-

তাঁহার পিরীতি রসে চন্দনতুলন যশে
বশ হৈল গুণীগণমন।
(২ পৃষ্ঠা-১০০)।

আলাওলের মত পণ্ডিত, বিদগ্ধ ও উচ্চবর্গের মুসলমান কবি বাঙলা সাহিত্যকে আপনার বলে গ্রহণ করে আপনার কীর্তির দ্বারা বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের মিলন-ক্ষেত্র রচনার সূচনা করলেন। (৩ পৃষ্ঠা-৩৬০)। আলাওলের রচনায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত অল্প। জায়সীর মত আলাওলও দেশী শব্দ পাইলে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। (১ পৃষ্ঠা-৩৫২)।

www.pathagar.com

মানবীয় প্রণয়-কাহিনী ও আধ্যাত্ম প্রেম-সাধনা দুই প্রেরণাকেই সাহিত্যে আলাওল সম্মিলিত করেছেন। বাঙালী ঐতিহ্যে নিষিক্ত ব্রজলীলার যেমন তিনি পদ রচনা করেছেন, তেমনি সংস্কৃত-জগতের কথাবস্তুর (Matter of sanskrit) সঙ্গে ফারসী আরবীর কথা-বস্তু, এমন কি তোহ্ফার মত ধর্মনীতিকেও (Matter of Perso-Arabic world) স্বচ্ছন্দে এই পৌরানিক-প্রতিরোধপুষ্ট বাঙলা ভাষায় সুগ্রন্থিত করে তুলেছেন। বাংলা কবিতার পরিমন্ডলকে তিনি এই সূত্রে প্রসারিত করে দিয়েছেন; অথচ সেই মুসলমানী জগতে বিচরণ করেও তাঁর বাণী কিছুমাত্র আত্মভ্রষ্ট হয়নি,...তাঁর কাব্যে বাঙলা কবিতা নব্য-ক্লাসিকতায় সমৃদ্ধ, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণে পরিচ্ছন্ন।....পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ ও ধর্ম-সংস্কারমুক্ত আধ্যাত্মিকতায় আলাওল যেমন সভ্য মানুষের কবি, এমন আর মধ্য যুগের কোনো বাঙালী কবিকে মনে হয় না।.........(তাই) মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যে আলাওল অদ্বিতীয় স্রষ্টা না হলেও নব চেতনার প্রভাত-তারকা, যুগান্তের ইঙ্গিত। শেষ কথা এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, আলাওল বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপয়িতা। (৩ পৃষ্ঠা ১৫৯)।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আরাকান রাজ নর পদিগি্যর মন্ত্রী ও রাজার মৃত্যুর পর কুমারী রাজকন্যা যশস্বিনীর অবিভাবক ও প্রধান অমাত্য (প্রধানমন্ত্রী) কোরেশী মাগন ঠাকুর নিজেও কবি ছিলেন। তিনি রচনা করেন "চন্দ্রাবতী" কাব্য। এছাড়া দৌলত কাজী ও মাগন ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে শমসের আলী রোসাঙ্গে বসে লিখেছেন 'রিজোয়ান শাহ' কাব্য, আরাকানের আর এক অধিবাসী সুজাকাজী নামে পরিচিত আব্দুল করিম লিখেছেন রোসাঙ্গ পাঞ্চালী। কিন্তু কাজী দৌলত ও আলাওলের প্রতিভাদীপ্ত কাব্য প্রভায় এসব কবির কাব্য নিষ্প্রভ রয়ে যায়।

বস্তুতঃ একথা ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিতে প্রমানিত সত্য যে, বাঙলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাঙলা ভাষার স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ তো দূরের কথা, স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে পরিপুর্ণ রূপ লাভও করতে পারেনি। রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের আগে স্বতন্ত্র বাংলা ভাষায় সাহিত্যও রচিত হয়নি। (চর্যাপদ এর ভাষা খাঁটি বাংলা নয়)। হোসেন শাহী আমলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হলেও তখনো এই সাহিত্য পুরাণ কাহিনী তথা সংস্কৃত সাহিত্যের, সংস্কৃত জগতের কথা বস্তুর "(Matter of sanskrit world), রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কাহিনী থেকে মুক্ত হতে পারেনি। হোসেন শাহী আমলের সামন্ত শাসক পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্টপোষকতায় পরাগলপুরে যে সাহিত্য রচনার সূচনা সেই সাহিত্যের ভিত্তিও মহাভারত হলেও সেই যুগেই হোসেন শাহী সুলতান মাহমুদ শাহের আমলে শাহ মোহাম্মদ সগীর পারস্যে প্রচলিত এক আরব উপাখ্যান, প্রণয় কাহিনী, ফেরদৌসী, জামী প্রমুখ বিরচিত ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী ভিত্তিতে বাঙলায় রচনা করেন ইউসুফ-জোলেখা কাব্য। পরাগলপুরের প্রভাবেই অনতিদূরের জাফরাবাদে বসে দৌলত উজীর বাহরাম খান রচনা করেন আরব উপাখ্যান বলে কথিত, (যে কিংবদন্তী আরবে চালু নেই) এক কল্পিত উপাখ্যান লায়লী-মজনু প্রণয়

www.pathagar.com

কথা। রচনা করেন ধর্মীয় কাহিনী ভিত্তিক 'ইমাম বিজয়'। অতঃপর পরাগলপুরের আর এক অমর সাহিত্য কর্মী সৈয়দ সুলতান বাংলা সাহিত্য প্রথম নবী বংশ, শবে মেরাজ প্রভৃতি রচনা করে এই সাহিত্যে মুসলমান শাস্ত্রমতে সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীদের আবির্ভাব প্রভৃতি বর্ণনাা করেন। সৈয়দ সুলতান ছিলেন একজন সুফী-সাধক। (অনেকের মতে যোগী-সাধকও)। তাই তিনি ছিলেন অন্য ধর্মের প্রতি উদার। এজন্যে তিনি তাঁর সাহিত্যে সুফী ও যোগী সাধনার সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। সৈয়দ সুলতানই প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক যিনি সংস্কৃত জগতের কথা বস্তুর সাথে আরবী, ফারসী কথা বস্তুর সমন্বয় সাধন করেন। এর পর মোহাম্মদ খান মুক্তাল হোসেন, কারবালা কাহিনী রচনা করে আরবী-ফারসী কথা বস্তুকে বাঙলা সাহিত্যে অবিচ্ছেদ্য করে তুলে আরো একধাপ এগিয়ে যান। বস্তুতঃ পরাগলপুর ভিত্তিক রচিত সাহিত্যেই প্রথম সংস্কৃত জগতের কথা বস্তুর সাথে হিন্দী, ফারসী, আরবী কথা বস্তু ও ধর্মনীতি সংযুক্ত করা হয়। ফলে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে পুরাণের খোলসমুক্ত বহু মাত্রিক সাহিত্য। নবজাত এই সাহিত্য আরাকানে আরো সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের, সমৃদ্ধ ও সপ্রাণ বাংলা সাহিত্যের ভিত রচনা করে।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ কুসুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ), ইষ্টার্ন পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।

২। ডঃ সুকুমার সেন- বাঙালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩(সপ্তম সংস্করণ)।

৩। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮০।

৪। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ-১-২।

৫। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত পদ্মাবতী, ষ্টুডেন্টস ওয়েজ, ঢাকা।

৬। আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য।

৭। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-৩৩।

৮। আবদুল হক চৌধুরী-চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৮ খৃঃ।

৯। ডঃ আহমদ শরীফ-আলাউল বিরচিত সিকান্দর নামা।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতজ মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে, পাঠান যোদ্ধা শের শাহের কাছে হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ পরাজিত ও নিহত হলে গৌড়ে (চট্টগ্রাম ছাড়া) পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে অপর এক ভাগ্যান্বেষী মুবারিজ খান শের শাহেব পৌত্র ফিরোজ শাহকে হত্যা করে মুহাম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু মহাম্মদ খান শুর আবার গৌড়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে তিনি নিহত হলে গৌড়ে দিল্লীর স্বল্পকাল স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহাম্মদ খান শুরের পুত্র খিজির খান গৌড় পুনঃ দখল করেন। তিনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে আদিল শাহকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেনে। কিন্তু ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে করবানী বংশ বাংলার (গৌড়ের) সিংহাসন দখল করে। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে দাউদ খান কররানী মোগলদের হাতে পরাজিত হলে বাংলা (গৌড়) মোগল সাম্রাজ্য ভূক্ত (চট্টগ্রাম ছাড়া) হয়। (কারণ, চট্টগ্রাম এই সময়ে আরাকান রাজের দখলে চলে যায় এবং চট্টগ্রামের দখল নিয়ে ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ চলে)। বস্তুতঃ ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। ফলে সাহিত্য চর্চায় শাসকদের এবং এমনকি সামন্ত শাসকদের যে পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায়, পশ্চিম বঙ্গে (আকবরের সময়েও পূর্ব বাংলা মোগল শাসনের বাইরে ছিল) মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'প্রাদেশিক শাসনকর্তা-সেনাপতিরা বাদশাহের ফরমান লইয়া আসিতেন এবং কাজের মেয়াদ ফুরাইলে অথবা তাহার আগে ডাক পড়িলে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেন। বাঙ্গালাদেশের বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল শুধু সময়মত অথবা হুকুম মাফিক খাজনা পাঠাইবার। তাহারা বাঙ্গালা ভাষী ছিলেন না এবং বাঙ্গালা সংস্কৃতির প্রতি তাঁহাদের কোন আকর্ষণ ছিলনা। (১ পৃষ্ঠা-১)। কিন্তু আগের ইতিহাস আমাদের সামনে এই সত্য স্পষ্ট করে তোলে যে, ইতোপূর্বেকার (পাঠান-মোগল পূর্বেকার) মুসলিম যোদ্ধা ও বিজয়ীরা (অর্থাৎ বাংলা দখলকারীরা) বাংলা দখল করে লুন্ঠন করেননি, বরং তাঁরা দখলের পর বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, বাঙালীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে নিজ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা, বাংগালী হয়ে গেছেন। এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ইলিয়াস শাহী শাসক

www.pathagar.com

রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়েছিল, হোসেন শাহী বংশের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হয়। হোসেন শাহ চৈতন্য ভক্তদের সাহিত্য সৃষ্টিতে শুধু পৃষ্ঠপোষকতা নয়, সহযোগিতা করায় এক দিকে শ্রীচৈতন্যের ধর্মসংস্কার আন্দোলন গতিশীলতা লাভ করে এবং অন্যদিকে সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে গণমানুষের সাহিত্য। সাহিত্য চর্চায় ধর্ম-বর্ণের বাধা বিদূরিত হয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র তথা সর্ববর্ণের লোক সাহিত্য রচনা ও পাঠের উদার সুযোগ লাভ করে। ফলে হোসেন শাহী আমলেই বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, সমৃদ্ধ সাহিত্য হয়ে ওঠে। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার দখল নিয়ে মোগল পাঠান যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত থাকলেও ইতোপূর্বে যে সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকা সত্বেও তা, ছিল অব্যাহত। কারণ, "বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নিজের পথ ধরিয়াছে। রাজার বা ধনীর সহায়তা এখন অনাবশ্যক। (২ পৃষ্ঠা-৬৬)। বস্তুতঃ বারবাক শাহের আমলে যে সাহিত্য চর্চার সূচনা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতা সত্ত্বেও সেই সাহিত্য চর্চা ছিল অব্যাহত সমগ্র মধ্যযুগে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য মানে পুথিপত্র। এই সাহিত্যের রয়েছে দুটি রূপ। একটি হচ্ছে পদ বা খন্ডিত কবিতা বা লিরিক। এটি গীতি কবিতা, তালমান দিয়ে যা গাওয়া হয়। অন্যটি হচ্ছে বিজয়কাব্য বা মঙ্গলকাব্য, যাকে বলা হয় ন্যারেটিভ বা আখ্যাণমুলক কবিতা। এটি সূরকরে গাইবার বা শোনাবার মতো কবিতা। সে যুগে একজন প্রধান গায়েন অন্ততঃ একজন দোহার নিয়ে এই পাঁচালী গান পরিবেশন করতো। এর সাথে থাকতো বাজনা, সময় সময় নৃত্যও থাকতো। "মনে রাখা প্রয়োজন, সেদিন সব কবিতাই সূর করে পড়া হত। এখনো হিন্দিতে তার চল রয়েছে।"(৩ পৃষ্ঠা-২৬-২৭)।

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি, অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবলোক, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় Matter of Sanskrit ছিল বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি। কিন্তু বাঙালী সাহিত্যিকরা, বিশেষ করে মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে বাংলায় প্রচলিত রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতিকেও অর্থাৎ মেটার অফ বেঙ্গল কেও কাব্যে টেনে আনেন। ফলে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতজ সাহিত্য থেকে আলাদা রূপ লাভে সক্ষম হয়।

মধ্যযুগে সাহিত্য রচনা হতো সামাজিক প্রয়োজনে, কোন বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। ধর্ম ছিল সেদিনের প্রধান পরিচয়। সেদিনের সাহিত্যে মানুষের ধ্যাণ-ধারণা, আনন্দ বেদনা ইত্যাদি ধর্মের নানা কথা ও কাহিনীর আকার ও আবরণে প্রকাশিত হয়েছে।

ষোড়শ শতক থেকে...এক দেশে বসবাস করে, একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করে, একই ভাষা বলে, একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যোগদান করে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান তো নিশ্চয়ই, উচ্চ বর্গের মুসলমান ও উচ্চবর্গের হিন্দুও

www.pathagar.com

বাঙালী বনে গিয়েছিল। বলতে গেলে বাঙালীর একটা রাষ্ট্র, জাতি বা নেশন হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা তখনি দেখা দিয়েছিল। তখন থেকে বাংলা সাহিত্য হচ্ছে অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর সমবেত সৃষ্টি.........। (৩ পৃষ্ঠা-৪১/৪২)।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মানে পুথিপত্র। কিন্তু একথা অবশ্যই সত্য যে, "পুরাতন পুথি মাত্রই সাহিত্য নয়।" (৩ নিবেদন পৃষ্ঠা-৭)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একই বিষয়ে একাধিক লেখকের বহুসংখ্যক রচনা রয়েছে। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের ভূমিকা, বিশেষ করে মুসলিম লেখকেরাই যে সত্যিকার অর্থে মধ্যযুগের সাহিত্যের স্থপতি, তা বুঝতে হলে সারা বাংলোয় যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্য যাঁদের লেখা উৎকৃষ্ট এবং বহুজন গঠিত তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ৫ম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে চট্টগ্রাম ও আরাকানে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কেও। এখানে এগুলো বাদে বাংলার অন্যান্য স্থানে, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে যে সব হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন ষষ্ঠ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত (১৭৬০ খৃষ্টাব্দ) তাঁদের সাহিত্যকর্ম আলোচনা অপরিহার্য। কারণ "রোমান্টিক কাব্য কাহিনীর ধারা গৌড় হইতে সিলেট-কামতা হইয়া চাটিগাঁ-আরাকানে পৌছায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে। সেখান হইতে যায় উত্তর বঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দে। তাহার পর আসে দক্ষিণরাঢ়ে। অবশেষে ঢাকায়, ফরিদপুরে ও কলিকাতায়-ঊনবিংশ শতাব্দে। (১ পৃষ্ঠা ৫৫৯)। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে মহাভারত ও রামায়ণ।

(ক) মহাভারত

সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হচ্ছে কাশিরাম দাসের মহাভারত, যা কাশীদাসী মহাভারত নামে পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরে কাশীরাম সমধিক প্রসিদ্ধ। (২ পৃষ্ঠা-৭৪)। কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনা কাল নিয়ে বিতর্ক ছিল। পন্ডিতগণ নানা বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এটি ১৬০২ থেকে ১৬১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছে। কাশীদাস কৃত্তিবাসের মতোই একচ্ছত্র কবি। তাঁর পরিচয় সুবিদিত। তাঁর কাব্যেও তা রয়েছে। .....জাতিতে কায়স্থ, সাধনায় কবি পরিবার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', কনিষ্ঠ গদাধর জগন্নাথমঙ্গল বা জগৎমঙ্গলের কবি, আর কাশীদাস 'মহাভারতকার।..... (৩ পৃষ্ঠা-১৩৭)। শ্রীকৃষ্ণবিলাস-ভাগবত অবলম্বনে লেখা বর্ণনামূলক কৃষ্ণলীলা কাব্য। কাশীরামদাসের অপর গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ-ভক্তিভাবপ্রদীপ। (২ পৃষ্ঠা-৭৫)।

কাশীরাম সম্পূর্ণ মহাভারত-কাহিনী লিখেন নাই অথবা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। কতদূর অবধি কাশীরামদাসের লেখা সে বিষয়ে নানারকম উক্তি মিলিতেছে। আদি-পর্ব সবচেয়ে বিস্তৃত রচনা এবং শুধু এই পর্বের শেষে কাশীরামের আত্মপরিচয় আছে।........

www.pathagar.com

নন্দরাম বলিতেছেন যে, কাশীরাম তাঁহার খুড়া। বিরাট-পর্ব পর্যন্ত লিখিবার পরে খুড়ামহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর আগে.....তিনি নন্দরামকে ভারত-পাঁচালী সম্পূর্ণ কবিরার অনুরোধ করিয়াছিলেন। নন্দরাম লিখিয়াছেনঃ-

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পান্ডবের কথা।
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।
ত্রিপথগা ✳ যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পান্ডব-কথা পরম সাদরে।
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেইজন
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ।
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল
তাঁহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল। ....
কাশীদাস কহে যেই অমৃতসমান।
কর্ণপথে সাধু নর সদা কর পান।
এতবধি বনপর্ব কাশীদাস কৈল
অবধান করি সবে একান্তে শুনিল।
না হইতে বনপর্ব-কথা সমাধান
কাশীদাস করিলেন স্বর্গেতে প্রয়াণ।
শেখরতনয় জিত বিচারিয়া মনে
বনপর্ব অবশেষ করিল রচনে।
সুন সুন সাধু লোক হইয়া সাবধান
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান।
(১ পৃষ্ঠা-১১৭, ১১৮)।
✳ (গঙ্গাতীর, গঙ্গাসাগর, ত্রিবেনী বা প্রয়াগ।)

নন্দরামের পিতার নাম নারায়ণ। নন্দরাম বোধহয় কাশীরামের জ্ঞাতিভ্রাতার পুত্র। (২ পৃষ্ঠা-৭৫)। ভনিতায় নন্দরাম লিখিয়াছেন,

নারায়ণ-নন্দন রচিল বড় আশে, জন্মে জন্মে দয়া প্রভু না ছাড়িহ দাসে।

নারায়ণ-নন্দন সেবিয়া রাধাশ্যাম , পান্ডববিজয় বিরচিল নন্দরাম। (১ পৃষ্ঠা ১১৮)।

অপর একজন ক্ষেমানন্দ দাস-যিনি নন্দরামের পুত্র কিংবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি, ভনিতায় বলেছেন,

'নন্দরামদাস ভাষে

www.pathagar.com

রক্ষ ক্ষোমানন্দ দাসে
কৃপাকর দেব ভগবান।'

অপর এক লেখক সম্ভবত জিতরাম

কাশীরামের বন (?) পর্বের কলেবর বাড়াইয়া ছিলেন। ইনি বলিয়াছেন যে কাশীরাম আদি সভা বিরাট এই তিনপর্ব শেষ করিয়া বনপর্ব লিখিতে লিখিতে কালপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন-একথা তিনি লোক মুখে শুনিয়াছিলেন। এই লেখক বলেন,

ধন্য ছিল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস
চারিপর্ব মহাভারত করিল প্রকাশ।
আদ্য সভা বিরাটের রচিল পাঁচালি
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি।
পূর্বে তিঁহো আরম্ভ করিলা এই পুথি
কালবশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি।
অগস্ত্য উপাখ্যান করি হৈল কাল প্রাপ্ত
বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত।
আরম্ভ অবধি পড়ি দুঃখ লাগে মনে
চিরদিন চিন্তা ছিল তাহার কারণে।
তেকারণে প্রসঙ্গ বনের যত শেষ
পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ।
কাশীদাস বিচার করিয়াছিল পোথা
আমি মাত্র লোক মুখে শুনি সেই কথা।
(১পৃষ্ঠা-১১৮-১১৯)।
অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত,
বিরচিল তনয় শিখর সুত জিত।

অপর একজন শিবরাম ঘোষ উদ্যোগ হইতে ছয়পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। বাকি আটপর্বের জন্য তিনি পুথি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

ভারত-পঙ্কজ পর্ব শ্রেষ্ঠ আরণ্যক
আদি সভা বিরাট বন করিল লিখক।
এই চারি পর্ব পুস্তক কাশীদাসি
উদ্যোগ আদি ছয় পর্ব শিবরাম-ঘোষি।
ঐষীক আদি আট পর্ব চাহিয়া বেড়াই
তাহার নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই।
(১ পৃষ্ঠা-১১৯)।

কাশীরাম সংহিতার বহু পুথিতে ও অনেক ছাপা সংস্করণে গোড়ার কয় পর্ব বাদে মাঝে মঝে "কাশীর নন্দন" ভনিতা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে কাশীরামের পুত্র

www.pathagar.com

বড় হইয়া পিতার রচনাকে সমাপ্তির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ধারণা সত্য নয়। যেমন রমাকান্ত দাস (বসু) নিজেকে কাশীনন্দন বলেছেন। কারণ তিনিও আসলে কাশীরাম বসুর (কাশীরাম দাস নহেন)পুত্র। এই বসুপুত্র লিখেছেন--

শ্লোকছন্দে হেতু মুর্খ জ্ঞান পরকাশ
তেঞিঃ ভাষা রচে বসু রমাকান্তদাস।

....

মুর্খের বিধান পোথা সর্বগুণযুত
তেকারণে ভাষাতে রচিলা বসুসূত।

....

মুর্খের বিধান পোথা সর্বগুণযুত
তেকারণে ভাষাতে রচিল কাশী-সুত।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশী-সূত ভনে সদা শুনে সাধু নর।
শ্লোকচ্ছন্দে বুঝিতে না পারে সর্বজন
তেকারণে ভাষা রচে কাশীর নন্দন।
(১ পৃষ্ঠা-১১৯-২০)।

কাশীরাম যে তিন চার পর্বের বেশী লিখেন নাই সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি উনবিংশ শতাব্দের মধ্য ভাগেও অশ্রুত ছিলন।। কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গদ্য অনুবাদের উপসংহারে আছে-

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ।
(১ পৃষ্ঠা-১১৮)।

মহাভারতের আংশিক ও সম্পুর্ণ রচনা নিয়ে বাঙলায় মহাভারত ৩০ খানার মতো পাওয়া যায়।...... কাশীদাসী মহাভারতে আমরা একাধিক কবির লেখা পাই। বাঙালীর এই ভারত-পাঁচালীর স্রোতেও এসে মিশেছে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন কবির কাব্য প্রবাহ।...পূর্ব বঙ্গের রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন, ষষ্টিবর প্রমুখ কবিদের লেখা মিশে গিয়েছে সে অঞ্চলের সঞ্জয়ের মহাভারতে। (৩ পৃষ্ঠা-১৩৭/১৩৮)।

কাশীরাম দাসী মহাভারত এক সময় বহুল পঠিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছিল। এটা শুধুমাত্র শ্রীরামপুর মিশন-প্রেসে ১৮০৩ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ছাপা হওয়ার কারণে নয়, কাশীরামের কবিত্ব ও পণ্ডিত্য গুণেও। কাশীরাম দাসের রচনায় স্নিগ্ধতা ও বিশুদ্ধতা আছে। যেমন-

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
(৩ পৃষ্ঠা-১৩৮)।

www.pathagar.com

কাশীদাসী মহাভারতের সমাদর দেখিয়া বটতলার প্রকাশকেরা বইটিকে সস্তায় ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে থাকেন।....সংবাদ ভাস্কর সম্পাদক গৌরিশংকর ভট্টাচার্য ১২৬২ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তিনি ভনিতায় নিজের নাম জুড়ে দিয়ে বলেন,

শ্রীগৌরিশঙ্কর কহে শুন সাধুগণ
বহু কষ্টে করিলাম স্বহস্তে শোধন।
বারশ বাষট্টি বর্ষ বৈশাখ প্রবেশ
কারাগারে করিয়াছি আদিপর্ব শেষ।
সুধানিধি ভারতে করিয়া চিত্ত যোগ
অমৃত তরঙ্গে ভাসি তুচ্ছ কারা-ভোগ।

....

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত
এতদূরে বিরাট-পর্ব হইল সমাপিত।
শ্রীগৌরিশঙ্কর বলে শুন কাশীদাস
এইবারে কুরুদের ঘটে সর্বনাশ।
(১ পৃষ্ঠা-১২২-১২৩)।

বস্তুতঃ কাশীরাম দাসের আসল রচনা কোনটি তা বোঝা এখন প্রায় দুস্কর। এখন কাশীদাসের রচনার কিছু অংশ উধৃত করা হচ্ছে। কাশীদাস নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেনঃ-

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ।।
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে।।
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ।।
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা।।
নীচ গৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।

www.pathagar.com

অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট।।
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এত দূরে সাঙ্গ হ'ল স্বর্গ আরোহণ।।
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া।
পাইবে পরম সুখ শুন মন দিয়া।।
(৪ পৃষ্ঠা-১০৯৩)।

আদিপর্বে গ্রন্থ সূচনায় বলেছেনঃ--

সর্ব্বশাস্ত্র-বীজ হরিনাম দু-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি তাহা দেবে অগোচর।।
প্রণমহ পুস্তক ভারত-নাম ধর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর।।
পরাশর-সুত-মুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য-দুর্লভ।।
গীত অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশর রচিত তাহে বিবিধ আখ্যান।।
তরিতে সদ্ভক্তি সেই প্রচন্ড তপনে।
ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে।।
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ভ্রমর।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরন্তর।।
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় ত বিনাশ।।
ষষ্টি লক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে দিল।।
সুরলোকে পড়িল নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ।।
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পরম যতনে।
অসিত-দেবল-মুখে পিতৃলোক শুনে।।
শুকদেব-মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ।
লক্ষ শ্লোক প্রচারিল তথা মর্ত্ত্যপুরে।
সংসার-নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে।।
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে।।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত সহিত মুনি তুলেতে তুলিল।।

www.pathagar.com

ভারেতে অধিক তেঁই হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত।।
সুরাসুর নাগলোক এ তিন ভূবনে।।
সংসারের মধ্যে যত হৈল পুণ্যজনে।।
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
যাহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর।।
সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে হয় প্রধান গণন।
দেবগণমধ্যে যথা দেব নারায়ণ।।
নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ-কথা ভারত-ভিতর।।
অনেক কঠোর তপে ব্যাস-মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত-কাহিনী।।
শ্লোকচ্ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাস।
গীতচ্ছন্দে কহে তাহা কবি কাশীদাস।
(৪ পৃষ্ঠা-৩)।

বন পর্বে ইন্দ্রসভায় উর্বশী প্রভৃতির নৃত্যগীত প্রসঙ্গে বলেছেনঃ-

হেনকালে শতক্রতু, অর্জুনের প্রীতি হেতু,
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।
বিশ্বাবসু হাহা হু হু ইত্যাদি গন্ধর্ধ বহু,
চিত্র সেন তুম্বুরু গায়ন।।
নানা ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর সুস্বর গায়,
নৃত্য করে যতেক অপ্সর।
উর্বশী ঘৃতাতী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভাবরী,
সহজন্যা মধুর সুস্বর।।
অলম্বুষা ধন্যা অম্বা, গোপালী কদম্ব রম্ভা,
বিপ্রচিতি সুধা সুধাপ্রভা।
চিত্রসেনা চিত্র রেখা, অপ্সরী মৃদঙ্গমুখা,
বদ্বুদা রোহিনী সুরলোভা।।
নৃত্য-গীতে সপ্রতিভা, পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা,
অঙ্গ ঢাকি অম্লান অম্বরে।
ঈষৎ নয়ন কোণে, নিরীখয়ে যেই জনে,
অন্য থাক মুনি-মন হরে।।
জঘন কুঞ্জরকর, ক্ষীণ মাজা মৃগবর,
নিতম্ব ভূধর পয়োধর।

www.pathagar.com

বিনাশে মুনির ধ্যান, হিতাহিত আদিজ্ঞান,
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর।।
নৃত্যগীতবাদ্যে সবে, মোহিত যতেক দেবে,
আনন্দিত হল সুরগণ।
অর্জুনের ম্লান মুখ ভাবিয়া পূর্বের দুখ,
ভ্রাতৃ মাতৃ করিয়া স্মরণ।।
ক্ষণেক নয়ন কোনে, চাহিলা উর্বশীপাণে,
জানিলেন সহস্রলোচন।।
নৃত্যগীত নিবারিল, সবারে বিদায় দিল,
নিজধামে গেল দেবগণ।।
দিব্য সুধারস কথা, অরণ্য পর্বের গাথা,
শুনিলে অধর্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সূত সুজনের প্রতি যুত
বিরচিল কাশীরাম দাস।।
(৪ পৃষ্ঠা-৩৬৯)।

অর্জুনের প্রতি উর্বশীর অভিশাপ বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ--

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর।
পার্থেরে রহিতে স্থূল দেহ মনোহর।।
উর্বশীরে পাঠাইবে অর্জুনের স্থানে।
রতি-ক্রীড়া আদি যত করাহ অর্জুনে।।
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল।।
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্যা হেতু নিয়েছিল বহুজন।।
তবে চিত্রসেন গেল উর্বশীর স্থান।
অর্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান।।
রূপে গুণে বুদ্ধিবলে কর্মে তপেজপে।
অর্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে।।
তার তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্বশী তাহার সেবা কর।।
উর্বশী বলেন আমি ভালমত জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি।।
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয়।।
এত বলি স্নান করি পরে দিব্যবাস।

www.pathagar.com

পারিজাত মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ।।
চন্দন কস্তুরি অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ।।
সহজ রূপেতে মুনিজন-মন মোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে।।
সুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অর্ধনিশি।
অর্জুনের আলয়ে চলিলেক উর্বশী।।
দ্বারপাল জানাইল অর্জুন-গোচরে।
উর্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে।।
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে উর্বশী আইল কি কারণ।।
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার।
কি করিব আজ্ঞা তুমি করহ আমায়।
এতরাত্রে কি কারণে আসিলে এথায়।।
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্বশী চাহিল।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল।।
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র অনুমতি।
একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি।।
ইন্দের আজ্ঞায় আমি আইনু এথায়।
আজি নিশিক্রীড়া কর লইয়া আমায়।।
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শণ।।
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল সাধিবারে কার্য্য প্রীতিকর।।
শুনিয়া অর্জুন বীর কর্নে হাত দিয়া।
হেঁটমাথে ম্লানমুখে কহে শিহরিয়া।
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্টকথা কহ ঠাকুরাণী।।
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমান।
উর্বশী আমার পক্ষে জননী সমান।
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায়।
যে হেতু চাহিনু আমি কহিব তোমায়।।
পূর্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুতছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল।।

www.pathagar.com

পুরু আদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হৈল তুমি আছ নবীন বয়সে।।
এ হেতু বিস্ময় বড় মানিলাম মনে।
পুনঃপুন চাহিলাম তাহারি কারণে।।
পূর্বপিতামহী তুমি মোর গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ।।
উর্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার।
স্ব-ইচ্ছায় যথাতথা করি হে বিহার।।
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর দ্বন্দ্ব।।
যতসব মহারাজ হল পুরু বংশে।
তপ-পূন্য-ফলে সবে স্বর্গেতে আইসে।।
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
এসব বচন কেহ না করে বিচার।।
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি খন্ডাহ বিস্ময়।।
অর্জুন কহেন তুমি মোর ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পূজ্য গুরু কুলের জননী।।
যথাকুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহা সবা হতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি।।
নিজগৃহে যাহ মাতা করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান মোরে কর অবিশ্রাম।।
শুনি উর্বশীর হৃদে হল মহাতাপ।
ক্রোধ মুখে অর্জুনের প্রতি দিল শাপ।।
তব পিতৃ-আদেশেতে আসি তব গৃহে।
নিস্ফলা করিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে।।
না করিলে কামপূর্ণ পুরুষের কাজ।
এই দোষে নপুংসক হবে স্ত্রীর মাঝ।।
নর্তক রূপেতে রবে মোর এই শাপ।
এতবলি নিজালয়ে গেল করি তাপ।।
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে সে রজনী বঞ্চে উজ্জাগর।।
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করজোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি।।
অর্জুন কহিলেন নিশার বিবরণ।

www.pathagar.com

শুনিয়া বিস্ময়ে কহে সহস্র লোচন।।
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হতে কুরু বংশ পবিত্র হইল।
যোগীন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিলে সবারে।
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে।।
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জুন।
শাপ নহে তব পক্ষে হল বহুগুণ।।
অবশ্য অজ্ঞাত একবছর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্তক হইবে।
বৎসরেক পূর্ণ হলে শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জুন অতি আনন্দ হৃদয়।।
অর্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তার চিত্ত পাপে নাহি যায়।।
পূর্বার্জিত যত পাপ ভস্ম হয়ে যায়।।
অরণ্যক-পর্ব গীত কাশীদাস গায়।।
(৪ পৃষ্ঠা-৩৬৯ থেকে ৩৭১)।

(খ) রামায়ণ

বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন এবং কৃত্তিবাসই বাংলা ভাষায় প্রথম 'রামায়ণ' রচয়িতা, একথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণের আদি কবি। (কৃত্তিবাসের রচনার উধৃতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে)।

রামায়ণ গীতি কবিতা, এটি রাম চরিত; এটি গাওয়া হত। সপ্তদশ শতাব্দের রামচরিত-রচয়িতারা প্রায় সবাই নিজেরা গায়ক ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন কবি অদ্ভুত আচার্য-উপাধি ভনিতায় নামের স্থলে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর এই রামকথা-কবি নিত্যানন্দ আচার্য পাবনার সাঁতালের রাজা (সামন্ত) রামকৃষ্ণের সভা কবি ছিলেন। (৫ পৃষ্ঠা-১৭৭)। নিজে অদ্ভুত আচার্য নাম নিয়ে ছিলেন বলে তাঁর কাব্য অদ্ভুত রামায়ণ নামেও পরিচিত। নিত্যানন্দ বলেছেন,

সপ্ত বৎসরের শিশু অক্ষর নাহি চিনে
খেলাইয়া ফেরে সব রাখালের সনে।
মাঘ মাসের ভীম-একাদশী তিথি
স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল রঘুপতি।...

পাঠান্তর-

মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি
ব্রাহ্মণ- বেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি।

www.pathagar.com

রাম বোলে নিত্যানন্দ কিছু গাও শুনি
নিত্যানন্দ বোলে কিছু গাহিতে না জানি।

....

পাঠান্তর-

ব্রাহ্মণ বোলেন শিশু শুন মোর বাণী
কিছু গান কর আমি কান পাতি শুনি।
বটু বোলেন শুন গোসাঞি তুমি মোর বাণী
রাখালের গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি।

....

টোন হৈতে অস্ত্র খসাইয়া নৈল হাতে
এক মহামন্ত্র তার লিখিল জিহবাতে।
হৃদয়েতে সেই মন্ত্র করিল স্মরণ
পূর্ব অনুক্রমে রচিল রামায়ণ।

নিত্যানন্দের তিন পুত্র, জয়ানন্দ, বিজয়ানন্দ ও শিবানন্দও রামায়ণ গান করিতেন। (১ পৃষ্ঠা-১৩১, ৩২, ৩৩)।

অদ্ভুত আচার্য উপাধি বা নামান্তর আরও কোন কোন রামায়ণ লেখক ও গায়ক গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন রামশঙ্কর দত্ত (ঐ পৃষ্ঠা-১৩৩)। ভনিতায় রামশঙ্কর বলেন,

অদ্ভুত আচার্য কবি সরস্বতী-বরে
পরবন্ধ করি কহে শ্রীরামশঙ্করে।
অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া
কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া।
(১৫ পৃষ্ঠা ১১০)।

"কৃত্তিবাস" ভনিতায় অদ্ভুত-রামায়ণের পুথি এবং উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে। এখানেও ভনিতায় অদ্ভুত-আচার্যের রচনার স্বীকৃতি আছে বলিয়া মনে করি। যেমন,

শতস্কন্ধ রাবণের অপূর্ব আখ্যান
অদ্ভুতের মত কবি কীর্ত্তিবাস গান।
(১ পৃষ্ঠা-১৩৩)।

ভুলুয়ার (নোয়াখালী) রাজা জগৎমানিক্যের (জয় চন্দ্র) সভাসদ ভবানীনাথ আধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বনে রামকথা লিখিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন যে, রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকার কালে তিনি প্রত্যহ রাজকোষ হইতে দশ মুদ্রা (দিনে দিনে দশমুদ্রা দান) পাইতেন। (২ পৃষ্ঠা-৭৭)।

www.pathagar.com

দ্বিজ শ্রীলক্ষণ রচিত অধ্যাত্ম-রামায়ণের আদি-কাণ্ডের ও শিবরামের যুদ্ধ ও অন্যান্য পালার পুথি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উভয়ত্র পাওয়া গিয়াছে। (১ পৃষ্ঠা-১৩৪)। শ্রীলক্ষণ লিখেছেনঃ---

এত ভাবি নারায়ণ প্রবেশিল বনে
বশিষ্ঠের মতে ভনে শ্রীযুত লক্ষণে।
....
আধ্যাত্মিক-রামায়ণ আদি-খন্ড-সায়
রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষণ গায়।
(৬ পৃষ্ঠা-৬৭)।

গোপাল হালদার জানতে চেয়েছেন, কৃত্তিবাসের পরে রামায়ণ-কাহিনী যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিয়েছেন। অনেকেই কৃত্তিবাসের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছেন। হয়তো কৃত্তিবাসেরই তাঁরা অনুকারক ছিলেন। সপ্তদশ শতকে তেমন বিশিষ্ট রামায়ণ আর পাওয়া যায়না। ময়মনসিংহের মনসা-মঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম আজও আমাদের মুখে মুখে। তাঁর একটি রামায়ণ বা রামায়ণের গাথা ও অঞ্চলে চলে। আজ সকলের তা সুপরিচিত। এ লেখা যদি চন্দ্রাবতীর (বাঙলার প্রথম মহিলা কবি) বলে বা তৎকালীন বলেও নিঃসন্দেহ হওয়া যেত, তাহলে ষোড়শ শতাব্দের (বা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের) কবি বলে নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতী এখানে গণনীয়া হতেন। (৩ পৃষ্ঠা-১৩৮)।

বাংলা সাহিত্যের ষষ্ঠদশ শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট কবি কিশোরগঞ্জের পাটোয়ারী (পাটছড়া) গ্রামের বংশীদাশ চক্রবর্তীর কন্যা, বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেছিলেন। চন্দ্রাবতীর 'ভাষা পল্লীবাহী নদী তরঙ্গের ন্যায় গতিশালী, সতেজ ও কবিত্বময়'। তিনি লিখেছেন।

'শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্ক পাতা গো ফুলের বিছানি।।
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযুর জল।।
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া।।
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল।
অল্প আবেশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল।।
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপনী।
হেনকালে আসিল তথায় কুকুয়া ননদিনী।।
কুকুয়া বলিছে গো বধূ মোর বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর।।

www.pathagar.com

দেখিনাই রাক্ষস গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশমুন্ড রাবণ রাজা দেখাও আঁকিয়া।।
মূর্চ্ছিতা হইল সীতা গো রাবণ নাম শুনি।
কেহ গো বাতাস দেয় কেহ গো পাণি।।
সখীগণ কুকুয়ারে করিল বারণ।
অনুচিত কথা তুমি বল কি কারণ।।
রাজার আদেশ নাই বলিতে কুকথা।
তবে কেন ঠাকুরাণী গো মনে দিলে ব্যথা।।
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী।
বার বার সীতারে বোলায়ে সেই বাণী।।
সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন।
কিরূপে আঁকিব আমি পাপিষ্ঠ রাবণ।।
যত করি বুঝান গো কুকুয়া না ছাড়ে।
হাসিমুখে সীতারে বুঝায় বারে বারে।।
বিষ লতার বিষ ফল বিষ গাছের গোটা।
অন্তরে বিষের হাঁসি গো বাঁধাইল লেঠা।।
সীতা বলে দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে।
হরিয়া যখন দুষ্ট লৈয়া যায় মোরে।।
সাগর জলেতে পড়ে গো রাক্ষসের ছায়া।
দশ মুন্ড কুড়ি হস্ত রাক্ষসের কায়া।।
বসি ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে।।
এড়াতে না পারি সীতা গো পাখার উপর।
আঁকিলেন দশমুন্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর।।
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল'।।

চন্দ্রাবতী তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি।।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।।
দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।।
ঘরে নাই ধান চালু চালে নাই ছাউনি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।।
বাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।

www.pathagar.com

তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী।।
সদাই মনসা-পদ পূজে ভক্তিভরে।
চালু কড়ি কিছু পান মনসার-বরে।।
দূরিতে দরিদ্র দুঃখ দিলা উপদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিল আদেশ।।
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোড়।
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব দুঃখ দূর।।
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার।।
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি।।
....
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।।
....
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা।”
(১৪ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০৫, ৫০১ ও ৫০২)।

উল্লেখ্য যে, চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাশ চক্রবর্তী নিজেও কবি এবং মনসার ভাসান গায়ক ছিলেন। চন্দ্রাবতীর জীবন বিয়োগান্ত কাব্য বিধায় পিতা তাকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিয়েছিলেন। চন্দ্রাবতীর ভাষা খাঁটি বাংলা, পূর্ববঙ্গীয় বাংলা। কাব্যটির রচনাকাল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ।

'কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত জিনিষের মধ্যে একটি অঙগদ রায়বার, অন্যটি তরণীসেন বধ। রায়বার অর্থ রাজস্তুতি।........(আর) বাঙালীর ভক্তিধর্মের মাত্রাজ্ঞানহীন বাড়াবাড়িতে সৃষ্টি হয় তরনী সেনের উপাখ্যান। বিভীষণের পুত্র তরণীসেন রামভক্ত যুবক, দুর্জয়বীর। তিনি যুদ্ধে এলেন, রামের হাতে মরে স্বর্গে যাবেন বলে। অনেক চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধহল। তখন রণক্ষেত্রে তাঁর কাটামুণ্ড 'রাম নাম' জপ করতে লাগল। কাটামুণ্ডের এই শক্তি বাঙালী জনসাধরণের সহজ গ্রাহ্য একটি ঐতিহ্য হয়ে ওঠে।......তরণীসেন-বধের কথা পড়ে না কাঁদে এমন বাঙালী স্ত্রী পুরুষ নেই। রায়বারও ভক্তির মাত্রাহীনতা, ভাড়ামি ও এই ভাবালুতা-দুইটিই বাঙালী বৈশিষ্ট্য। (৩ পৃষ্ঠা-১৮৮)। তরণীসেনের উপাখ্যানের প্রধান এক রচয়িতা হলেন দ্বিজ দয়ারাম। (৯ পৃষ্ঠা-৫৪৯)।

এছাড়া ফকিররাম কবিরাজ, কবি চন্দ্রশঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ সীতাসুত, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, রামানন্দ যতি, রামানন্দ ঘোষও রামায়ণ রচনা করছেন। অষ্টাদশ শতাব্দের কবি রামানন্দ ঘোষ বলেছেনঃ-

সর্ব শক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার
কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ-অবতার।
(৩ পৃষ্ঠা-১৮৯)।

www.pathagar.com

বোধ করি বৃহত্তম রামকথা-নিবন্ধ রচনা করিয়া ছিলেন, নাম অদ্ভুত রামায়ণ। (এটি কাশীবিলাস বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কালিকাপুর, বাকুড়া থেকে প্রকাশিত হয়)। জগৎরামের 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ' নয় অংশে বিভক্ত-আদি-কাণ্ড-অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, কিষ্কিন্ধা-কাণ্ড, সুন্দর-কাণ্ড; লঙ্কা-কাণ্ড, পুস্কর-কাণ্ড, রামরাস এবং উত্তরা-কাণ্ড। জগৎরাম প্রথমে সমগ্র রাম-কথা রচনা করিয়াছিলেন। পরে পুত্রকে দিয়া লঙ্কা-কাণ্ড এবং উত্তর-কাণ্ড বিস্তারিত করেন। সেই জন্য এই দুই অংশে রামপ্রসাদের ভনিতা বেশিবার আছে। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেনঃ-

পিতা জগৎরাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যেমতে।
সীতারাম-লীলা নব্য রচিলা সুন্দর-কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত-রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত-আধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যত
রচনা বিবিধ রসধাম। ....
লঙ্কা-কাণ্ড সুপ্রকাশ রচিলা সে কৃত্তিবাস
বিস্তারে শুন্যেছে সর্বজন।
এই মনে করি পিতা ছাড়িয়া লঙ্কার কথা
অদ্ভুত-প্রসঙ্গে দিলা মন। ....
সন্তুষ্ট হইয়া তাত আজ্ঞা কৈলা অকস্মাৎ
রাম লীলা করহ বর্ণন।
এই প্রত্যাদেশ পরে কৃপা করি কন মোরে
কোন কাব্য করিবে রচন।
লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ড যেমত অমৃতভাণ্ড
সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে
মোর লৈয়া অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি
রচনা করহ রাম-প্রীতে।
(১ পৃষ্ঠা-৪৩০-৩১)।

জগৎরাম রচনা শেষ করেছিলেন ১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে, আর রামপ্রসাদ শেষ করেন ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। রাম প্রসাদ আরো লিখেছেন,

পিতা জগৎরাম মোর রামপরায়ণ
যেহ কাব্য রচিল অদ্ভুত-রামায়ণ
পঞ্চদিন গান মধ্যে শুন বিবরণ
তিন দিবসের গান পিতার রচন।
নবমী দশমী দুই দিবসের গান
রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান।.......

www.pathagar.com

দ্বাবিংশতি বর্ষ মোর বয়ঃক্রম যবে
এ কাব্য রচিল পিতা-আদেশেতে তবে।
(৭-শিবদাস ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ.)।

জগৎরাম ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে একটি রামতান্ত্রিক রূপক কাব্য 'আত্মবোধ' লিখিয়া ছিলেন। রামপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন কৃষ্ণলীলারস কাব্য। (১ পৃষ্ঠা-৪৩২)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুইজন রামায়ণ লিখিয়া ছিলেন। (দুই জন বলিতেছি বটে, কিন্তু একজন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়)। দুই জনেরই নাম রামানন্দ, একজন যতী (সন্ন্যাসী) আর এক জনের কৌলিক পদবী ঘোষ।......রামানন্দ যতীর রামায়ণ নিবন্ধের নাম 'রামতত্ত্ব', রচনাকাল ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ।

বেদ বসু ঋতু চন্দ্র শকে রামায়ণ
রামতত্ত্ব রামানন্দ করিল রচন।
(৮ পৃষ্ঠা-২০১-২০২)।

রামতত্ত্ব গান করিবার জন্য রচিত, তের চৌদ্ধ পালায় বিভক্ত।..... নিজের রামায়ণ সম্বন্ধে যতী মন্তব্য করিয়াছেন-

রামানন্দ বলে নাহি জানি ভালমন্দ
কথার পুস্তক দেখ্যা করিয়ে প্রবন্ধ।
....
যতী বলে মহীতে অনেক রামায়ণ
রস ছাড়া কথা আমি না করি রচন।
(১ পৃষ্ঠা ৫১৮ ও ৫২০)

ভনিতায় লিখেছেন,

রামানন্দ জতি য়তি মতি গতি হীন,
সীতাপতি রঘুপতি না করিয়া ভিন,
এত বৈলা মাল্যবান পলাইয়া জাএ,
রামানন্দ জতির মন সজেরাম পাএ।
(১ পৃষ্ঠা-৫১৯)।

রামানন্দ যতীর শিষ্য কৃষ্ণকান্ত লিখেছেন,

সন্ন্যাসীর চরণ বন্দিব লক্ষবার — করিলেন রামতত্ত্ব গ্রন্থের প্রচার।
চব্বিশ পুস্তক করিলেন সংস্কৃত — সে-সকল গ্রন্থ জানো পরম অমৃত।
মূর্খ তরাইতে পুন করিলেন ভাষা — না বুঝিয়া তাহে নিন্দা করে যত চাষা।
লোকের উদ্ধার হেতু করিলেন লীলা — সঙ্গীতসিদ্ধান্ত গ্রন্থে প্রমাণ লিখিলা।
সাধুরা জানেন প্রভু কৃপা-অবতার — ভাষাতে মুক্তির পথ করেন প্রচার।
দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত কহে সকলের হিত — বিপরীত না ভাবিও কারো শুদ্ধ চিত।

রামানন্দ যতীর প্রশিষ্য রামশংকর বন্দনায় লিখেছেন,

অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ তুণ্ডে স্বরস্বতী — বন্দো প্রভু রামতনু রামানন্দ যতী।........

www.pathagar.com

করঙ্গ কৌপীন ধারী দণ্ড বহির্বাস মুখে সদা বেদবানী সূর্যের প্রকাশ।
রূপ অতি মনোহর তপনকিরণ শচী-সূত আনে কিবা ব্যাস তপোধন।
পূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত পণ্ডিতে বিস্তার ভাষা বুঝাইয়া জীবে করিবে উদ্ধার।.......
আগম পুরাণ বেদ শাস্ত্র চতুর্দশে সতত প্রসঙ্গ-গীতে ভ্রমে তত্ত্বরসে।.......
বাণীর সমান বিদ্যা বুদ্ধে বৃহস্পতি শূদ্রে জ্ঞান দিতে নাগ করিলা উৎপত্তি।
রামায়ণ চণ্ডী আদি করিলা রচনা ভূমন্ডলে যার কীর্তি রহিল ঘোষণা।.......
চৈতন্য দ্বিভুজ এবে কে জানিবে অন্ত কি জানি মহিমা আমি মূঢ়মতি ভ্রান্ত।
(১ পৃষ্ঠা-৫১৯)।

অন্যজন, রামানন্দ ঘোষ নিজেকে কালীর শাপপ্রাপ্ত বুদ্ধের অবতার বলে দাবী করেছেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে ম্লেচ্ছ শাসনের বিরোধী ছিলেন। 'রামানন্দ' বলিয়াছেন যে তিনি আসলে বুদ্ধ অবতার। ম্লেচ্ছের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্যই কালী তাহাকে শাপদিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেনঃ---

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক বুদ্ধভাষা শুনিয়া ঘুচাও দুঃখ শোক।
সর্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার।
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিল অবনী।
ম্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে দাসীরূপা হৈলা লক্ষ্মী নীচজাতি-ঘরে।
ইহাতে সতের আর না দেখি নিস্তার কোনরূপে না মিলে ইহার প্রতিকার।
কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ।
....
বাজিবে ঘোষের ডঙ্কা ভুবন ভিতরে পঞ্চশক্তি-ইঙ্গিত বারণ কেবা করে।
হেলায় তরাব পশু পতঙ্গ পামর কালী জপি কাল হয়্যা ভুবন ভিতর।..........
দান যশ পৌরুষের সীমা করি যাব এই ঘটে আর অন্য মূর্তি প্রকাশিব
যজাব ত্রেতার ধর্ম কলির ভিতরে এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে।
যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি নিব একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব।

কিন্তু কালির শাপ তিনি কাটাতে পারেননি। তাই বলেছেনঃ--

রামানন্দ কহে ভবে আসি সিদ্ধদেহ পায়্যা
কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়া।

রামানন্দের কাছে দারুব্রহ্ম বা জগন্নাথ ও রামচন্দ্র অভিন্ন বিবেচিত হয়েছেন বলে তিনি বলেছেন,

মিথ্যাকভু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর
দারুরূপী রাজা রাম ভুবন ভিতর।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

সুধাফল ঘোষ-পুত্র আনিয়া সংসারে

www.pathagar.com

রামচন্দ্র-লীলামৃত ভব তরাবারে।
দারুব্রহ্ম রাজা হয়্যা করিবা শ্রবণ।
প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ।
(১ পৃষ্ঠা ৫২২-৫২৪)।

অনেকে রামানন্দ যতী ও রামানন্দ ঘোষকে একই ব্যক্তি মনে করেন। কারণ উভয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাই অনেক পণ্ডিতের ধারণা রামতত্ত্বই রামায়ণ। সন্ন্যাস জীবনের ব্যর্থতার পর রামানন্দ ঘোষ রামতত্ত্ব সংশোধন করে রামায়ণ করেন।

কৃত্তিবাসই বাঙলা 'ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। (৩ পৃষ্ঠা-৫২)। কৃত্তিবাসের রামকথা বাঙালীর প্রথম জাতীয় কাব্য। সেকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ সকল শ্রোতার কাছেই যে এই কাব্য কাহিনী উপাদেয় ছিল সে কথার সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। (২ পৃষ্ঠা-৯)।......কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করেননি।....... তিনি রচনা করেছেন বাঙালীর মন নিয়ে বাঙালীর মতো করে তাঁর বাঙলা রামায়ণ।...রূপে রসে এ বাঙালীর কাব্য।...রাম, সীতা, লক্ষণ, দশরথ, কিংবা রাবণ, মন্দোদরী, বিভীষণ-বাল্মীকির এসব চরিত্র মহাকাব্যিক আদর্শে পরিকল্পিত।......কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে এই মহান চরিত্র গুলোই পরিণত হয়েছে বাঙালীর ঘরোয়া আদর্শের চরিত্রে-রাম বীর হলেও বাঙালী বীর, স্নেহে, মমতায়, কোমলতায় সজল। তিনি বাঙালী ঘরের আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী। তেমনি সীতা, লক্ষণ, দশরথ, কৈকেয়ী থেকে মন্থরা, শূর্পণখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ বাঙালী আদর্শের প্রলেপে পুনর্গঠিত। আর ভক্তপ্রধান হনুমান কর্মী, জীবন্ত চরিত্র। (তাই) সর্বশ্রেণীর বাঙালী আর কোন গ্রন্থকে এমন আপনার করে নেয়নি, যেমন নিয়েছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে। (৩ পৃষ্ঠা ৫২, ৫৩, ৫৪)।

রামায়ণ গাওয়া হইত এবং গায়েনদের নিজের নাম ভনিতারূপে চালাইয়া দিবার প্রবৃত্তি সর্বদা সজাগ ছিল।.....এই কারণে রামায়ণে প্রচুর ভনিতা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে (১ পৃষ্ঠা-১৩১)। তার ফলে যুগের পর যুগ গায়েনের মুখেমুখে কৃত্তিবাসের পাঁচালী কীর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া লিপিকাররাও নকল করার সময় যা কৃত্তিবাসে ছিল না, অন্য কবির এমন অনেক লেখা এই রামায়ণে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ....পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার খৃঃ ১৮৩০-৩৪ এর সংস্করণে কৃত্তিবাসের পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে একেবারে নূতন করে দিলেন,-লোকে তা পরম আনন্দে পাঠ করতে লাগল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলতে এই তর্কালঙ্কারী ভাষাই এখন বাজারে চলছে। কৃত্তিবাসের মূলোদ্ধার এখন দুঃসাধ্য।......(তবে একথা সত্য যে) লোক জীবনের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের এমন একটা স্বচ্ছন্দ বন্ধন গড়ে উঠেছে যে, এক অর্থে এ রামায়ণকে লোককাব্য বলা চলে। (৩ পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।

একথা আজ সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, বহু ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজ আর সংস্কৃতের বস্তু নয়, বাঙলা লোক কাব্য।

আগেই বলা হয়েছে যে, রামায়ণ কাব্য গাওয়া হত। গায়েনেরা আসর করে এই কাব্য গাইতেন। ভক্তি রসে গাওয়া এই কাব্য স্রোতাদের আপ্লুত করত এবং এই কাব্যের সুর

www.pathagar.com

ঃএখনো ভক্তদের কাঁদায়। এই গায়ক বা গায়েনদের মধ্যে বাঙালী জীবনে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ভক্ত কবি তুলসী দাস। চৈতন্য দেবের ভক্তি প্লাবনে বাঙলা ভেসে যাবার পর মাঠে এলেন ভক্ত কবি তুলসী দাস তাঁর রামচরিত মানস নিয়ে। সুকণ্ঠ গায়ক তুলসী দাস গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে আসর করে রামায়ণ গেয়ে লাখো কোটি মানুষের মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন রামমন্দির। তাঁর রাম চরিত মানস আজো দুঃখী মানুষকে কাঁদায়। ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন," ...ভক্ত তুলসীদাস রামমন্দির বানিয়ে তুলেছিলেন বড় যত্ন করে আর ভালবাসায়। যে মন্দির এই ঝুটা অযোধ্যায় নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব-ভারতের লাখো কোটি মানুষের মনো মন্দিরে।.....শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ যেই সন্ধ্যেটি হল অমনি পিদিমের সামনে বসে গেল রামচরিতমানস খুলে। রাম ভক্তিতে ডুবে গেল। চোখে প্রেমাশ্রু চিক চিক করতে লাগল। দুঃখী রাম কত কি ছাড়লেন, এক বস্ত্রে চলে গেলেন বনে। সুখ ভোগ করেননি জীবনে। দুঃখের দেবতা, দুঃখীর দেবতা।.."(১০)।

বাল্মীকির রামায়ণ পড়েন নি কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিংবা তুলসী দাসের রামচরিতমানস যাঁরা পড়েছেন রাম চরিত্র যে তাঁদের সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

কিন্তু ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর কতিপয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন উগ্র ধর্মান্ধ রামভক্ত অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ করার লক্ষ্যে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে দেয়ায় বিশ্ব সমাজে ভারত রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ায় ভারতের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা এই তথ্য প্রকাশ করে দিলেন যে, রামচন্দ্র কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নন, কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। ভারতীয় সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় "দরকার নিস্ত" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন, ".........পুরাণের কথা নিয়ে রামায়ণ ও মহাভারত। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস নয়। ......কাব্যের বীজ কল্পনায়।......শ্রীকৃষ্ণ বা রামের ঠিকানা দু'খানি মহাকাব্য। কবি কল্পনায় তাঁদের দেখেছেন। জায়গার নাম না দিলে মহাকাব্য জমেনা বলেই অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, দ্বারকা নাম গুলো মহাকবিরা বেছে নেন।..."(১১)।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আরো লিখেছেন,"..........যিশু, মোহাম্মদ এই পৃথিবীতে ছিলেন, সাধারণ মানুষ তাঁদের দেখেছেন।..... মহাকাব্যের রাম নাকি মানব শরীর নিয়ে অযোধ্যায় জন্মেছিলেন।......মানব দেহ ধারণ করে এক সময় রাজত্ব করেছেন।....এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।........কারণ রাম যে ওখানে ছিলেন এমন কোন প্রত্যক্ষ দর্শীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।..........." (১৩ পৃষ্ঠা ৬১)।

ভারতের প্রবীন সাহিত্যিক অন্নদা শংকর রায় "ভ্যানিস" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন "......শ্রীরামচন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র নন। এই অযোধ্যা রামায়ণের অযোধ্যা নয়, বিতর্কিত স্থানটি তাঁর জন্মস্থান নয়। সেখানে মন্দির ছিল কিনা যে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ও ঐতিহাসিকরা নিঃসংশয় নন, জজ সাহেবরাতো ননই।....." (১২) (১৩ পৃষ্ঠা-২৩৭-২৪০)।

হরিপদ ভট্টাচার্য বলছেন, "...বাল্মীকির রামায়ণে বর্নিত অযোধ্যা আর বর্তমান অযোধ্যা যে এক, তার প্রমাণ নেই। রাম মহাকাব্যের নায়ক, ঐতিহাসিক চরিত্র নন, কিংবদন্তী

www.pathagar.com

অনুসারে রামকে মানলেও কোন্ স্থানে তাঁর জন্ম তা বলার মতো প্রমাণ নেই। ...." (১৩ পৃষ্ঠা-২৩৭-২৪০)।

তাই একথা আজ সত্য প্রমাণিত যে, বুদ্ধদের, যিশুখৃষ্ট, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রমুখ ধর্ম প্রবর্তকগণ এই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, মানুষ তাঁদের দেখেছেন, তাঁদের কথা শোনেছেন, কেউ কেউ তাঁদের প্রচারিত ধর্মগ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছেন। ঠিক তেমনি প্লেটো, এরিষ্টোটল, রুশো, ভল্‌টেয়ার, নানক, কবির, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ এই পৃথিবীতে ছিলেন, মানুষের কাছে মানবতার বাণী প্রচার করছেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র কখনো এই নশ্বর বিশ্বে মানব দেহ নিয়ে জন্মান নি। তা সত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, লোককাব্য হিসেবে রামায়ণ এবং মহাভারতের মুল্য বাংলা সাহিত্যে অম্লান থাকবে।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ) ইষ্টার্ন পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।

২। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩।

৩। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা-প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০,

৪। বিশুদ্ধ কাশীদাসী মহাভারত, সম্পাদক-সুবোধ চন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৬৩।

৫। ভারত বর্ষ, মাঘ, ১৩৪১।

৬। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-৬

৭। পাক্ষিক সমালোচক-ভাদ্র, ১২৯১।

৮। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-৫,

৯। বাংলা সাহিত্য পরিচয়।

১০। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ-'তবে কি জয়ী হবে রাবণের অহঙ্কার আর স্পর্ধাই)।

১১। আজকাল, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯২

১২। আজকাল, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯২

১৩। ধ্বংস স্তূপে আলো-বাবরী মসজিদ রাম মন্দির বিবাদ। অরুন সেন ও মফিদুল হক সম্পাদিত। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

১৪। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পশ্চিম বঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা। ১৯৯১

১৫। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ- বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১-২।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, রায়, গাজী ও অন্যান্য মঙ্গল

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্য একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ও অভিজাত দেবতা বলিতে এই পাঁচজন-বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী, মনসা ও ধর্ম। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তিন দেবতার প্রাধান্য বেশী। কেননা ইঁহাদের মাহাত্ম্য সংস্কৃত পুরাণে গীত, বাঙ্গালা দেশের বাহিরে স্বীকৃত এবং ইঁহারা সমাজ শাসক ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত। মনসা ও ধর্ম অল্প বিস্তর দেশীয় দেবতা বলিয়া ইঁহাদের পূজা বিশেষ করিয়া জনপদ সমাজেই বেশী স্বীকৃত ছিল। পাঁচ দেবতার মাহাত্ম্যগাঁথা অথবা লীলাকথা অবলম্বনে গেয় আখ্যায়িকা কাব্য (মঙ্গল) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-৮৩)। মঙ্গল কাব্যই বাঙলার জনসাধারণের নিজস্ব কাহিনী।

মনসামঙ্গল

মনসা কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, আদিম মানুষ নিত্য চোখের সামনে দেখিত, কত সুস্থ বলিষ্ঠ লোক যমদূতের ন্যায় সাপের করাল দংশনে অকালে ধরাধাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বাপ-মায়ের শত মমতা, সতীর সহস্র ভালবাসা, চিকিৎসকের অজস্র চেষ্টা তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তখন সে বড় নিঃসহায় হইয়া নিষ্ঠুর দৈবকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সাপের দেবী মনসার পূজার আরম্ভ। সংস্কৃত সাহিত্যে পদ্মা কমলা লক্ষ্মীর প্রতিশব্দ। কিন্তু বাংলা ভাষায় পদ্মা হইতেছেন মনসার নামান্তর। প্রায়ই পূর্ববঙ্গের কবিরা তাঁহাদের কাব্যকে মনসামঙ্গল না বলিয়া পদ্মা পুরাণ বলিয়াছেন। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গে সাপের দেবীকে পদ্মা নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হইয়াছিল। (১০ পৃষ্ঠা-১৬৫)।

বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) মনসা পূজা বহুল প্রচলিত। বাঙ্গালা দেশে সর্পরাজ্ঞী মনসাদেবীর পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। একদা মনসাদেবী বাস্তুদেবতার ন্যায় ঘরে ঘরে পূজিত হইতেন। (১ পৃষ্ঠা-১৮)। কারণ, ঝোপঝাড়, বনবাদাড়ের দেশের সাধারণ মানুষকে জীবিকার ধান্দায় রাত-বেরাতে ঘুরতে হয়, তারা সাপের দেবীকে অবজ্ঞা করবে কি করে? বেদ, পুরাণ, কোরান-হাদিস-তো সর্পাঘাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে না।............ মনসা অনেক দিনের পুরানো

www.pathagar.com

দেবতা। পদ্মা, বিষহরি প্রভৃতি তাঁর আরও নাম আছে। নাগ পূজা বহু আদিম ও সভ্যজাতির মধ্যেই সুপ্রচলিত ছিল; মোহেনজো-দাঁড়োতেও তার চিহ্ন রয়েছে। 'মনসা' নামটি বেদেও রয়েছে।.....বাঙলায় মনসা মঙ্গলের প্রাণবস্তু বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। (২ পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫)-মনসার গল্প হচ্ছে এইঃ-- 'শিবের কন্যা মনসা কালিদহে পদ্মপলাশে জন্ম লইবার পর পাতালে পৌঁছিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবয়স্ক নারীরূপ পাইলেন এবং সর্পদের উপর আধিপত্য লাভ করিলেন। শিব তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে গৃহিনী চণ্ডী ঈর্ষান্বিত হইলেন। ...... চণ্ডী মনসা উভয়ের হাতাহাতিতে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। চণ্ডীর উপর নিদারুণ ক্রোধ লইয়া মনসা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। কিছুকাল পর পুত্র আস্তীকের জন্ম হইল। জনমেজয়ের পিতা সম্রাট পরীক্ষিত সর্পদংশনে দেহত্যাগ করেন। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় সর্পধ্বংস যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। সর্পেরা বিপদ দেখিয়া মনসার শরণ লইল। মনসা আস্তীককে জমমেজয়ের যজ্ঞস্থানে পাঠাইলেন। আস্তীক জনমেজয়কে বুঝাইয়া যজ্ঞ বন্ধ করিলেন। কতক সাপ রক্ষা পাইল। (এই উপাখ্যানটুকু মহাভারতে পাওয়া যায়। (১ পৃষ্ঠা-১৮-১৯)।

মনসা চণ্ডীর অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে শিব-চণ্ডী ভক্তদের বিরূপ করে তোলার উদ্যোগ নিলেন। সখী ও বোন নেতার সহায্যে মনসাপূজা চালু করলেন। চম্পক নগরের শিবভক্ত রাজা ও গন্ধ বনিক চাঁদোর স্ত্রী সনকাকে মনসাপূজা শিখালেন। একদিন সনকাকে পূজা করতে দেখে শিবভক্ত চাঁদো ক্রুদ্ধ হয়ে পূজার সামগ্রী ভেঙ্গে দিলেন লাথি মেরে। অতঃপর চাঁদো বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে মনসা পণ্যসমেত তরী ডুবিয়ে দিলে ছয়পুত্র নিহত হল। চাঁদো তার মহাজ্ঞান বলে পুত্রদের বাঁচালো। মনসা তখন ছলনা করে চাঁদোর মহাজ্ঞান হরণ করলেন। এর পর চাঁদো বিদেশে রাজরোষে পড়লেন। সনকা কনিষ্ঠপুত্র লখিন্দরের বিয়ের আয়োজন করলেন বেহুলার সাথে। কিন্তু জানতেন বিয়ের রাতেই মনসার কোপে সর্পদংশণে লখিন্দরের মৃত্যু ঘটবে। তাই চাঁদো লৌহ-মন্দির নির্মাণ করলেন পুত্রের বাসর শয্যার জন্যে এবং নিজেও পাহারা দিতে লাগলেন। কিন্তু মন্দির নির্মাণকালে স্থপতি বিশ্বকর্মা মনসার ভয়ে মন্দিরের গায়ে তিল পরিমাণ ছিদ্র রেখে দিলেন। সেই অদৃশ্য ছিদ্র পথে সূতোর মতো কালনাগ ঢুকে দংশন করল লখিন্দরকে। শাপে কাটা মৃতদেহ দাহ না করে সাগরে ভাসিয়ে দেয়াই নিয়ম ছিল। বেহুলা ভেলায় স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে গ্রাম পার্শ্বস্থ নদী স্রোতে ভাসলো আত্মীয় স্বজনের নিষেধ অমান্য করে, যমপুরে গিয়ে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করাই তার সংকল্প। ভুগোলের দেশ আর উপকথার দেশ ছেড়ে ভেলা ভেসে গিয়ে গঙ্গাসঙ্গমে ত্রিবেনীর ঘাটে পৌঁছলে বেহুলা দেখলো এক আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ড। একধোপানী এসে কোলের ছেলেকে মেরে রেখে সারাদিন কাপড় ধুয়ে সন্ধ্যায় সেই মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। বেহুলা বুঝল, এরই সাহায্য নিয়ে স্বামীকে বাঁচাতে হবে। পরদিন ধোপানী এসে কাপড় ধুতে শুরু করলে বেহুলা বিনীতভাবে তার সাথে আলাপ করলো এবং তার হয়ে কিছু কাপড় কেঁচে দিল।

www.pathagar.com

বেহুলার ব্যবহারে ধোপানী খুশী হল। সে জানালো যে সে স্বর্গের দেবতাদের ধোপানী নেতা এবং মনসার সখী। বেহুলার অনুণয়ে নেতা তাকে স্বর্গে নিতে সম্মত হল। বেহুলা স্বর্গে পৌঁছে নাচ দেখিয়ে শিব চণ্ডী প্রমুখ দবতাদের সন্তুষ্ট করল। দেবতারা বেহুলার কাহিনী শোনে দুঃখ করল। কিন্তু তাঁদেরতো কিছু করার নেই। কিন্তু তাঁরা মনসাকে অনুরোধ করল। তাঁদের অনুরোধ ও বেহুলার অনুনয়ে মনসা লখিন্দরের অস্থিচর্মসার দেহে প্রাণ সঞ্চার করেদিল এবং চাঁদোর অপর ছয় ছেলেকে বাঁচিয়ে দিল এক শর্তে, তা হল চাঁদো এবার মনসার পূজা করবে। বেহুলা স্বামী, ছয় ভাসুর এবং মুল্যবান পণ্যাদি নিয়ে চাঁদোর রাজ্যে চম্পক নগরে ফিরল। যে ঘরে চলছিল সনকা ও ছয়পুত্র বধূর কান্না সে ঘরে সৃষ্টিহল আনন্দ। অতঃপর পুত্রবধূ বেহুলার কাতর অনুরোধে শিব ভক্ত চাঁদো মনসাকে পূজা দিলো, তবে সরাসরি নয়, পিছন ফিরে বাম হাতে, কারণ তার কাছে মনসা ছিল চেঙ্গমুড়ি কানি। এর ফলে মনসা পূজা চালু হয়ে গেল। কারণ সে সময় গন্ধ বণিকের প্রভাব ছিল অসামান্য।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় এবং তা হচ্ছে-কাহিনীতে প্রথম অংশ মহাভারতে উল্লিখিত থাকলেও বেহুলার ভাসান অংশ তাতে নেই এবং এই ভাসান অংশে যে নদী ও গ্রামের কথা বলা হয়েছে তা বাংলারই নদী ও গ্রাম, অর্থাৎ এটি বাংলার বিষয় বা Matter of Bengal.

এই কাহিনীতে দেখা যায় যে মনসা শক্তি প্রয়োগে শ্রদ্ধা আদায় করেছেন। যাকে স্বৈরাচারী রাজার নীতির সাথে তুলনা করা যায়। তবে মনসার এই স্বৈরাচারী ভূমিকার ফলেই শ্রেণী বিভক্ত হিন্দু সমাজে নীচ শ্রেণীর প্রতি উচ্চ শ্রেণীর সম্মাণেরও স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়। বেহুলা-লখিন্দরের মানবীয় কাহিনীতে পাঠক শ্রোতা অশ্রুসিক্ত হয় আজো।

কানা হরি দত্তই মনসার গীত প্রথম রচনা করেন। বিজয় গুপ্তের কাব্যটি একটি পুরাণো রচনা। বিজয়গুপ্তের কাব্য সম্পর্কে এবং তাঁর কাল সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কানা হরি দত্তের মনসার গীত এর অংশ এখন উধৃত করা হচ্ছেঃ-

পদ্মার সর্প সজ্জা

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী।।
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলী।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হ্রিদয়ে কাঁচুলী।।
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর।।
পদ্যনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিংকিণী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী।।
কণক নাগে কৈল কণের চাকি বলি।

www.pathagar.com

বিঘতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলী। ।
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা।।
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
চন্দ্র সূর্য দুই তারা আড়ে লুকায়।।

(১২ পৃষ্ঠা-১৯৩, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক উদ্ধারকৃত হরিদত্তের পুঁথি থেকে উধৃত)।

কানা হরি দত্তের গীত সম্পর্ক বিজয় গুপ্তের মন্তব্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মনসা বিজয় কাব্য রচনা করেন বলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে রচনাগৌরবে ও প্রচারবাহুল্যে কেতকা দাস-ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গল শীর্ষস্থানীয়। (৩ পৃষ্ঠা-২৬৮)। কারণ কেতকা দাস মনসা মঙ্গলের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। কেতকাদাস (ক্ষেমানন্দ) বেহুলা-লখিন্দরের প্রত্যাবর্তণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন এভাবে:-----

চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুইয়া যোগী-যোগিনী হৈয়া
চলিল বেহুলা নখিন্দর
রূপ জিনি তিলোত্তমা রক্ত বস্ত্র পরি রামা
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর।
গলায় রুদ্রাক্ষমালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা
নখিন্দর চলে তার আগে
বেহুলা যায় পিছু পিছু লজ্জায় না বলে কিছু
মায়ারূপে দোহে ভিক্ষা মাগে।

....
সবাকার বাড়ি গিয়া শিঙ্গাধ্বনি করে
শিব শিব বাণী মুখে সঘনে নিঃসরে।
বেহুলা-নখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ি বাড়ি
থালের উপর কেহ দেয় চালু কড়ি।
....

পিতৃগৃহে বেহুলার মায়ের বচন:-

তোমা দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ
মোর কন্যা এক ছিল তোমার সমান।
না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈয়া কোলে
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে।।

চদ্মবেশে শ্বশুর বাড়ীতে পৌছার পর শাশুড়ী সনকার প্রশ্নের জবাবে বেহুলা বলে:-

বেহুলা ডোমিনী নাম সায় ডোম পিতা,

চাঁদ ডোম শ্বশুর নখাই ডোম পতি
অতি হীনকূলে জন্ম মোরা ডোম জাতি।
ধুচনী চুবড়ী বুনি আর বুনি কুলা
সিয়নী বিয়নী বুনি আর বুনি ডালা।

ব্যজনী খানি বিক্রি করার জন্যে এগিয়ে দিয়ে বলে:-

আমার বিয়নী খানি লক্ষ টাকা মূল
চাঁদ ঝলমল করে কনকের কূল।
ব্যজনে বসন্ত আসে বন্দিনীর বায়
নিদ্রাকালেতে লাগে সুশীতল গায়।
যে জন সুজন বড় হয়ে ত রসিক
ব্যজনী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক।

বেহুলার কথায় সনকার মনে পুত্র-পুত্রবধুর স্মৃতি জাগেঃ---

বেহুলা নখাই নামে পূর্বশোক জাগে
সনকা ক্রন্দন করে ডোমিনীর আগে।
(৩ পৃষ্ঠা-২৬৮, ২৭৩ ও ২৭৪।

ক্ষেমানন্দ নামে (বা উপাধিতে) আর একজন কবিও বেহুলা-লখিন্দর পালা নিয়ে নয়টি দীর্ঘপদের একটি মনসা মঙ্গল পাঁচালী লিখেছেন। এটি বসন্ত রঞ্জণ রায় এর সম্পাদনায় ১৩১৬ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ভনিতায় ক্ষেমানন্দ (কেতকাদাস নহেন) লিখেছেন:-

ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করিয়ে মিনতি
আসরে করহ খেলা দেবী পদ্মাবতী।

কিন্তু ক্ষেমানন্দের কাহিনীতে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। মনসা চাঁদোর কাছে পূজা চাইলে চাঁদো প্রত্যাখ্যান করে বলে:-

চেঙ্গমুড়ী কানী আমি পূজিব কেমনে।
চান্দ বলে মোর দেব প্রভু ভোলানাথ
আর কোন দেবী নাগ্রি করি প্রণিপাত।

সিংহলে বাণিজ্য হইতে ছয় পুত্রসহ ফিরিবার পথে মনসা ব্রাহ্মণীর বেশে গিয়া ভিক্ষা চাহিলে চাঁদ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বলে,

চান্দ বলে নৌকায় ভাণ্ডারী আছে কেহ
এক কড়া কড়ি ইহারে ফেল্যে দেহ।

লখিন্দরের মৃত্যু হইলে চান্দ বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল:-

উচ্চ-কপালী বেহুলা লো চিরুণ-চিরুণ দাঁতী
বাসরে খাইলে স্বামী না পোহাল্য রাতী।

প্রত্যুত্তরে বেহুলা বলে:--

ভাল হৈল চান্দ শ্বশুর দোষ দিলে মোরে
আর ছয় পুত্র তোমার কোন রোগে মরে।

নেতা বেহুলাকে মনসার কাছে নিয়ে গেলে মনসা অভিমান করে বলে:-

আমি কোন দেবতা আমারে মানে কে
যথা মন কন্যা তুমি যাহ সে তথাকে।

নেতা ও বেহুলার বিশেষ অনুরোধে মনসা দেবী চম্পক নগরে যাইতে রাজী হইল। সাতভাই লখিন্দর বাঁচিয়া উঠিল। দেবীর সঙ্গে সকলে চম্পক নগরে গেলেও চান্দ মনসা পূজায় রাজী হইল না।

চান্দ বলে কি বলিলে আমার নন্দন
চেঙ্গমুড়ীর কেমনে সে পূজিব চরণ।
যদি মোর সর্বনাশ পুনর্বার হয়
তথাপি না পূজি আমি কহিল নিশ্চয়।
দূর কর ওরে বাছা বলিএ তোমারে
উহাকে দেখিয়া ক্রোধ দহিছে শরীরে।

দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন-'আপমান করিতে বেউলা আনিলে আমায়'। বেহুলা বলে

"মাতা না কর ক্রোধ-মন
অবশ্য সেবিব শ্বশুর তোমার চরণ।"

অতঃপর বেহুলা এবং লখিন্দরের জীবন প্রাপ্ত সব ভাই চাঁদ এর পায়ে পড়িল।। তবু চাঁদ বলে:-

ঘরকে পাঠাও উহায় কিছু দেহ কড়ি
নতুবা খাইবে আজি হেন্তালের বাড়ি।
শিবকে ছাড়িয়ে উহার পূজিব চরণ
এমন কুৎসিত আশা করে কোন জন।

সনকা মা। সে পুত্রদের ফিরে পেয়েছে। তাই সে বলল:-

বান্যা কঠিন তোমার মন।
পুষ্পজল দেবীকে দাও আমি কহি বাণী
মরা পুত্র চান্দ বান্যা পাইলে আপুনি।

তখন চাঁন্দ এর মন কিছুটা নরম হইল। ভাবিল-

অনেক উপায় ছুঁড়ী করিল আপনি
ছেল্যার উপরোধে আমি দিব পুষ্প-পানী।

অতঃপর চান্দ শিব পূজা করিয়া মনসা পূজায় বসিল-

জয় ভেবী বল্যে বান্যা দেই পুষ্প-পানী
তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগত-জননী।

www.pathagar.com

দৈবের নির্বন্ধ ভাই কে করে খন্ডণে
ভেবী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদনে।......
তুষ্ট হঞে মনসা মা তারে দিল বর।
পূজিতে পূজিতে চান্দের দিব্যজ্ঞান হৈল
পশ্চিম মুখ তেজ্যে চান্দের পূর্বমুখ হল্য।
(৩ পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৭)।

বিষ্ণুপালের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে লোকাক্তি ছড়া ও মেয়েলী গান গাঁথা আছে। এজন্যে এটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত। এই কাব্যে কবি হাসান-হোসেনের কারবালা কাহিনীর অংশও যোগ করেছেন। তবে হাসান-হোসেনের বাসস্থান বাংলাদেশে নির্দেশ করা হয়েছে। (৫)

এই কাব্যে মনসা দুইভাইকে (হাসান-হোসেন) পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে।

মনসা নিজের রাজ্য পরিদর্শণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হাসনের পুরীতে, হাসন হাটি-নারিকেলডাঙ্গায় আসিয়াছেন। সেখানে দুই ভাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মনসা মন্ত্রী-সহচরী নেতাকে জিজ্ঞেস করলেন-

বাপ যদি মহাদেব মা যদি পার্বতী
তবেত আমার হইল ভাই
দেব-অংশে মুনিসার (মনুষ্য) জনম হঞাছে
কেনে জবই কর‍্যা খাএ (খায়) গাই।

নেতা বলেন, মহাদেবের বরে ইহারা দেবতারও অবধ্য।

দেবতা হইয়া যদি এক সইদ বধ করি
সাত কপিলার বধ লাগে তায়।

কাব্যে হাসনহাটির বর্ণনাঃ-

ফিরই মাধাই (মনসার বাহন) আওরি আওরি (বাড়ী, বাড়ী)
হিন্দু মুসলমান-চিনিবারে নারি
ভাই সবার হাতে ছুরি কাটারি।
দারুণ কুকুড়ার রোল বিষম বাজিছে ঢোল
হাওয়াই ছাড়িছে ঘন ঘন
কালু তুরকা মোচলমান মাগ্যের পাতে ভাত খান
সোখরীতে না দেয় গোময়।
মাধাই গেলরে কসাএর হাট মাঁস বেচে মাথায় পাগ
কপিলার মাংস তুলে ধরি।।...

হাসান-হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধে মনসা শেষ পর্যন্ত যুত করিতে পারিলেন না। ঘোড়ায় চাপিয়া দুই ভাই তাড়া করিলে মনসা পালাইতে বাধ্য হইলেন।

www.pathagar.com

ঘোড়া উঠাইল হোসেন নৃপবর
পালাইএগ্রা যান মা মনসাদেবীর গণ।
সেখান হইতে করিলা গমন
লঙ্কাভূবনে যাএগ্রা দিল দরশন।
প্রাণ রক্ষা কর বিভীষণ লইলাম শরণ।
পেছা খেদাড়িয়া আল্য মোর দারুণ যবন।

বিভীষণ বলিল,আমার সাধ্য নাই, "সূর্যের নিকটে গো শরণ লাও গা তুমি।"
সূর্যের কাছে গিয়া দেবী নিবেদন করিলেন:-

প্রাণ রক্ষা কর সূর্য লইলাম শরণ
পেছা খেদাড়িএগ্রা আস্যে মোর দারুণ যবন।

তখন

এবোল শুনিয়া সূর্যে রথ ছাড়ি দিল
গগণমণ্ডলে ঘোড়া উড়িতে লাগিল।
সূর্য বলে থাক বেটা দারুণ যবন
এখানে আইলে তোর নিশ্চয় মরণ।
পাকল-দৃষ্টি হএগ্রা সূর্যে ঘোড়া পাণে চায়
পাখছেদ হল্য ঘোড়া গড়াগড়ি যায়।
কুলকুলি দিএগ্রা মাধাই খেদ্যে লএগ্রা যায়
প্রাণ লএগ্রা দুটি ভাই পালাইএগ্রা যায়।

হাসন হোসেন মহারুদ্রের কাছে গিয়া বলিল:-

প্রাণ রক্ষা কর বাপা লইলাম শরণ
পেছা খেদাড়িএগ্রা আল্য মা মনসাদের গণ।

শুনিয়া-

মহারুদ্র বলে বাছা নিবেদন করি
ঝিএর বৈরী বাছা রাখিবারে নারি।

দুর্গার কাছে গেলে তিনিও সেই কথাই বলিলেন। দুই ভাই ঘরে ফিরিয়া ধরিত্রীর শরণাপন্ন হইল। বলিল:-

বসুমতি মা গো বিদায় দাও তুমি
তোমারে ধেয়াএগ্রা গো পাতাল যাব আমি।
পাতালের নাগলোক নেড়্যা চেড়্যা খায়
যবনমুরুতি আমার হাঁকারে পালায়।

পৃথিবী আশ্রয় দিলেন-

সেইখানে দুটা পতিকুণ্ডা সৃজন হইল
হাসন-হোসেন দুই ভাই তাহাতে সামাল্য।

www.pathagar.com

মাকড়সা যাইঞা তায় জাল বেড়াইল
গাছ হৈতে কেঁকলাস দেখিবারে পাইল।

খুঁজিতে আসিয়া মনসা কুয়ার মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে ছিলেন, তখন কেঁকলাস তাহাকে জানাইয়া দিল। (জঙ্গ নামায় হাসন-হোসেনের কাহিনী তুলনীয়)।

উন্মত্ত হইয়া মাতা খুজিঞা বেড়ায়
হাসান হোসেন দুই ভাইকে দেখিতে না পায়।
ঘাড় নেড়্যে কেঁকলাস দেখাইঞা দিল
তাহাতে জগতী মাতা বুঝিতে নারিল।
গাছ হৈতে কেঁকলাস নামিল ধিরি ধিরি
আনন্দিত হইল মাতা ঈশ্বর-ঝিআরি।
লেঙ্গড়ে কর্যে মাকড়সা-জাল ভাঙ্গি দিল
কুআর ভিতরে হাসেন দেখিবারে পাল্য।
গান কবি বিষ্ণুপাল বিষহরির বর
এখন কেন দেখি বাছা কুআর ভিতর।

অবশেষে দুইভাই দেবীর শরণ লইল,

রাখ রাখ মা হরবিন্দু কমলা
তুমি লয় ভূতের গেয়ান
এই ভূম তোমার শাসন করিঞা দিব
দুটি ভাএর রাখহ পরাণ
কোহবড় (কবর) ভাঙ্গিঞা দেউল বনাঞা দিব
পূজা নামে দিবেন ব্রাহ্মণ
ঘরে আছে মা বিবি ফাতুমা
সেই তোমার করিব সেবন।

দেবী নরম হইলেন, তখন,

হাসেন বড় ভাগ্যবান সহস্র ধেনু কল্যা দান
দেবীর নামে ভাণ্ডার বিলায়
কেওতুকির চরণ শিরে বন্দি নিজ ধন
গীত কবি বিষ্ণু পালে গায়।

তখন দেবী মর্ত্যে নামিয়া "বসিলা স্বেত শিমুলের ডালে।"
(৩ পৃষ্ঠা-২৭৭, ২৭৮, ২৮২, ২৮৩, ও ২৮৪)।

আগে মনসার যে গল্প বলা হয়েছে তাতে হাসান-হোসেনের কাহিনী বা কারবালার জঙ্গ নামা নেই। বিষ্ণু পালে অবশ্য চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা এবং অন্যদিকে মনসার পিতৃগৃহ তথা শিবের গৃহে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ, দুর্গার ক্রোধ ইত্যাদি কাহিনীও রচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এছাড়া উত্তর রাঢ়ের (গৌড়বাসী) কবি কালিদাস, বর্ধমানের শ্রীকবিবল্লভ রসিক মিশ্র, শ্যামদাস পুরের দ্বিজ কবি চন্দ্র, সাজাদ রায়ের বংশধর ক্ষেমানন্দ, সীতারাম দাস, কিশোরগঞ্জ জেলার পাটছড়া গ্রামের বংশীদাস চক্রবর্তী (প্রথম বাঙালী মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা), উত্তর বঙ্গের জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবন কৃষ্ণ মৈত্রেয়, পূর্ববঙ্গের বৈদ্য হরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, বিপ্রজানকী নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ বৈদ্য, কবি কর্নপুর, শ্রীরাম বিনোদ, ষষ্ঠীবব দত্ত (সেন), গঙ্গাদাস সেন, বর্ধমান দাস, কবি চন্দ্রপতি, পুরুষোত্তম, যদুনাথ পন্ডিত, গুণানন্দ খান, রতিদেব সেন, গুণাকর রূপ নারায়ণ, মধুসূদন, হরিসূত নন্দলাল, দ্বিজ বলরাম, দ্বিজ জয়রাম, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ সেন, দ্বিজ গোপীকান্ত, দ্বিজ ত্রিলোচন, দীন ভবানন্দ, বৈদ্য ভানুদাস, মুরারী মিশ্র, হরিহর দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, আনন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখও মনসা মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁদের কারো কারো কাব্য পদ্মাপুরাণ নামে পরিচিত। এছাড়া রামজীন বিদ্যাভূষণ এবং ২২ কবির কব্যের কথা একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মনসা মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের (বাংলাদেশের) কবির সংখ্যাই বেশী। মনসা পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) অধিক প্রচারিত, পরিচিত এবং গেয় কাব্য কথা। গোপাল হালদার বলেছেন, "............... বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ-ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মুসলমান-প্রধান এসব অঞ্চলের (বাংলাদেশে) মুসলমানরাই ছিল শ্রোতা হিসেবে অধিক উৎসাহী, গায়েনরাও অনেক ক্ষেত্রেই ছিলেন মুসলমান। (২ পৃষ্ঠা-৫৪)।

চণ্ডীমঙ্গল

মধ্যযুগের সাহিত্য সর্বত্রই-ধর্ম-কেন্দ্রিক, বাংলা সাহিত্যও মধ্যযুগে তাই ছিল। (২ বাংলাদেশ সংস্করণের নিবেদন, পৃষ্ঠা-১১/১২)। বস্তুতঃ ঐ যুগের সাহিত্যে (পুথিতে) তাই পূজা-অর্চা, নিয়ম-নীতিই আলোচিত হয়েছে। সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের স্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল এই ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। ডঃ রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ভান্ডারকর এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থায় বিভিন্ন দেবদেবী (শক্তি দেবতা) কল্পিত হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে হিন্দু মনের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সে সব দেবী এক দেবীতে লীন হয়ে গেছেন। চণ্ডী তেমনি এক দেবী। চণ্ডী দুর্গার রূপ বিশেষ। মার্কন্ডের পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডিকা দেবীর মাহাত্ম্য কথাই চণ্ডি কাহিনী। চণ্ডীমঙ্গল চণ্ডী সম্বন্ধে রচিত মধ্যযুগের বাংলা কাব্য। মঙ্গল নামে অসুর বধকারী দেবীর নাম চণ্ডী। 'মনসামঙ্গলের কাহিনীর তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দীর্ঘ, তাতে বৈচিত্র অধিক, আর এ দেবী মনসার মত তেমন ক্রোধ-বিদ্বেষ বিরোধে দিগবিদিগ জ্ঞানহীনা ক্রুরচরিত্রা নন। আসলে চণ্ডী ভংঙ্করী না থেকে ক্রমেই ক্ষেমঙ্করী হয়ে উঠেছেন। ভক্তদের তিনি পরীক্ষা করেন কৌতুকে, কিন্তু রক্ষা করেন আপনার দয়ামায়ার বশে। (২ পৃষ্ঠা-১০৬)।

মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রকাশই চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর মূল কথা। এই কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় কোন প্রাচীন পুরাণে নাই। তবে অনুমাণ হয় যে, বাঙ্গালা দেশে এই

www.pathagar.com

দেবমাহাত্ম্য-কাহিনী দুর্গাপূজা-অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল।...... পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-পাঞ্চালী গান ধর্মকাণ্ডের উৎসব -আমোদ প্রকরণের মধ্যে বড় ব্যাপার ছিল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে চৈতন্য যখন জন্ম লইলেন তখন নবদ্বীপ অঞ্চলের লোকে রাত জাগিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান শুনিয়া (ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে, মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে) মনে করিত খুব ধর্মকর্ম করা গেল। (১ পৃষ্ঠা-৪৭ ও ৪৬)।

চণ্ডী মঙ্গলে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে ব্যাধ বা পশু শিকারী কালকেতুর রাজ্য লাভ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধনপতি নামক একজন বণিকের বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের কাহিনী।

কালকেতু একজন ব্যাধ, কলিঙ্গের বনে পশু পাখী শিকার করা তার পেশা। স্ত্রী ফুল্লরা পশু মাংস, চামড়া বিক্রি করে। কলিঙ্গের রাজা বিক্রম কেশরী চণ্ডী ভক্ত। দেবী চণ্ডী মর্তলোকে পূজা লাভের উদ্দেশ্যে রাজাকে দিয়ে কলিঙ্গের বনে, কংস নদীর তীরে মন্দির নির্মাণ করান। দেবী চণ্ডী তার বাহণ সিংহকে পশুর রাজা করে পশুদের অভয় দেন। কিন্তু ব্যাধ কালকেতুর হাতে পশু নিধন অব্যাহত থাকায় পশুরা দেবীর কৃপা ভিক্ষা করে। দেবী কালকেতুকে রাজা করে পশুহত্যা থেকে বিরত করার সিদ্ধান্ত নেন। দেবীর মায়ায় কালকেতু মৃগয়ায় গিয়ে দুতিন দিন খালি হাতে ফিরেন। একদিন কিছু না পেয়ে একটি সোনা রঙ এর ছোট গোসাপ ধরে আনেন। বাড়ী পৌছে ফুল্লরাকে ঘরে না দেখে গোসাপটিকে খুঁটিতে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে খুঁজতে বের হন। এদিকে ফুল্লরা সখী বাড়ী থেকে ফিরে একটি সুন্দরী মেয়েকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে, সে কুলীনের মেয়ে। বৃদ্ধ স্বামীর ঘরে সতীনের যাতনায় গৃহত্যাগ করে বনে বনে ঘুরছিল। ব্যাধ কালকেতু তাকে নিজ ঘরে এনেছে। ফুল্লরা তখন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে স্বামীর ঘর যতই মন্দ হোক, স্বামীই পত্নীর একমাত্র গতি। স্বামী ত্যাগিনীর ইহলোক পরলোক কিছুই নেই। বলল 'সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড় কেনি?' 'তাতেও ফল না হওয়ায় ফুল্লরার দুঃখের কাহিনী বলল। তাতেও মেয়েটি নিশ্চুপ থাকায় স্বামীর উপর রাগ করে সে ব্যাধকে খুঁজতে বের হল। কালকেতু ঘটনা শুনে ঘরে ফিরে মেয়েটিকে দেখে বিস্মিত হল। সীতার উদাহরণ দিয়ে সে মেয়েটিকে বলল, তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, তোমাকে উপদেশ দেয়া আমার সাজেনা। পুরাতন বস্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলল, অবলা জনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে। তাতেও মেয়েটি অনড় থাকায় কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মারার জন্য ধনুকে তীর জুড়ল। কিন্তু মেয়েটির দৃষ্টিতে তার হাত স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন মেয়েটি নিজরূপ প্রকাশ করে কালকেতুকে একটি আংটি দিল। কালকেতু আংটিটি বিক্রি করে কলিঙ্গের বনে নতুন রাজ্য পত্তন করল। কিন্তু নতুন গুজরাট রাজ্যে জনবসতি হচ্ছে না দেখে দেবীর কৃপা প্রার্থনা করল। অতঃপর দেবী কলিঙ্গে বানভাসির সৃষ্টি করলে গৃহহারা অনেক লোক এসে নতুন রাজ্যে বসতি স্থাপন করল। এদের মধ্যে ভাল লোক যেমনি ছিল ঠিক তেমনি

www.pathagar.com

খারাপ লোকও ছিল। ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন অসৎ লোক কালকেতুর অনুগ্রহ লাভ করে নতুন রাজ্যের প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার শুরু করে। টের পেয়ে কালকেতু তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে কলিঙ্গের রাজা বিক্রম কেশরীকে দিয়ে গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করায়। যুদ্ধে কালকেতু পরিশ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় আত্মগোপন করে। ভাঁড়ুদত্ত ছলনা করে ফুল্লরার কাছ থেকে গোপন স্থান জেনে নিয়ে তাকে ধরিয়ে দেয়। বিক্রম কেশরী তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারে কালকেতু চণ্ডীকে স্মরণ করলে দেবী রাজা বিক্রম কেশরীকে ভয় দেখালে তিনি কালকেতুকে মুক্তি দেন। অতঃপর কালকেতু সুখে রাজত্ব করেন এবং আয়ু শেষে ব্যাধ দম্পতির মৃত্যু ঘটে। এটি মঙ্গল চণ্ডী কাব্যের প্রথম উপাখ্যান।

দ্বিতীয় উপাখ্যান হচ্ছে, গাঙ্গুর নদীর তীরে উজানী নগরে ধনপতি নামে একজন ধনী বণিক ছিলেন। তার স্ত্রী লহলার কোন সন্তান না হওয়ায় ধনপতি লহনার খড়তুতো বোন খুল্লনাকে বিয়ে করে। এতে লহনা ক্ষিপ্ত হয়। বিয়ের অল্পকাল পরই ধনপতিকে বিদেশ যেতে হয়। এক সময় লহনা দাসী দুর্বলা ও সখী লীলাবতির পরামর্শে সপত্নী খুল্লনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে বাধ্য করে। একদিন বনমধ্যে একটি ছাগল হারিয়ে গেলে সপত্নীর গঞ্জণার ভয়ে খুল্লনা হন্যে হয়ে ছাগল খুঁজতে থাকে। এই সময় সে দেখতে পায় যে, কয়েকটি মেয়ে ঘটপেতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করছে। খুল্লানাও তখন মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে। ফলে সে হারানো ছাগলটি ফিরে পায়। পরে ধনপতি দেশে ফিরে এলে তাকে বলা হয় যে, খুল্লনা একাএকি বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে বিধায় তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ আছে। খুল্লনা নানা পরীক্ষা দিয়ে তার সতীত্ব প্রমাণ করে। এই সময় সন্তান সম্ভবা খুল্লনাকে ঘরে রেখে ধনপতিকে সিংহল যাত্রা করতে হয়। যাত্রাকালে শিবভক্ত ধনপতি খুল্লনাকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে দেখে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে দেয়। এতে দেবী ক্রুদ্ধ হয়। ধনপতির বাণিজ্য তরীগুলি অজয় ও ভাগিরথী পার হয়ে সমুদ্রে পড়ে সিংহলের কাছাকাছি পৌছলে সমুদ্র গর্ভে কালিদহে একটি অপূর্ব দৃশ্য ধনপতির চোখে পড়ে। সে দেখতে পায় যে, একটি সুন্দরী কন্যা একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসিয়া একটি হাতীকে একবার গিলে আবার উদগীরণ করে। সিংহল পৌছে একদিন ধনপতি এই দৃশ্যের কথা রাজাকে বলে ফেলে। রাজা বিশ্বাস না করায় আমরন কারাবাসের অঙ্গীকারে রাজাকে দৃশ্য দেখাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কারারুদ্ধ হয়। এদিকে স্ত্রী খুল্লনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলে তার নাম রাখা হয় শ্রীপতি। শ্রীপতি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। তাকে এক ব্রাহ্মণের কাছে শিক্ষা নিতে দেয়া হয়। চঞ্চল বালকটি ছিল তার্কিক। একদিন গুরুর সাথে পুরাণের কথা আলোচনা কালে বালক শ্রীপতি ব্রাহ্মণ জাতি সম্পর্কে কটাক্ষ করে। তাতে ব্রাহ্মণ গুরু তাকে জারজ বলে ইঙ্গিত করে। এতে সে পিতার সন্ধানে সমুদ্র যাত্রার প্রতিজ্ঞা করে। নিরুপায় হয়ে মা খুল্লনা তাকে সমুদ্র যাত্রার অনুমতি দেয়। সেও কালিদহে পৌছে পিতার মতো অনুরূপ দৃশ্য দেখে এবং সিংহল রাজকে মৃত্যুদন্ড গ্রহণের অঙ্গীকারে সে দৃশ্য দেখাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুদন্ডের প্রহর গুণতে থাকে। এদিকে স্বামীপুত্রের জন্য

www.pathagar.com

ব্যাকুল খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থণা করতে থাকে। তার প্রার্থণায় চন্ডী সন্তুষ্ট হয় এবং দেবী শ্রীপতির অতিবৃদ্ধ পিতামহীর রূপ ধরে প্রথমে কোটালের কাছে এবং পরে রাজার কাছে গিয়ে শ্রীপতির প্রাণ ভিক্ষা করে। কিন্তু রাজা সম্মত না হওয়ায় দেবীর আদেশে ভূত প্রেত পিশাচ সৈন্যরা রাজ্য আক্রমণ করে। রাজসৈন্যদল পরাজিত হয়। রাজা ভয়ে শ্রীপতিকে মুক্তি দেন। শ্রীপতি কারাগারে গিয়ে পিতাকে মুক্ত করে। তখন রাজা দেবীর প্রসন্নতা প্রার্থনা করলে দেবী রাজকন্যা সুশীলাকে শ্রীপতির কাছে বিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। অতঃপর ধনপতি পুত্র, পুত্র বধু ও ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরেন এবং সুখে দিন যাপন করেন। এটি হচ্ছে চণ্ডী মঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনী।

উপাখ্যান দুইটির উৎপত্তি এক নয়। কালকেতুর কাহিনী আসিয়াছে বাঙ্গালা দেশের জঙ্গলপ্রত্যন্তের প্রাচীন কিংবদন্তীহইতে। ......কালকেতুকে বরদানকারিণী দেবী পৌরাণিক মহিষমর্দিনীর রূপ ধরিয়াছেন, কিন্তু আসলে তিনি পশুমাতা বনদেবী বিন্ধ্যবাসিনী। ঋগ্‌বেদে ইঁহাকে বহু-অন্নদাত্রী মৃগমাতা অরণ্যানী বলা হইয়াছে। মনে হয়, এই কাহিণীর মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের অরণ্য অঞ্চলে বসতিস্থাপনের ও বনদেবীপূজা-প্রচলনের ইতিহাস লুকানো আছে।....

ধনপতির কাহিনী আসলে মেয়েলি ব্রতকথা ও রূপকথার ধরণে গড়া, অনেকটা মনসামঙ্গল-কাহিনীরই মত। দেবী প্রথমে বণিক-গৃহিনীর পূজা পাইয়া, তাহার পর জবরদস্তি করিয়া গৃহপতির নতি আদায় করিয়াছেন।..... (১ পৃষ্ঠা-৫২)।

কবিচন্দ্র শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্রের গৌরীমঙ্গল আসলে চন্ডীমঙ্গল কাব্য। এই কাব্য সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম রচয়িতা ছিলেন মাণিক দত্ত।..... তাঁর পরের কবি হলেন মাধবাচার্য।.......কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। (২ পৃষ্ঠা-১০৭/১০৮)। মুকুন্দরাম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি (১ পৃষ্ঠা-৫৩)।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন একদিকে পাঠান-শক্তির অস্তগমন অপরদিকে মোগল শক্তির উদগমন, তখন পশ্চিম বঙ্গে যে রাষ্ট্র সংকট ও আর্থিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহার জলন্ত বর্ণনা মুকুন্দ রামের আত্মকাহিনীতে পাই। রাষ্ট্র বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া মুকুন্দরাম সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার বর্ণনায় ভূক্ত ভোগীর তপ্ত বেদনা স্পন্দমান। তিনি বলেছেন,

ভাই নহে উপযুক্ত রাম রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা
লইয়া আপন ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।
(১ পৃষ্ঠা-৫৪ /৫৫)।

www.pathagar.com

আবড়া গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায় এবং তাঁরপুত্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের শিষ্য (ছাত্র) রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন।

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে কালকেতুর শিকারের দাপটে কলিঙ্গ বনের পশুরাজ সিংহ, ভালুক, হাতী, হরিণ প্রভৃতির বর্ণনা বিশেষ করে হস্তিনীর কিলাপ বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ-

শ্যামল সুন্দর প্রভু কমললোচন
ভুরু কামধনু সম মদনমোহন।
কাননে করয়ে আলো কপালের চাঁদে
সঙরি সঙরি তনু প্রাণ মোর কান্দে।
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর
লুকাইতে স্থান নাহি বীরের গোচর।
পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি।
....

হরিণের বিপদ সম্পর্কে বলেছেন

বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান।
কেনে হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে
হইনু আপন বৈরী আপনার মাংসে।

মুকুন্দরাম যেন আপনার জীবনের নিষ্টুর অভিজ্ঞতাই পশুবাণীরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এমনি সহৃদয় মানবিকতায় কাব্যটি আকীর্ন। (১ পৃষ্ঠা-৫৭)।

মুকুন্দরাম মধ্যযুগের কবি। বাঙ্গালীর পল্লী সভ্যতার কবি। মধ্যযুগের কাব্য হচ্ছে মঙ্গলকাব্য, অলৌকিতার রাজ্য সর্বত্র। মুকুন্দ রামেরও সেই অলৌকিক রসে বিরাগ নেই। সিংহলে বাণিজ্য-পথে কল্পনার কত সমুদ্র পেরিয়ে যায় বণিকের ডিঙ্গা। কিন্তু যাত্রা তার অজয় থেকে ভাগীরথী দিয়ে। আদি গঙ্গার মরাখাতের ধারে দক্ষিণ বাংলার যেসব পুরানো বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও নগর আজও স্বপ্নের মতো দাড়িয়ে আছে, একটি একটি করে কবিকঙ্কণ তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। উল্লেখ করেছেন তিনি বাঙাল মাঝিদের ঝড়ের ভয়ে খেদ; উল্লেখ করেছেন তিনি পর্তুগীজ হার্মাদদের কথা, বাঙালীর চিরপ্রিয় আহর্যাদির কথা। বাস্তব জীবন রসেই তাঁর সত্যকার আনন্দ। কালকেতু ব্যাধ পত্তন করেছে গুজরাতে নতুন রাজ্য ও রাজধানী। কবি কঙ্কণের বিশ্বস্ত বর্ণনায় মনে হয় দেখছি যেন বাঙালীর ইতিহাসের একটি সজীব পাতা। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর এমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আর নেই। কিছুই কবির চোখ এড়ায়নি, অরাজকতার দিনে জুলুম করে জমির 'পনের কাঠায় কুড়া' মাপা হয়, 'খিল ভূমি করে লাল;' জোতদার 'তঙ্কায় আড়াই আনা কম' দেয়; মহাজনের অত্যাচারের শেষ নেই; কোটাল 'কড়ির কারণে বহু মারে, প্রজা যখন সব বিক্রি করছে-'ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে-টাকার জিনিস তখন আবার দশ আনায় বিকোয় অথচ গ্রাম ত্যাগ করে পালাবারও পথ সহজে পায় না মানুষ। .....

www.pathagar.com

শুধু তথ্যনিষ্ঠা নয়, ভাবে ও ভাষায় এ কাব্যে (মুকুন্দ রামের কাব্যে) আছে একটা অসাধারণ স্পষ্টতা, যে স্পষ্টতা ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকদের রচনারীতিতে দুর্লভ বস্তু; যাকে বলা যায় ক্লাসিক-ধর্ম, তথ্য নিষ্ঠা, ভাব ও ভাষায় সংযম, আত্মস্থতা।....যতটুকু বাস্তব-নিষ্ঠা, মানব-চরিত্র-বোধ মানবতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে আমরা পাই, সে যুগের তুলনায় তা একটা অপরিমিত বিস্ময়........ বাঙলা সাহিত্যে তিনি স্ফুটনোন্মুখ মানবতার প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি ।...... তাই তিনিও চণ্ডীদাসের মতো উপলব্দী করেছিলেনঃ--

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।
(২ পৃষ্ঠা-১১২/১১৩)।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্বপ্রথম কামেশ্বর শিবের মন্দিরে গাওয়া হইয়াছিল এবং মুল গায়েন ছিলেন প্রসাদ। (১ পৃষ্ঠা-৫৬)।

এছাড়া জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন, রামদেব, অকিঞ্চণ মিশ্র (চক্রবর্তী), দ্বিজ হরিরাম, দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ কমল লোচন, দ্বিজমাধব প্রমুখ বহু কবি মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল, মঙ্গল চণ্ডী পাঁচালী, মঙ্গল চণ্ডী-ব্রতকথা রচনা করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল প্রভৃতি বহুল প্রচারিত ও আচরিত কাব্য। এর পরে রয়েছে ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, গাজী মঙ্গল, শিব মঙ্গল, লক্ষী মঙ্গল, স্বরস্বতি মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গা মঙ্গল, ষষ্টী মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, কমলা মঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, অভয়া মঙ্গল প্রভৃতি।

ধর্ম মঙ্গল

ধর্মমঙ্গল বাংলা সাহিত্যে মনসা ও চন্ডীর মত বহুল প্রচারিত ও আচরিত না হলেও এটিও একটি প্রাচীন মঙ্গল কাব্য। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল।..... এই কাব্য (ধর্মমঙ্গল) ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অভিসন্ধিৎসু পাঠক ইহার গোড়ায় ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধ ধর্মের লুক্কায়িত ছায়া আবিস্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহনাই।..... শ্রীধর্মমঙ্গল মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দু পুরোহিতগণের কক্ষ তল হইতে এই পুথি স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই, তবে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন। (১২ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-৪৭৩ ও ৪৮২)।

অনেকে মনে করেন যে, ময়ুর ভট্টই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি। সাহিত্য হিসাবে ধর্মপূজা বিধানগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই।..... (কিন্তু) ধর্ম ঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশে কতকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। একদা ধর্মদেবতার

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান বাঙ্গালার বাহিরে, বিহারে এবং উত্তর প্রদেশে অজ্ঞাত ছিলনা। ....সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ধর্ম দেবতার পুজা কেবল রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া দ্বারকেশ্বর-দামোদর ও অজয় নদের মধ্যবর্তী ভূভাগে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।....ধর্মমঙ্গলের কাহিনী খুব প্রাচীন।.....অনেকে মনে করেন যে, খেলারাম চক্রবর্তী নামে এক কবি ধর্মমঙ্গল লিখিয়া ছিলেন এবং তাঁহার কাব্যই প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল।.... (কিন্তু) সকল ধর্মমঙ্গলকাব্যেই ময়ুরভট্টকে ধর্মের গানের আদি কবি বলা হইয়াছে।
(১ পৃষ্ঠা-১১২, ১০২ ও ১১৭)।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন যে, কবি ময়ুর ভট্টের কাব্যের একটি অংশ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীধর্মপুরাণ নাম দিয়ে প্রকাশিত কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসনের পুত্র লাউসেনই এই ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক। ময়ুর ভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেন স্থাপিত ধর্মমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন।......সুতরাং তিনি (ময়ুর ভট্ট) একাদশ শতাব্দীর লোক...। (১২ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৫ ফুটনেট)।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন বলা হয়েছে চর্যাপদকে (দশম শতাব্দী) এবং দ্বিতীয় রচনা হচ্ছে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (চর্তুদশ শতাব্দী)। সুতরাং ময়ুর ভট্টের রচনা আদি রচনা হিসেবে স্বীকৃত নয়। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, '..... ময়ুর ভট্টের ধর্মমঙ্গল বা ধর্ম পুরাণ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন খাঁটি কথা বলিবার উপায় নাই। মনে হয়, সংস্কৃত সূর্যশতকের কবি ময়ুর ভট্টই ইনি। (১ পৃষ্ঠা-১১৭)।
খেলারাম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তিনি লিখেছেন,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলরাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।।

ভুবন=১২, বায়ু=৪৯, শরের বাহন ধনু=কার্তিক মাস। সুতরাং গ্রন্থ রচনা কাল ১৪৪৯ শক বা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ।
কবি লিখেছেন-

হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়।।

....
স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে জলে।।
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলদল।
বিকাশিয়া ভুষে তার নীল উরঃস্থল।।

www.pathagar.com

শুণ বাছা লাউসেন বলিরে তোমায়,
এওজাৎ দিও, নেড়া দেউল তলায়।।
(১২ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-৪৭৪)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে খেলারাম নামক ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে হারাধন দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ বসু-এই দুইজন মাত্র লোকের সাক্ষ্যের উপর। ডঃ সুকুমার সেন রচিত বাংলা সাহিত্যের কথা'র ৪র্থ সংস্করণ (পৃষ্ঠা-৮৫) থেকে জানা যায় যে, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মন্ডল মহোদয় খেলারামের বাসভূমি বলে পরিচিত পশ্চিমপাড়া গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধের মুখে এই দুটি ছত্র শুনেছিলেন,

খেলারাম চক্রবর্তী শণ কাটিছেন বসে।
ধর্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগী বেসে।।

এই দুই ছত্র কিন্তু রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত ছড়ার মধ্যেও পাওয়া যায়;

নিধিরাম চক্রবর্তী শণ কাটিছেন বসে।
খেলারাম ভট্টাচার্য্য উত্তরিলা এসে।।

হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি খেলারামের রচনার নিদর্শন স্বরূপ যে ছত্রগুলি উল্লেখ করেছেন তার ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর হতে পারে না। (১৩ পৃষ্ঠা-২৪৯-২৫০)।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত যদুনাথের ধর্মপুরানের একটি ভনিতায় আছে-

বন্দিয়া পন্ডিত রাম যদুনাথ ভনে।
খেলারামে ধর্মরাজ রাখিবে কল্যাণে।।
(ঐ পৃষ্ঠা-২৫০)।

১৬৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে রচিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পুথিতে গায়ন হিসেবে জনৈক খেলারামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খেলারাম গাএন করিল বহু হিত।
হাতে যন্ত্র দিঞা শিখাইল নাটগীত।।
ধর্মের চরণে মাগিঞা নিএ বর।
খেলারামের কল্যাণ করিবে মায়াধর।।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়।
হরিধ্বনী বল সভে পালা হল্য সায়।।
(১৮ পৃষ্ঠা-১৫৩)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় নির্ণীত ১৬১৪ শক বা ১৬৯২ খৃষ্টাব্দেই খেলারাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। (৩ পৃষ্ঠা-২৫৬)।

যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধর্মমঙ্গলকার, তাঁদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী অন্যতম। এই রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছেন একটি দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মধ্যদিয়ে। হেঁয়ালিটি হচ্ছে,

www.pathagar.com

শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।।
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখা কর‍্যা নেহ।।
(১৪ ভূমিকা পৃষ্ঠা-দ/.)।

এই হেঁলিটি বিভিন্ন পন্ডিত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় প্রথমবার পেয়েছিলেন ১৫২৬ শক বা ১৬০৪-৫ খৃষ্টাব্দ, দ্বিতীয় বার ১৫৮৬ শক বা ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দ, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী পেয়েছেন ১৫১২ শক বা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন ১৬৬১ শক বা ১৭১৯-২০ খৃষ্টাব্দ, ডঃ সুকুমার সেন পেয়েছেন ১৫৭১ বা ১৫৭২ শক অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ বা ১৬৫০-৫১ খৃষ্টাব্দ।

আমাদের বিবেচনায় এই ভাবে হোঁয়ালিটির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা হেঁয়ালিটি বাদ দিয়ে অন্যভাবে রূপরামের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব।...... ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মন্ডল দেখিয়েছেন, একটি পুথিতে রূপরামের আত্মকাহিনীর শেষাংশে একটি ছত্র আছে,

রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা।।
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর।।
(১৫ পৃষ্ঠা-৫১৯)

অক্ষয় কুমার কয়াল সংগৃহীত একটি পুঁথিতে এই তিনটি ছত্র আছে,

রাজমহলের অঙ্কে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে তার বৈসে যত প্রজা।।
সেই হৈতে গীত গাই আসর ভিতর।।
(১৬ পৃষ্ঠা-৯)

আচার্য যদুনাথ সরকারের History of Aurangzib ও History of Bengal, Vol-II থেকে জানা যায় যে, শাহজাহানের ছেলে শুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ অবধি রাজমহল থেকে বাংলা শাসন করেছিলেন। সুতরাং উপরে উধৃত শ্লোক গুলি থেকে রূপরামের সময় নিশ্চিত ভাবেই জানা যাচ্ছে। শুজা যখন রাজমহলে ছিলেন সেই সময় থেকে কবি ধর্মের গান গাইতে শুরু করেন। (১৩ পৃষ্ঠা-২০২)।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত পুথি থেকে রূপরামের আত্মকাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছে এভাবেঃ-

দীঘলনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতীঘরে ধর্ম বড় পথেতে শুনিল।।
ধাওাধাই তাঁতীঘরে দিল দরশন।

www.pathagar.com

চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন।।
মনে হল্য পরিপূর্ন খাব চিড়া দই।
তাঁতীঘরে ধর্মঠাকুর নাঞি দিল খই।।
দক্ষিণা আনিয়া দিল দশ গন্ডা কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কাণা ডেড় বুড়ি।।
পাঁচদিন উপবাসে দৈবের ঘটন।
বাহাদুর এড়ানে দিলাম দরশন।।
গোওালাভূমের রাজা গণেশ তার নাম।
রিপুকুলচড়ামনি বড় ভাগ্যবান।।
তারে গিয়া সপনে কহিলা মায়াধর।
প্রভাতে গিয়া ভুপতি দিলা মন্দির চামর।।
সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে।
অদ্যাবধি পুথি তোলা রহিলেন ঘরে।
(১৭ পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬)।

আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, ধর্ম ঠাকুরের কাছে ধর্মমঙ্গল গাওয়ার আদেশ পাবার পর রূপরাম গোপভূমের রাজা গণেশ রায়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে চামর ও মন্দিরা পেয়ে সর্বপ্রথম ধর্মের গান করেছিলেন (১৮ পৃষ্ঠা-২০২-৩)।

বস্তুতঃ রূপরামের কাব্য থেকে একটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে যে শুজার সময় বাংলার মানুষ শান্তিতে ছিল।

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল হেঁয়ালিটি প্রাচীন গোরক্ষ বিজয় কবিদের নব সংস্করণ মাত্র।.............

.....কদলীপাটনেব স্ফুরন্তযৌবনা সুন্দরীগণ যখন একসঙ্গে বিলোল কটাক্ষে কামকলাপূর্ণ ভঙ্গিতে জ্ঞানের গৌরিশ্বর, সাধনার সমুদ্র, যোগী পুরুষ মীননাথ সাধুর ধ্যাণভঙ্গ করে তাঁকে মীনের ন্যায় জালে আবদ্ধ করেন তখন তাঁরই শিষ্য গোরক্ষনাথ প্রহেলিকাময় কবিতায় গুরুর চৈতন্য সঞ্চার করেন। সহদেবের প্রহেলিকাময় কবিতায় রয়েছে-

গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে, সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়।।
গুরুহে, বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে।।
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্মমন্ডিত করিয়া
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।।
শিলা নোড়াতে কোন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে।

চালের কুমুড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে।।
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল
ছেলে চায় পায়রার দুধ।।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু
কাঁকড়া ধরিল কাঁচি।
মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল,
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি।
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল,
মাঝে মাঝে উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে, জলবিন্দু নাই,
ডুবিল দেউল চূড়া।।
বাঘে বলদে, হাল জুড়িনু,
কর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর, হুড়া ঝাড়ি গেল,
মুষিকে বুনিল ধান।।
তালের গাছে শোলের পানা,
সায়চান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে, কই মৎস্য মুড়লি,
পঙ্গু পলই লয়া যায়।।
মধ্যসমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু,
সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গন্ডার ডরায়ে মৈল,
হরিণী পালায় লাখে লাখ।।
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু,
আঁধার হইল পুরী।
সহেদেব গায়, ভাবি কালুরায়,
শরীর বর্ণন চাতুরী।।
(১২ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-৪৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৫)

সহদেবের গ্রাম্য ভাষায় রচিত এই হেঁয়ালিতে সুন্দরীদের বিলোল কটাক্ষের কামপূর্ণ ভঙ্গিতে ধ্যাণভঙ্গ মীননাথকে উদ্ধার করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর ভক্তিসূচক পদ মর্মস্পর্শী। যেমন-

শরণ লইনু, জগৎ জননী ও রাঙ্গাচরণে তোর।
ভব জলধিতে, অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর।।
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু, দোষ করে যবে, রোষ না করয়ে মায়।।

www.pathagar.com

যদিবা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়।।
হরিহর ব্রহ্মা, যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি।
বিপদ সাগরে, তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি। (১২-২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৪৮২)।

এ ছাড়া মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারাম দাস, অযোধ্যারাম চক্রবর্তী, নারায়ণ পন্ডিত, রামদাস আদক প্রমুখ বহুসংখ্যক কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন। অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মমঙ্গল মনসা বা চন্ডী মঙ্গলের মত বহুল আচরিত মঙ্গল কাব্য নয়। তবে সব কটি কাব্যের ভাষাই খাঁটি বাংলা।

মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল পৌরাণিক, অপৌরাণিক (লৌকিক) ও স্থানীয় দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ বাঙালী লেখকেরাই পৌরাণিক-অপৌরাণিক (লৌকিক) ও স্থানীয় দেবদেবীকে বাঙলার লোকসমাজে জনপ্রিয় করে তুলে ছিলেন পূজা অর্চা প্রচলনের পথ প্রদর্শন করে।

বাঙালী লেখকদের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাস মঙ্গল কাব্যের প্রথম লেখক না হলেও পথ প্রদর্শক। তিনি একা পাঁচখানি মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল।
(৩ পৃষ্ঠা-৩০৬/৩০৭)।

রায়মঙ্গল ও গাজীমঙ্গল

বাঙলা হচ্ছে নদী-নালা-খাল-বিল পূর্ণ, ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা, ঘূর্নিবাত্যা-কাল-বোশেখী-টর্নেডো ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস তথা নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপদ্রুত দেশ। বৃষ্টি বহুলতার কারণে জলাভূমির দেশ, জঙ্গলাকীর্ণ স্থলভূমির দেশ। অনাবৃষ্টির কারণে খরার দেশ, প্রকৃতির খেয়ালীপণার ফলে মহামারারী দেশ। বস্তুতঃ বাঙলা একটি বিপর্যস্ত ভূখন্ড। অতীতেও বাঙলার প্রকৃতি এরূপ ছিল। তাই একদা এই অঞ্চলে বহিরাগতরা এলেও বসতি স্থাপনে উৎসাহী হতনা মৃত্যু ভয়ে। তবে দুঃসাহসীরা বসতি স্থাপন করত সহজে সম্পদশালী হবার লোভে। তুর্কী বিজয়ের পর অবশ্য বিদেশাগতরা, বিজয়ীরা এই ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করে এবং এই ভূখন্ডকে নিজ মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে বাঙলায় বিদেশী আগমন এবং বসতিস্থাপন বাড়তে থাকে। ভাগ্যান্বেষীরা, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোক এবং বিদেশীরা বাঙলায় আসতে শুরু করে। বাংলায় বসতি স্থাপন করে তুর্কী, আফগান, মোগল, ইরানী, আরব, হাবসী প্রভৃতি নানা গোত্রের লোক।

বাঙলা নদী মাতৃক দেশ। জোয়ার ভাটায় নদী পলি ফেলে। ফলে নতুন ভূখন্ডের সৃষ্টি হয়। গঙ্গা নদীর পলীতে বাঙলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে সৃষ্টি হয়েছে বন, সুন্দরবন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এক সময় মানুষ এই বন কেটে অবাদ করতে ও বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু এই বনে ছিল ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমিরের ভয়। এই কারণে

www.pathagar.com

চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর, খুলনা, যশোর ও নোয়াখালীর কিয়দংশে সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন কারীরা বাঘ ও কুমিরকে দেবতা বলে মানতে শুরু করে। কারণ মানুষ এককালে ছিল জড়োপাসক, অতিপ্রাকৃতকে সে ভয় করত, ভয়ে ভক্তি করত। বাঙালীর কাছে দেবতা দুই প্রকারের, ভক্তির দেবতা ও ভয়ের দেবতা। সাপ, বাঘ ও কুমির হচ্ছে বাঙালীর কল্পনায়, বাঙালী লেখকের ভাষায় মনসা, দক্ষিণ রায় ও কালু রায়ের বাহন। তাই বাঙালী এই তিন দেবতার পূজা করে। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে বসতিস্থাপনকারী মুসলমানেরা মনে করে বাঘ হচ্ছে বড়খাঁগাজী বা গাজী পীরের বাহন। তাই তারা দক্ষিণ রায় নয়, গাজী পীরকে ভক্তি করে। বস্তুতঃ সুন্দরবন এলাকায় স্থানীয় দেবতাপূজা বা পীর ভক্তি প্রচলিত হয় বহুদিন আগে।

বস্তুতঃ আলোচ্য অঞ্চলে বাঘ ও কুমিরের ভয়ে প্রচলিত হয়েছিল দক্ষিণ রায় ও কালু রায় এর পূজা, বড়খাঁ গাজী বা গাজী পীরের ভক্তি।

চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অংশে অনেক গ্রামেই দক্ষিণ রায়ের স্থান আছে (৩ পৃষ্ঠা-৩১৮)।

সাধারণতঃ বনাঞ্চলের মউল্যা, মলঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী, বুনো, নৌজীবী প্রভৃতি লোকেই ইঁহার পূজা (দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বড় খাঁ গাজী) করে। ইঁহার পূজাবিধিও বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরাও ইঁহাকে পীরগাজীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা দেয়।..... সভ্য গ্রামের মধ্যেও দক্ষিণ রায় দেবতার কোথাও কোথাও মন্দির আছে। কিন্তু সাধারণতঃ বৃহৎ প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, নিম্বাদি বৃক্ষ তলেই তাঁহার আশ্রম। কোথাও মাটির ঢিবি, কোথাও সিন্দুর মন্ডিত প্রস্তর খন্ড, কোথাও বা দেবতার কল্পিত মুণ্ডমাত্র প্রতিমারূপে স্থাপিত। সুন্দর বনের প্রত্যেক নদী ও খালের তীরবর্তী প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বৃক্ষতলেই এই দেবতার পূজা হয়। অনেক স্থলে বৃক্ষের শাখার উপরও দেবতার মুণ্ডমাত্র প্রতিষ্ঠিত আছে।....দক্ষিণ রায় দেবতা মনুষ্যাকার, বলিষ্ঠদেহ, মহিষাসুরের ন্যায় দাঁত খামটি মারা, সিপাহী বেশী, ব্যাঘ্র বাহন। পৌষ সংক্রান্তির দিন ইহার বিশেষ পূজা হয়। নতুবা প্রয়োজন মত, মানসিক মত, যখন ইচ্ছা পূজা হইয়া থাকে।.....কোন কোন স্থলে দক্ষিণরায় একাকী পূজিত হয় না, কালুরায় নামে কুম্ভীরারোহী আর এক বীর দেবতার মুর্তি (মুন্ডমাত্র) পূজিত হয়। (৬ পৃষ্ঠা-২২৭/২২৮)।

কৃষ্ণ রাম দাসের রায়মঙ্গল বহুল প্রচারিত মঙ্গলকাব্য। রায় মঙ্গল তাঁর তৃতীয় মঙ্গলকাব্য। তিনি এই কাব্য কাহিনার প্রথম রচয়িতা নন। কারণ তিনি বলেছেন, 'পূর্বে করিল গীত মাধব আচার্য (৩ পৃষ্ঠা-৩১৪)।

রায় মঙ্গল কাব্য কাহিনী অনেকটা চন্ডী মঙ্গল কাব্যের মত। কাহিনী এরূপঃ-বড়দহের (বরদা পরগনার) সদাগর দেবদত্ত সূদুর তুরঙ্গ শহরে বাণিজ্য যাত্রা করিয়াছিল। চন্ডীমঙ্গল-

www.pathagar.com

কাহিনীর ধনপতি যেমন কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিল দেবদত্তও তেমনি রাজদহে আশ্চর্য ব্যাপার-সাগর মধ্যে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি দেখিল।

সাগরের মাঝে পড়িল চর
কত মনোহর সোনার ঘর।
সিংহাসন মাঝে বসিলা নারায়ণ
সমুখে সকল কিঙ্করগণ।
বামে নীলাবতী (লীলাবতী) মুরতি জায়া
সকলি জানিবে দেবের মায়া।
ডাহিনে সুগ্রীব আদিক পায়
সমীরণ করে রায়ের গায়। ....

তুরঙ্গ শহরে পৌঁছিয়া দেবদত্ত এই অপূর্ব দৃশ্যের কথা সুরথ রাজাকে বলিল, কিন্তু দেখাইয়া প্রত্যয় জন্মাইতে না পারায় কারারুদ্ধ হইয়া রহিল। বহুদিন কাটিয়া গেলে দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার খোঁজে তুরঙ্গ-শহরে যাইতে প্রস্তুত হইয়া নৌকা গড়িবার জন্য রতাই বাউল্যাকে কাঠ কাটিয়া আনিতে আদেশ দিল।

ডিঙ্গা গঠাইব সাধু পাটন যাইতে
আদেশ করিয়া কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে।
চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই
লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই।

রতাই প্রভৃতি বউল্যারা বিস্তর কাঠ কাটিতে লাগিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের একটি বড় গাছ ছিল। সেই গাছ কাটায় অনুচরেরা (দক্ষিণরায়ের অনুচর) দক্ষিণরায়ের কছে আসিয়া নালিশ করিল। রায় এই ছয় বাঘকে প্রেরণ করিলেনঃ

মামুদা, কুমুদা শুদা বাঘ টঙ্গভাঙ্গা
বজ্রদন্ত খান দাউদা চক্ষু যার রাঙ্গা।

বাঘেরা রতাইয়ের ছয় ভাইকে মারিয়া ফেলিল। ভ্রাতৃশোকে রতাই আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণ রায় দৈববাণী দিলেনঃ-

আমি দক্ষিণের রায়　　　　সর্বলোকে গুণ গায়
আঠারো-ভাটীতে পূজে সভে
পুত্র দিয়া বলিদান　　　　পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে।

দৈববাণী শুনিয়া রতাই সেই স্থানেই দেবতার পূজা করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয়ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

রতাই ও তাহার পুত্র এবং ভাইয়েরা কাঠ লইয়া দেশে আসিল। কাঠ পাইয়া সদাগরপুত্র নতুন নৌকা গড়াইবার জন্য কারিগর আহবান করিয়া ঘোষণা দিল (চেঙ্গড়া ফিরাইল)।

www.pathagar.com

বিশ্বকর্মা ও হনুমান সে আহবানে সাড়া দিল এবং আসিয়া অবিলম্বে নৌকা গড়িতে লাগিয়া গেল। যে কাজ সাতশত কারিগর দুই তিন মাসের কমে সারিতে পারে না সে কাজ দুইজনে আধ রাত্রিতেই চুকাইয়া ফেলিল।

হনুমান মহাবীরে কাষ্ঠকত নখে চিরে
কিবা তার কিসের করাতে
বিশ্বকর্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আঁটে
সাত ডিঙ্গা হৈল দণ্ড সাতে।............
তিলেকে সকল হয় গঠিলে কামনাচয়
কতগাছ লোহার শিকলে
তবে বীর হনুমান লইয়া তরী সাতখান
জলে রাখে বড় কুতূহলে।

নৌকা দেখিয়া খুসি হইয়া পুষ্পদত্ত পিতার অন্বেষণে বিদেশ গমনের অনুমতি আনিতে রাজার কাছে গেল।

শিশু অতি মনোহর দয়াল নৃপতিবর
বসাইয়া আপনার পাশে
রূপ জিনি রতিনাথ দেহে বুলাইল হাত
আগমন কি হেতু জিজ্ঞাসে।
শুনি বলে মহীপাল তুমি অতি ছাওয়াল
কেমনে এমন কথা কহ
মনে না ভাবিহ তাপ আসিবেক তোমার বাপ
স্থির হৈয়া নিজ ঘরে রহ।

পুষ্পদত্তের প্রার্থণায় রাজা সম্মতি দিলেন না। পুষ্পদত্ত বলিল, আমাকে যাইতে না দিলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। রাজা তখন মত দিয়া দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন।

পুষ্পদত্ত যথাসময়ে যাত্রা করিল। কতকদূর গিয়া বারাসত পার হইয়া তাহার সাত ডিঙ্গা খনিয়ায় পৌছিল। সেখানে দক্ষিণ রায়ের ঘর (পূজাস্থান) এবং তাহার অল্পদূরে গাজী পীরের মোকাম।

তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম
ফিরিয়া ফকির করে হাজৎ সেলাম।
হালআল মোরগ জবাই করে খাসি
মনোহর কুসুম সন্দেশ রাশি রাশি।
শিরনি অনেক দিলা সদাগর ভূপ
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল এহি অপরূপ।
মুরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি
পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবাদেবী।

www.pathagar.com

বাঘের উপরে নাগ্রি দক্ষিণের রায়
একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়।

কর্ণধার বলিল, দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর প্রথমে দোস্তানী ছিল। পরে অধিকার লইয়া বিরোধ বাধে। গাজী রায়ের মুণ্ড কাটিয়া ফেলে, রায়ও গাজীর বুকে শেল হানে। কিন্তু দুইজনের কেহই মরেনা। তাহার পর পরমেশ্বর আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দেন। কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গল পুথিতে বলেছেনঃ-

কাটামুন্ড বারা পূজা সেই হৈতে করে
কোনখানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে।
বড়-খাঁ গাজীর নামে যেখানে মোকাম
সেইখানে অধিষ্ঠান মৃত্তিকার ধাম।
ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে
এই ঘাটে চাপাইল বিধির ঘটনে।
দক্ষিণ রায়ের বারা দেখিলেক কূলে
হরবরপুত্র জানি পূজে গন্ধে ফুলে।..........
বড়খাঁ গাজীর পূজা না করিয়া যায়
অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায়।
কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগর সুত
ঢেকা দিয়া করিল তাহার ঘরে দূর।...........
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সভে
মুল্লুকের খবর না লও বাবা এবে।
পূজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড় এটা।
বাঙ্গালী গৌয়ার ভয়-নাহিক তিলেক
মারিয়া আমার ঘর খেদায়ে দিলেক।
দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়্যা
শুনিয়া তোমার নামে সবে দেয় তাড়্যা।
মহুল্যা মলঙ্গী আর বাউল্যার ঠাঁই
দোহাই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই।

সকলে রায়কে মানিতেছে-তাঁহাকে মানিতেছে না এবং তাঁহার বাঘদলের উপর রায়ের বাঘদল হামলা করিতেছে,-এই নালিশ শুনিয়া গাজী গোঁসায় আগুন হইয়া জেরালো হিন্দী বাত ছুটাইতে লাগিলেনঃ-

ভাগ গিয়া....এবে কিয়া কর আব
হোগা হারামজাদ খানে খারাব।
শোন্তে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী।

www.pathagar.com

আদিমীকু উপর রুক্কায় হররোজ গাটা
খাড়ায় মুলুক লৌটে বড়ি বড়ি পাট্টা।
কহো জাকে তিনকি মোকাম শিতাব করোকে ধোঁড়
উনকি মূরতি তোম সব ইতি বেড়ি তোড়।
একেতে ফকির রূঢ় আরে এই বোল
দড়বড় আসিয়া ভেজায় গন্ডগোল।

গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকিরেরা গিয়া রায়ের মূর্ত্তি ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল, পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া নাস্তানাবুদ করিল। সে পলাইয়া বাঁচিলঃ-

খাঁড়ির বাড়ীতে রায় লইয়া পরিবার
বটে বেনে আসিয়া কহিল সমাচার।

বেনের মুখে এই ঘটনা শুনিয়া রায় গাজীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বাঘদের জমায়েৎ হইতে হুকুম দিলেন। মন্ত্রী রায়কে বলিল, গাজী আপনার বন্ধু, হঠাৎ লোকের কথায় তাহার সহিত যুদ্ধ করা উচিৎ নয়। আগে বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া সংবাদ নেওয়া আবশ্যক। এ পরামর্শ রায়ের মনে ধরিল। দানা লোহাজঙ্গ দূত হইয়া গাজীর হুজুরে গেল। গিয়া সে দেখিল

গীরিদা হেলান গা — মউরপুচ্ছের বা
খাবাসে (চাকরে) তুলিয়া দেয় পান
মাথায় চিকন কালা — হাতে ছিলিমিলি মালা
গাজী পড়ে বসিয়া কোরান।

অবকাশ বুঝিয়া রায়ের দূত গাজীকে এই কথা নিবেদন করিলঃ-

(রায়) দোস্ত তোমার জানি — তবে তার ঘরখানি
ভাঙ্গিয়া ভাসাও কেন জলে।.........
কেহ টুটা নয় বটে — কি কাজ মিছা হটে
পীরিত উচিৎ এই ভালে।

লোহাজঙ্গের কথা শুনিয়া

কোপে কহেন গাজী — কাঁহাকা আম্বক পাজি
জঙ্গুলী হয়েগা মহাদাপ
হররোজ চালু কেলা — সাড়ে পাঁচ খায় ডালা
গোসাঞী আপকি কহে আপ।.....(নিজেকে ঠাকুর বলিয়া জাহির করে)।

লোহাজঙ্গ চলিয়া গেলে গাজী ভাবনায় পড়িলেন। তিনি বাঘদের হাজির হইতে তলব করিলেন। নানাস্থান হইতে নানা জাতির বাঘ আসিয়া হাজির হইল।.....দক্ষিণরায়ও আপন বাঘদের তলব করিলেন।......দুইদলে যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু জয়পরাজয় নির্ণীত হইল না।

www.pathagar.com

তাহার পর দুই দলপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিল। কোন পক্ষই মরিয়া মরে না। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পৃথিবী রসাতলে যায় দেখিয়া পরমেশ্বর অর্ধশ্রীকৃষ্ণ-অর্ধপয়গম্বর বেশে আবির্ভূত হইয়া রায় ও গাজীকে ঠান্ডা করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য পুনঃ স্থাপন করিয়া দিলেন। পরমেশ্বরের যুক্তশ্রীকৃষ্ণপয়গম্বরের মূর্তির বর্ণনা,

অর্ধেক মাথায় কালা (টুপি)   এক ভাগ চূড়া টালা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায়   অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।

মিটমাটের শর্ত হইলঃ-

বড়-খাঁর মহাকায়   গোরে কেরামত তায়
হইবে লোকের কাম ফতে
যেখানে পীরের নাম   বারাম মোকাম থান
যত ফায়তালা নাম হতে।
মায়ামুণ্ড এই রূপ   দক্ষিণ দেশের ভূপ
পূজা করিবেক যত জন............
এখানে দক্ষিণরায়   সব ভাটি অধিকার
হিজলীতে কালুরায় থানা
সর্বত্র সাহেব পীর   সবে নোয়াইবে শির
কেহ তাহে না করিবে মানা।

কাহিনী শুনিয়া পূজা দিয়া পুষ্পদত্ত সেখান হইতে ডিঙ্গা ছাড়িলেন, তাহার পর ছত্রভোগে পহুঁছিয়া ত্রিপুরা ভবানীর পূজা দিলেন। মগরা অতিক্রম করিয়া পুষ্পদত্ত গঙ্গাসাগরে উপনীত হইলেন। (ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন কাহিনী এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে)। তাহার পর উড়িষ্যার কূলে পৌছিয়া কর্ণধারের কাছে জগন্নাথের মাহাত্ম্য শুনিলেন। তৎপরে রামেশ্বরে পহুঁছিয়া প্রসঙ্গত রামায়ণ শোনা হইল। তাহার পর পুষ্পদত্ত সমুদ্রের মধ্যে রায়ের আশ্চর্য মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন। অবশেষে তিনি তুরঙ্গ শহরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরাম দাসের বর্ণনায় তুরঙ্গ শহর হচ্ছেঃ-

চৌহরা বাজার দেখে অনেক দোকান
পুরুষ-রমণী কাম-রতির সমান।
যোগসিদ্ধ যোগিগণ আছে যোগাসনে
বিভূতিভূষণ বিনে অন্যনাহি জানে।...........
বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে...........
সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে
কিতাবৎ নিপুণ কয়েস্থগণ লেখে।
(৩ পৃষ্ঠা-৩১৮-৩২৪)।

www.pathagar.com

রায়মঙ্গলের কাহিনীর পরিণতি চন্ডীমঙ্গলের মতই। পুষ্পদত্ত তুরঙ্গ শহরে রাজার কাছে সমুদ্রবক্ষে সোনারপুরী দেখার কথা বর্ণনা করিল। কিন্তু রাজাকে তা দেখাইতে ব্যর্থ হইয়া প্রাণদন্ডে দন্ডিত হইল। তখন সে দক্ষিণরায়কে স্মরণ করিলে দক্ষিণ রায় আবির্ভূত হইয়া পিতা-পুত্রকে উদ্ধার করিল। তাহার পর যথারীতি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পিতার সহিত পুষ্পদত্ত স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১ পৃষ্ঠা-৮৮)।

রায়মঙ্গল কাব্য রচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণরাম দাস বলেছেন যে, স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়ে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন। তিনি বলেছেন, একদা ভাদ্রমাসের সোমবার তিনি (কৃষ্ণরাম) খাসপুর পরগনার অন্তর্গত বড়িষ্যা গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে এক গোয়ালার গোলাঘরে (গোয়ালঘরে) তাঁহাকে রাত কাটাইতে হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক মহিমাময় ব্যক্তি বাঘের পিঠে চড়া, হাতে ধনুর্বাণ, আবির্ভূত হইয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন, আমি 'দক্ষিনের রায়' (অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারী)। তুমি আমার মাহাত্ম্য প্রচার করঃ-

পাঁচালী-প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার
আঠারো-ভাটীর মাঝে হইব প্রচার।
পূর্বে করিল গীত মাধব-আচার্য
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা
চাষা-ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন
অন্য গীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ।
ফাকুটি-নাকুটি আর করে রঙ্গি-ভঙ্গি
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা-মলঙ্গি।
তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে
সবংশে তাহার তবে সংহারিবা বাঘে।

কৃষ্ণরাম স্বপ্নের ঘোরে বলিলেনঃ-

তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু
কেমনে করিব গীত আমি অতি শিশু।

তখন রায় কৃষ্ণরামকে নিজের কাহিনী বলিলেনঃ-

তুমি যে কবিরা গীত শুন তাহা বলি।
মুনি-মুখে শুনিয়া ভূপতি প্রভাকর
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর।
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন
বসাইল নবরাজ্য কাটিয়া কানন।
বিবাহ করিনু ধর্মকেতুর কুমারী

www.pathagar.com

দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি।
হরবর দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া
প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া।
কালুরায় পাঠাইল হিজলী শহরে
না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে।
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জীয়াইয়া
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া।
বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর
বহুদিন বন্ধী ছিল তুরঙ্গ-শহর।
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে
সাত ডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে।
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল।
মরণে স্মরণ কৈল সাধুর নন্দন
সঙ্কটে আমি গিয়া করিনু রক্ষণ।
বাঘ লইয়া আপুনি সমরে দিনু হানা
বধিনু সুরথ রাজা আর যত সেনা।
রাজা-রানী আসিয়া অনেক কৈল স্তব
জীয়াইনু দিনু আমি কৃপা অনুভব।
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল
পিতা-পুত্র দুইজনে দেশেরে আইল
করিয়া আমার পুরী আমার মন্দির
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাধীর।
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজ স্থল।
(৩ পৃষ্ঠা-৩১৫-৩১৭)।

গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণরাম দাস দক্ষিণ রায়ের বন্দনা করেছেন এভাবেঃ-

কর-জোড়ে মহাকায় বন্দিলাম দক্ষিণরায়-
ঠাকুরের চরণকমল
সঙ্গে নীলাবতী রানী পঞ্চপাত্র সাথে আনি
উর ঘরে ভকতবৎসল।
তোমা বিনা প্রভু কেই যারে যাহা কর এই
আমল আঠারো-ভাটীর
বহে হীরারাম ঘোড়া পরিধান দিব্য জোড়া
উড়নি ঘুরনি পরিপাটী।

www.pathagar.com

বেসড় যে তাড়-বালা কনকের কণ্ঠমালা
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুই কানে
ঐরিদন্ড অচিরাৎ কঠিন কামান হাত
তরকচ পরিপূর্ণ বাণে।
পরিসর পিঠে ঢাল করে কর তলয়ার
কাটারি কোমরে করা ছুরি
শোভে যার কুপি-ভাগে মণি-চুনি ভাগে ভাগে
মনোহর মুকুতার ঝুরি।
সোনার বরণ তনু অশ্বিনীনাগর জনু
নিসাদনি অশনি-বিজয়
বিশাল লোচন-জোর শ্রবণ অবধি ওর
চাহনি চমকে রিপুচয়
নল নাল মধু আর সর্ব তুয়া অধিকার
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা
যত দ্রব্য চলে নায় বাইচ ভাউলে যায়
রায় বিনা বর দেয় কেবা।
পূজা করে এক মনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে
বাহুল্যা বহুল্যা কত ঠাঞিা
পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।
ডিঙ্গা জঙ্গ গঠে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় কারখানা
ঐ পদ পূজিলে হয় নহিলে কিছুই নয়
অনুভব কত ঠাঞি জানা।
মউজে বা নাই মানে ভালমতে সে যে জানে
কর্মভোগ সকলের গোড়া
কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে কিবা কোপে ঘাড় ভাঙে
রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া।
বড়খাঁ গাজীর সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তার পর
কালুরায় বন্ধু বটে সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর।
রণে বনে রাজস্থানে সদত আনন্দ মনে
তোমার সেবকে দুঃখে কিবা
বলে কবি কৃষ্ণরাম নায়কের পুর কাম
গায়নে বায়নে বর দিবা।।

(৩ পৃষ্ঠা-৩১৪-১১৫)।

www.pathagar.com

রায়মঙ্গল কৃষ্ণরাম দাসের তৃতীয় রচনা। এটির রচনাকাল ১৬৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ।

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র শকের বৎসর।

(৩ পৃষ্ঠা-৩১৩)।

এই "রায়ের মঙ্গল" এ শুধুমাত্র দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল দক্ষিণ রায়ের নয়, পীর বড় খাঁ গাজীর এবং দক্ষিণের সহযোগী ক্ষেত্রপাল কালুরায়ের মহিমা কীর্ত্তিত ও উল্লিখিত হইয়াছে। (৭ পৃষ্ঠা-২২৬)।

কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গলে দক্ষিণ বঙ্গের অনূপ ও জাঙ্গল অঞ্চলে ভয়ে পূজিত ব্যাঘ্রাধিদেবতা দক্ষিণরায়ের ও সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের মুসলমানদের সম্মানিত পীর বড়খাঁ গাজী সাহেবের মাহাত্ম্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আনুষঙ্গিকভাবে এই অঞ্চলের কুম্ভীর দেবতা কালুরায়ের কথাও আছে। দক্ষিণরায়ের পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থাৎ চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে এবং এই প্রদেশে বড় খাঁ গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়।....... নিম্নবঙ্গে যখন জঙ্গল কাটিয়া বসবাস ও আবাদ শুরু হয়, তখন প্রধান বিপদ ছিল-ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। পরেও যাহারা কাঠ কাটিতে, মধু আনিতে ও নুন জমাইতে যাইত তাহাদেরও বাঘ-কুমীরের ভয় ছিল। আশেপাশের চাষীদেরও ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলে এই দুই নতুন দেবতার পূজার প্রচলন হইয়াছিল। দক্ষিণরায় আসলে বাঘদেবতা নয়, দক্ষিণ দিকের ক্ষেত্রপাল (অধিপতি)। বাঘ ইহার বাহন।...... উত্তর দিকের ক্ষেত্রপাল (অধিপতি) গোরাচাঁদ।...... বড়খাঁ গাজী গোরাচাঁদেরই অন্য সংস্করণ। তাঁহার নামান্তর পীর গোরা চাঁদ (১ পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫)। মুসলামান লেখকদের ভাষায় বড়খাঁ গাজী।

আগেই বলা হয়েছে, বাঘ ও কুমীর ভক্তির দেবতা নয়, ভয়ের দেবতা। তবে কুম্ভীরকে দেবতা বা পীর বানানো শুধুমাত্র বাঙ্গালা দেশেরই বিশেষত্ব নয়, সিন্দুতেও এটা দেখা যায়। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছেন,

করাচীর তিন ক্রোশ উত্তরে , মগর (কুম্ভীর) পীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐ স্থানে কুঞ্জবনপরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে কুম্ভকর্ণনিদ্রায় মগ্ন, বড় বড় কুম্ভীর ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। মগর পীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহারো কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগর পীরে ছাগাদি উপহার দিয়া কুম্ভীর রাজার পরিতোষ সাধন করে। (৮ পৃষ্ঠা-১১৭)।

বাঙ্গালার প্রাচীন পীরস্থান সংলগ্ন দীর্ঘিকায় পূর্বে পোষা কুমীর থাকিত এবং লোকে মানসিক করিয়া হাঁস মুরগী উপহার দিত। (৯)।

রায়মঙ্গল কাব্যে রায়-গাজী তথা হিন্দু-মুসলমান সংঘাত ও মিলনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এটি হিন্দু মুসলমান মিলনের, ঐক্যের কাব্য।

www.pathagar.com

পীর বড়খাঁ গাজীর সাথে দক্ষিণরায়ের যুদ্ধকালে একহাতে কোরান ও অন্যহাতে পুরাণ নিয়ে অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর রূপে আভির্ভূত টিকি-টুপিধারী পরমেশ্বর যুদ্ধ থামিয়ে এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, এই পথে যারা যাবে তারা শুধু দক্ষিণরায় নয়, বড় খাঁ গাজীর মোকামেও পূজা দেবে। বস্তুতঃ এই কাব্যে এ ভাবেই হিন্দু মুসলমানে বোঝাপড়া হয়। (২ পৃষ্ঠা-১৩৩)

বড়খাঁ গাজীকে লইয়া অনেকগুলি ছড়া লেখা হইয়াছিল। রায়ের কবিতায় দিগ্‌বন্দনায় অনেকেই মান্দারনের ইসমাইল গাজী বড়খাঁ পীরের উদ্দেশে নতি জানাইয়াছেন। মুসলমান কবিদের হাতে দক্ষিণরায়-কালু রায়-বড়খাঁ গাজীর কাহিনী নূতনতর পরিণতি লাভ করিয়াছে। (৩ পৃষ্ঠা-৩২৪)।

সাহিত্য মুল্য বিচারে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গল' কাব্য তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এই কাব্যের দুটি গুরত্বপূর্ণ ও মুল্যবান দিক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে হিন্দু মুসলিম মিলনের, ঐক্যের দিক। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এককালে বাংলাদেশে রাজভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সাহিত্য চর্চাও হত সংস্কৃতে। বাংলাকে ম্লেচ্ছের ভাষা, শুদ্রের ভাষা রূপে অবজ্ঞা করা হত এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের অধিকারও ছিলনা। বাঙলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরই শাকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা সাহিত্য রচনা শুরু হয়। ফলে প্রথম থেকেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনাকারীদের প্রতি বাঙলার অভিজাত ভূমিপুত্রদের ঘৃণা ছিল। এই কারণে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের এবং সাহিত্য চর্চাকারীদের মানসিক অনৈক্য ছিল। প্রথম দিকে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা সকলেই Matter of Sanskrit কে নিয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন। শাহ মোহাম্মদ সগীর, সাবরিদ খান, সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ, কাজী দৌলত, আলাওল প্রমুখ মুসলিম লেখকেরা প্রথম বাংলা সাহিত্যে Matter of Persia, Matter of Arabs, Matter of Hind, Matter of Bengal প্রভৃতি আমদানী করেন। অর্থাৎ বাংলা ও ভারত সীমান্তের বহির্ভাগ থেকেও বাঙলা সাহিত্যে সাহিত্যরস ও সাহিত্যে অনুসৃত আদর্শ, দর্শন প্রভৃতি আমদানী করেন। ফলে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠতে থাকে সমৃদ্ধ ও সজীব সাহিত্য। একারণে বাংলা সাহিত্যকারদের সাথে অভিজাত হিন্দুদের মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। এই দ্বন্দ্বের যুগে হিন্দু-মুসলমান মিলনে টিকি-টুপি ধারী পরমেশ্বরের আবির্ভাবে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ বিষয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কৃষ্ণরাম দাসই প্রথম বাঙালী অমুসলিম কবি যিনি তাঁর কাব্যে হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনি ইতোপূর্বেকার মুসলিম লেখকদের অনুসরণ করে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে উদ্যোগী হন।

কৃষ্ণরাম দাসের হাতে বাংলা সাহিত্যে Matter of Sanskrit, Matter of Bengal এবং Matter of Hindi, এই তিনের সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ তিনি বাংলা সাহিত্যে তিনের সমন্বয ঘটিয়ে কাব্যকে হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রতীক করে তোলেন।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর রংপুরের কবি হেয়াৎ মাহমুদ রচনা করেন 'আম্বিয়া বাণী'। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রচিত এই আম্বিয়া বাণী মঙ্গল' কাব্যের চাঁদে গড়া। 'মঙ্গল' কাব্যে দিগবন্দনায় যেমন দিগদেশের দেব দেবীর উল্লেখ থাকে আম্বিয়াবাণীতেও তেমনি নানা পীরের উল্লেখ আছে। যেমন,

কুতুব আলম বন্দো পাঁড়ুয়া মোকামে
কুতুব কুতুব পক্ষী জপে যার নামে।
আখেরী কুতুব সেই সংসারে বিদিত
গৌড় বঙ্গ সকলি তাহার বিলাইত।
গরীব হুসেন বন্দো পীর ধোকড়পোস
ছাড়িয়া উত্তম বস্ত্র ধোকড়াতে খোস।
সৈয়দ মুর্তজা বন্দো করিয়া ভকতি.....
পূর্বেতে বন্দিব পীর আবদুল গফফার
পশ্চিমে বন্দিব পীর আবদুল সত্তার।
উত্তরে বন্দিব পীর আবদুল করিম
দক্ষিণে বন্দিব পীর আবদুল রহিম।........

গুরু বন্দনায়-

এক একে গুরু বন্দো চরণ আরাধি
পাট গুরু হাট গুরু বাট গুরু আদি।
শিক্ষা গুরু বন্দিব উদ্দিশে দুই পায়ে
রাগরস তালমান শিখাইল ভায়ে।..........
শ্রম করি শুকে পড়ায়ে যেন দুঃখে।
সেহি মতে গুরু সব শিখায়াছে মোকে।
পিতামাতা জন্ম দিল গুরু দিল গুণ
আলোন বেঞ্জন যেন তাতে ছিল নুন।..........

নিরঞ্জন বন্দনার শেষে বলেছেনঃ-

নাহিরূপ অঙ্গ   অপূর্ব অভঙ্গ   যেমন পুষ্পের গন্ধ
কহে বিনা মুখে   চক্ষে নাহি দেখে   যত করে ভাল মন্দ।
কে দেখে তাহাকে   কৃপা করে যাকে   আছে হয়া সর্বময়
মহম্মদ হেয়াৎ   কহে শুন বাত   কে বিনে সকলি নয়।
(৩ পৃষ্ঠা-৫২৯/৫২৮)।

আম্বিয়া বাণী হেয়াৎ মামুদের চতুর্থ গ্রন্থ। এটিতে ইসলাম শাস্ত্রের পুরাণ কথা, সৃষ্টি হইতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মদিনা গমন পর্যন্ত সময়ের বিবরণ আছে। এটিতে মনসা বা চন্ডী অথবা রায় মঙ্গল বা গাজীমঙ্গল কিংবা অন্নদা মঙ্গলের মতো কাহিনী না থাকলেও এটিকে মঙ্গল কাব্য রূপে বিবেচনা করা হয়।

www.pathagar.com

আলোচ্য মঙ্গলকাব্য গুলো ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্য, ধর্মমঙ্গল, শিব মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলো বহুল প্রচারিত এবং ব্যাপকভাবে আচরিত কাব্য নয়।

তথ্য-পঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩

২। গোপাল হালদার-বাংলা-সাহিত্যের রূপ রেখা-প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্ত ধারা, ঢাকা, ১৯৮০,

৩। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ), ইস্টান পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৪। পুথি পরিচয়, ২য় খন্ড, সম্পাদক,-পঞ্চানন মন্ডল।

৫। বিষ্ণু পালের মনসা মঙ্গল-এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক (১৯৬৮) প্রকাশিত।

৬। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-৩৯

৭। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-৩

৮। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর-আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, (১৯১৫)

৯। জন্মভূমি-জৈষ্ঠ্য, ১৩০২ (হারাধন দত্ত লিখিত গড়মান্দারন ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত)।

১০। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খন্ড, মধ্য যুগ। ১৩৭১।

১১। ডঃ আবদুল করিম- বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।, ১৯৯৪।

১২। ডঃ দীনেশ চন্দ্রসেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১।

১৩। সুখময় মুখোপাধ্যায়-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম। ভারতী বুকষ্টল, কলিকাতা (৩য় সংস্করন-১৯৯৩)।

১৪। রূপরামের ধর্মমঙ্গল। ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত, ১৩৫১।

১৫। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১/২,

১৬। অক্ষয় কুমার কয়াল-সম্পাদক-রূপরামের ধর্মমঙ্গল।

১৭। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৬।

১৮। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১/অ, ২য় সংস্করণ।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পীরগাঁথা ও সত্যনারায়ণ পাঁচালী

রায়মঙ্গল আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সন্ধান পেয়েছি গাজী মঙ্গলের। এটা স্পষ্ট যে, রায়মঙ্গলের দক্ষিণ রায় বা কালুরায় এবং গাজী মঙ্গলের বড়খাঁ গাজী বা গাজীপীরও মনসা ও চন্ডীর মতো ভয়ের দেবতা, ভক্তির নয়। তবে রায়-গাজী বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথই সুগম হয়। কারণ রায়-গাজী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পারস্পরিক কামনার মধ্যে প্রতিহিংসা নেই। তাই শেষ পর্যন্ত রায় ও গাজী পরস্পর সৎ প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের সামনে পরিদৃষ্ট। অর্থাৎ রায় ও গাজী হিন্দু-মুসলামান দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের প্রতীক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পীর গাঁথা, পীর পূজা এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালীর এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। "পীর পূজার উৎপত্তি অকস্মাৎ অথবা একটি কোন নির্দিষ্ট শতাব্দে ঘটে নাই। তুর্কী অধিকারের প্রথম হইতেই এদেশে মুসলমান সাধুর ও ধর্মপ্রচারকের প্রতিষ্ঠার আরম্ভ। ..... কোন কোন মুসলমান সাধুর মাহাত্ম্য সেকালের জনসাধারণের মনে পীরের প্রতি ভয়ভক্তি জাগাইতে শুরু করিয়াছিল। সুফী সম্প্রদায়ের গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তিও সেকালের বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইহার পক্ষে মনের অনুকূলতাও খানিকটা কাজ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মনের সে অনুকূলতা হইল দৈবনির্ভরতা ও জ্যোতিষে বিশ্বাস।

তাহার পর চৈতন্যের ধর্মবন্যা আসিয়া ধর্মচিন্তায় হিন্দু-মুসলমানের ভেদের বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিয়া গেল। সুফী মতের প্রভাব চৈতন্যের ধর্মে যেমন দৃঢ়তার সঞ্চার করিল তেমনি গুরুবাদেরও প্রতিষ্ঠা করিল। হরিদাসের মর্যাদা স্বীকার করিয়া, সনাতন-রূপকে শাস্ত্রকার-রূপে নির্দিষ্ট করিয়া, এবং ধর্মাধর্ম নিবিশেষে ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরনামনিষ্ঠা প্রচার করিয়া চৈতন্য মুসলমান পীরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর খানিকটা বিভেদ ঘুচাইতে চেষ্টা করিলেন। মুসলমান সাধুর (জিন্দা পীরের) কাছে দীক্ষা লইতে অথবা তাঁহাকে ভক্তি দেখাইতে হিন্দু-শিষ্য-ভক্তের গুরুতর সামাজিক বাধা রহিল না। সেই হইতে জনসাধারণের মনে পীরভক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে। (১ পৃষ্ঠা-৪৬৮)।

www.pathagar.com

পীর-ফকিরেরা সাধারণতঃ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই ভক্তি শ্রদ্ধা পাইতেন। এই কারণে পীরের উপাসনা দুই ধর্মের মিলনের সেতুর মত হইয়াছিল। সত্যনারায়ণ দেবের পীর সংস্করণ, সত্যপীর পীরের দেবসংস্করণ। সুতরাং অতিসহজেই রামের সহিত রহিমের সমীকরণ হইয়া যায়। (২ পৃষ্ঠা-১৫৩)।

বাঙ্গালায় পীর-মাহাত্ম্য কবিতা রচনা আধুনিক কালের ঘটনা নয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দে রচিত বলিয়া অনুমিত তিনটি আর্যা অর্থাৎ ছড়া সেকশুভোদয়ায় পীর শেখ শাহজালালের প্রসঙ্গে উধৃত আছে। (১ পৃষ্ঠা-৪৬৯)। ছড়াগুলো হচ্ছেঃ

প্রথম-

মকদম সেক শাহ্ জালাল তবরেজ তব পাদে করোঁ পরণাম
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাঁহার নাম।
বারেক রক্ষা কর মোর ধন প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান।

দ্বিতীয়-

মধ্যে আছে পীরের মোকাম তস্যোপরি বিদ্যতে প্রধান-পুরুষের স্থান
তৃতীয়াঞ্জলী তাহার নামে দান
পূর্বে উদয়াচল পর্বতের নাম উদয় সূর্য প্রত্যুষ বিহান
কিরাত জানিয়া আমার মোকামের কবির সম্মান
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান।
উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান তথা আমি করিব প্রয়াণ
আমি গেলে তারা করিব সম্মান
পঞ্চম অঞ্জলি তাহার নামে দান।
আমার বাপ-মাহ দরিদ্রের পুত্র আমা জনিতে তাহারা পাইল বড় দুঃখ
আমার জলে তাহার হৌক আপ্যান
ষষ্ঠ অঞ্জলি তাহার নামে দান।
পৃথিবীর লোকে আমার জানে নাম কেহো বলে ভালো কেহো করে অপমান
সপ্তম অঞ্জলি তাহার নামে দান।
রাজা হৈএগ্রা আমার কবির সম্মান প্রথমে আইলে দিবেক আমার নামে অন্নদান
অষ্টম অঞ্জলি তাহার নামে দান।
আমার গ্রামে যে করিব অবস্থান সহিএগ্রা দুঃখ যদি না করে আন
পুনঃ পাছে দেয় সম্মান
নবম অঞ্জলি তাহার নামে দান।
আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম
কেহ বাঞ্ছে ধন পুত্র কেহ আরোগ্য দান
আমি তার করিব ত্রাণ

www.pathagar.com

দশম অঞ্জলি তাহার নামে দান।

তৃতীয়ঃ-

বনের শাক খায় সেক বনের গোনা
ঝিকরির পোটলি বান্দিয়া দেয় সেক
হাটে বিকাইলে হয় সোনা।
(৩-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)।

পীরের গাথা ও পীরের ব্রতকথা রীতিমতভাবে রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দে।..... তবে শতাব্দের শেষ দুই দশক হইতে পীর-নারায়ণর একাত্ম মূর্তি সত্যপীর বা সত্যনায়ারণে মিশিয়া গিয়াছে,......পীর-মাহাত্ম্য রচনার মধ্যে প্রধান হইল সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী।..... সত্যপীর পাঁচালীতে দুইটি উপাখ্যান আছে। (১ পৃষ্ঠা-৪৭০-৭১)। একটি কাহিনী এরূপঃ--- এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ , ভগবান তার প্রতি দয়া করে ফকির বেশে দেখা দিলেন, তাঁকে সত্যপীরের শির্নি দিতে বললেন। ব্রাহ্মণ পুজো দিল আর ধনশালী হয়ে উঠল। দ্বিতীয় কাহিনীটি সেই সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার ছাঁচে ঢালা, ধনপতি-ফুল্লরার কাহিনীরই অনেকটা অনুরূপ।.....মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই সত্যপীরের বেশী ভক্ত। (৪ পৃষ্ঠা-২১৫-২১৬)।

শ্রীকবি বল্লভের মদন সুন্দরের পালা সত্যনারায়ণ পাঁচালী। কাহিনী হচ্ছে-সদানন্দ ও বিনোদ, দুই ভাই সদাগর, রাজার আজ্ঞায় সফরে যাইবার কালে খোদার বিড়ম্বনায় সমুদ্রবক্ষে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছিল-

পাথরের গোর এক ভাসয়ে দরিয়ায়।
নৃত্য করে নর্তকী কিন্নরে গীত গায়
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোভা পায়।
মৃগছাল পানির উপর ডাল্যা দিয়া
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিমমুখ হয়্যা।।
(১ পৃষ্ঠা-৪৭৪-৭৫)।

সদাগরেরা রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইতে না পারিয়া করারুদ্ধ হইল। এদিকে গৃহে উহাদের স্ত্রীরা এক ফকিরের পাল্লায় পড়িয়া সিদ্ধাই সিকিয়া ডাকিনী হইয়া গাছে চড়িয়া দেশে বিদেশে ঘুরিতেছে। একবার লুকাইয়া তাহাদের সঙ্গে গিয়া ছোটভাই মদন সদাগর এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পলাইয়া আসিল। পরে নানা বিড়ম্বনার পর রাজকন্যার সহিত তাহার মিলন হইল। তখন দুই ডাকিনী ভ্রাতৃজায়া বুঝিতে পারিল যে, মদন তাহাদের কান্ডকারখানা জানিয়াছে। তাহারা মন্ত্র পড়িয়া মদনকে শ্যেন পক্ষী করিয়া দিল। খোদা বাজপাখী হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া পাটনে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহার দুই ভাই বন্দীঘরে ছিল। তাহার পর খোদা রাজাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,

শুনহ বেইমান রাজা বাত কহুঁ তোরে
রাখ্যাছ গোলাম মেরা কিসের খাতিরে।

www.pathagar.com

সাত হাজারের মার্তা লইয়াছ ভাঁড়্যা
মহল ভিতরে নাচে সাত শত নাড়্যা।
হান-হান কাট-কাট করিয়া ফুকুরে
রুধিরের নদী বহে মহল ভিতরে।
তামাম শহরে আগ লাগাইয়া দিল
জরু জাতি মাল মার্তা জ্বলিতে লাগিল।
(১ পৃষ্ঠা-৪৭৫)।

খোদার শাস্তি বর্ণনা শুনিয়া রাজা ভয় পাইয়া দুই ভাইকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা দেশে ফিরিল। আসিবার কালে সেই পাখিকে ধরিয়া লইল, কারণ মদন একটি শ্যোন পক্ষী আনিবার কথা বলিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া ভাইকে না দেখিয়া দুইজনে শোক করিতে লাগিল। তাহার পর খোদা ফকিরের বেশ ধরিয়া মদনের পত্নী কুন্তলাকে সত্যনারায়ণের পূজা দিতে বলিলেন। কুন্তলা তাহাই করিল এবং পিঞ্জরস্থ পক্ষীকেও কিছু সিন্নি (শিরনী) দিল। সে সিন্নি খাইয়া মদন নিজের মনুষ্যরূপ ফিরিয়া পাইল। (১ পৃষ্ঠা-৪৭৪-৭৫)।

কিন্তু এখানে কাহিনীটি অসম্পূর্ণ। কারণ সদানন্দ ও বিনোদের স্ত্রীদ্বয় কোথায় তার উল্লেখ এখানে অনুপস্থিত।

কৃষ্ণ হরিদাসের মালঞ্চার পালা সত্যপীর পাঁচালী। কাহিনী হচ্ছে- মালঞ্চার রাজা ছিলেন মৈদানব। তাহার অনূঢ়া কন্যা সন্ধ্যাবতী নূর নদীতে নাহিতে গিয়া একটি সুগন্ধি ফুল পাইয়া তাহা আঘ্রাণ করিয়া গর্ভবতী হয়। বাপ-মা জানিতে পারিয়া মেয়েকে ফুলবন অরণ্যে বনবাস দেয়। সঙ্গে থাকে দুই দাসী। গর্ভস্থ সত্যপীরের আদেশে লোকমান হাকিম সেখানে সন্ধ্যাবতীর বাপের বাড়ীর মত প্রাসাদ তুলিয়া দিল।। সেইখানে সন্ধ্যাবতী বাস করিতে লাগিল। যথাকালে গর্ভ ভূমিষ্ট হইল-রক্তের ঢেলা। তাহা সন্ধ্যাবতী বেগবতির জলে ভাসাইয়া দিল। তাহা এক কচ্ছবিনী খাইল। কচ্ছপীর উদর হইতে সত্যপীর মনুষ্যমূর্তি ধরিয়া বাহির হইলেন। কচ্ছপী মুক্ত হইয়া স্বর্গে গেল। সত্যপীর গেলেন জলের তলে খোয়াজ জিন্দা পীরের কাছে। গিয়া

সত্যপীর বলে হাদি তুমি মোর মুরশিদ
আমাকে বাতাও তুমি করিয়া মুরিদ।

খোয়াজ কিছুতে রাজী হইলেন না। সত্যপীর জেদ করায় তিনি দেশ ছাড়িয়া পলাইলেন। সত্যপীরও পাতালে বলি-রাজার দেশে ধাওয়া করিলেন। তখন আর পথ না দেখিয়া খোয়াজ রাজি হইলেন। দুইজনে বেগবতীর তীরে ফিরিয়া আসিলেন। খোয়াজ প্রথমে সত্যপীরের জন্মকথা শুনিলেন। তাহার পর সন্ধ্যাসংকেতে তাহাকে তত্ত্ব-উপদেশ দিলেন।

পড়িলে সে পড়া নহে বুঝিলে সে হয়
বুজিলে যে বড় নহে সাধনে সে পায়।
এক গোটা তাল বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর
একটা ছাগল বান্ধা তলায় বৃক্ষের

www.pathagar.com

তালের শিকড় যদি ছাগল না চাটে
তবে আর তালগাছের মাঞ্জা নাহি ফুটে।
ছাগল চাটিল যদি তাল গাছের গোড়
বুজ বাবা সত্যপীর ফকিরের ওড়।।

তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া সত্যপীর পাঁচ বছরের শিশু হইয়া মাতা সন্ধ্যাবতীর কাছে আসিল। মায়ের কাছে কিছুদিন থাকিয়া ঝাড়খন্ডের অধিবাসীদের রোগ ভয় দেখাইয়া উঠাইয়া আনিয়া সত্যপীর ফুলবন অরণ্যে প্রজা বসত করাইল। ঝাড়খন্ডের রাজাও সত্যপীরের কাছে নতিস্বীকার করিল। তাহার পর দুই-চারটি কেরামতির পর সত্যপীর মাতামহের দেশ মালঞ্চায় গেলেন। রাজা তাহাকে যাবনিক পূজা প্রচারের অপরাধে কারাগারে দিল। কারাগার হইতে পলাইয়া সত্যপীর রাজপুরোহিত কুশল ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইল। কুশল ও তাহার পত্নী আনন্দী সত্যপীরকে পুত্রের মত পালন করিতে লাগিল। নূর নদীতে স্নান করিতে গিয়া বালক সত্যপীর একদিন ঘাটে কোরানের পুথি কুড়াইয়া পাইয়া ঘরে আনিয়াছিল। কোরান লইয়া কুশলের সঙ্গে সত্যপীরের তর্ক উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিল, কোরান জলে ভাসাইয়া দাও গিয়া। বালক বলিল, কেন? ব্রাহ্মণ বলিল, কেরান পড়িলে জাতি যায়। সত্যপীর বলিল, " কি আছে কেরানের মাঝে জাতি যাবে কিসে?" "ব্রাহ্মন বলিল, কেরানের প্রথমেই বিছমিল্লা হরফ" আছে।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বিছমিল্লা কয়
শেষ কালে সেই জন বৈকুণ্ঠ না পায়।

সত্যপীর বলিল,

এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার নাম জপে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।
হস্ত নাহি পদ নাহি ধরেছে সংসার
মুখ নাই আছে তার করিতে আহার।
কর্ণ নাহি কথা শোনে চক্ষু নাহি দেখে
চিনিতে না পারে কেহ সর্বঘটে থাকে।
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।
(১- পৃষ্ঠা ৪৮২, ৮৩, ৮৪)

বস্তুতঃ সত্যপীরের বক্তব্য হচ্ছে 'কেরানে-পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম পরস্পর বিরোধী নহে' (২ পৃষ্ঠা-১৫৪)।

কুশলের হইয়া পূজা করিতে গিয়া সত্যপীর রাজ অন্তঃপুরে সত্যপীর পূজা প্রবর্তন করিলেন। তাহাতে মাতামহের সঙ্গে তাহার বিরোধ বাধিল। অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া

www.pathagar.com

মৈদানব অবশেষে সত্যপীরকে মানিল। সন্ধ্যাবতীও পিতৃগৃহে স্থান পাইল। মাতামহাবাসে কিছুদিন থাকিয়া সত্যাপীর নতুনতর অভিযানে বাহির হইয়া গেলেন। এই পাঁচালীতে সত্যপীর দেবতা নহেন মানব সন্তান। (১ পৃষ্ঠা-৪৮৪)।

এই বর্ণনায় অসঙ্গতি আছে। মৈদানব কন্যাকে ফুলবন অরণ্যে বনবাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বনে কিভাবে কন্যার দিন কিভাবে চলছিল তার খবরাখবর মৈদানব রাখছিল কিনা তা বলা হয়নি।

এছাড়া বিদ্যাপতি তাঁর সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে সত্যপীরের বন্দনা করেছেন। ভনিতায় বলেছেন,

দুঃখ দেখি বনিতার পীররূপে উপকার ফকির-বেশে আসিলা জমিনে
হইলেন জাহির কলিযুগে সত্যপীর কবি বিদ্যাপতি ইহা জানে।
নিয়ত হাসিল সত্য পীরের কালাম
কহে বিদ্যাপতি করি হাজার সালাম।
(১ পৃষ্ঠা-৪৭৪)।

পাঁচালীতে বিদ্যপতি ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অপর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথায় বাংলার সঙ্গে প্রচুর আরবী ফারসীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন,

জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর
দেব দেব জগতের নাম।
কপাটে করুণা ময় দ্বিজে কর বাওয়া।
মৈ ভূখা ফকীর হুঁ লেগা মেরা দুওয়া
তু বাওয়া বখতাওব ধরম আত্মা দেখা তুঝে
মৈ ভুখা ফকীর তুঁ খিলাও কুছ মুঝে।
তামাম দুনিয়া দেখা সবাই ইমান ছুটা
কঞ্জা দেই খয়রাতন করে এক মুঠা।
(৭ ভূমিকা-পৃষ্ঠা-৭/৮)।

দু'জন মুসলমান লেখকের সত্যপীর (নারায়ণ) পাঁচালী পাওয়া গেছে। এই দু'জন লেখক হচ্ছেন আরিফ ও ফৈজুল্লা। ফৈজুল্লা পশ্চিম বঙ্গের লোক ছিলেন। তাঁহার কাহিনীতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লা, মোহাম্মদ মুস্তফা, পাঞ্জাতন পীর, বসুলের চারি ইয়ার এবং স্থানীয় পীর পীরানীদের বন্দনা করিয়া ফৈজুল্লা হিন্দু ঠাকুরগণকে বন্দনা করিয়াছেন। (১ পৃষ্ঠা-৪৮১)। ফৈজুল্লা লিখেছেন-

হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকূলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
যমুনার তটে..... রাস বৃন্দাবন
কৃষ্ণ বলরাম..... শ্রীনন্দ-নন্দন।
(৪ পৃষ্ঠা-২১৬)।

www.pathagar.com

ফৈজুল্লা লিখেছেন-

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন।
বলে ফৈজুল্লা কবি পাচনায় বসতি
কহে ফৈজুল্লা কবি পাচনায় থাকিয়া।।
(১ পৃষ্ঠা-৪৮১)।

ফয়জুল্লা নামক কবির ভনিতায় 'গোরক্ষ বিজয়' ,'জয়নবের চৌতিশা' ও 'সত্যপীরের পাঁচালী'-এই তিনটি কাব্য পাওয়া গিয়াছে।---'গোরক্ষ বিজয়'-এর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৬টি পুঁথির মধ্যে ১৪টিতেই ফয়জুল্লার ভনিতা এবং ৯টি পুঁথিতে কেবল মাত্র ফয়জুল্লার ভনিতা মেলে। এই কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে (এমনকি যেসব পুঁথিতে ফয়জুল্লার ভনিতা নেই তাদের মধ্যেও) এত বেশি আরবি- ফারসি ও মুসলমানি বাংলা শব্দ পাওয়া যায়, যার থেকে বোঝা যায়, এই কাব্য মুসলমানের লেখা।।এছাড়া এনামুল হক সাহেব ২৪ পরগনার বারাশত অঞ্চলে কতকগুলি পুঁথির পাতার মধ্যে এই অংশটুকু পেয়েছিলেন,

গোর্খবিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।।
খোঁটাদূরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি।।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খন্ডন।।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন।।

এই সমস্ত কারণে ফয়জুল্লাকেই গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচয়িতা বলে স্বীকার করতে হয়। উধৃত অংশ ফয়জুল্লার 'সত্যপীর'- কথার রচনাকাল পাওয়া যায়- ১৪৬৭ শক অর্থাৎ ১৬৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ। ..... (কিন্তু) সত্যপীর পাঁচালীর রচনাকাল "মুনি রস বেদ শশী"পাঠকে ড. সুকুমার সেন ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁর মতে, শুদ্ধি পাঠ ছিল " মুনি বেদ রস শশী" শক= ১৬৪৭ শক= ১৭২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ। এই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।.... অতএব ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছিক সময়ে গোরক্ষ বিজয় রচিত হয়েছিল। (৮ পৃষ্ঠা-২৬০-২৬১)।

সত্যপীর পাঁচালীর প্রধান মুসলমান লেখক আরিফ। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের তাজপুর গ্রামের লোক।

দেশড়া দক্ষিণে ঘর তাজপুর মোকাম।

আরিফের কাব্য 'লালমোনের কথা।' কাহিনী হইতেছে-কেরবী শহরবাসী উজীর সৈয়দ জামালের একটি কন্যা ছিল। নাম তাহার লালমোন। রাজমন্ত্রীর সংসারে নিজের বলিতে কেহ ছিলনা। তাই "একলা ছিলেন লাল দুলাল সভার।" একদিন

www.pathagar.com

গোছল করিআ বিবি আইলেন ঘরে
চুল শুকাইতেছেন বালাখানা উপরে।
পাছু পানে ঝাড়ে কেশ ছাতে হেলাইয়া
হিআর বসন তার পড়িল খসিয়া।
উলঙ্গ হইলা বিবি কোমর হইতে
হোসেন শাহা বাদশা তাহা পাইল দেখিতে।.......
লালে দেখিয়া বাদশা হেট-শির হৈল
আশকে আকুল হৈয়া ভাবিতে লাগিল।

চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া আলাপ জমিয়া অবশেষে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। বাদশা বলিল,

আমারে কবুল কর শুন লাল সুন্দরী
বাদশাই হইবে তোমার অধিকারী।

লালমোন ও হোসেন শাহা পরস্পরের প্রেমে নিমজ্জিত হইল। লালমোন বলিল,

আপনার তনু আমি সঁপিনূ তোমায়
জানিলে আমার বাপ কি হবে উপায়। ....

বাদশাজাদা বলিল, তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, ইহাতে সত্যপীর নারায়ণ সাক্ষী রহিলেন। তখন লালমোন খুশি হইয়া হোসেন শাহাকে শাদী করিল।

চারি যে কলেমা শাহা আপনি পড়িল
উঠিলা উজির জাদী শ্বাল্যাম করিল........
হাস্যপরিহাস কথা কহে দুইজনে
রচিল আরিপ কবি সত্যার চরণে।

এমন সময় "গাজী সত্যনারায়ণ" লালমোনকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন।

পীর বলে লাল সাক্ষী করিল আমায়
দোআ করি আসি আমি হাত ফিরায় গায়।.........
লালকে করেন দোআ হাত উঠাইয়া।
হীরামন মানিক ভিক্ষা দেহ না আমাকে।

বাদশা ফকিরকে হাঁকাইয়া দিলে তিনি শাপ দিলেন, তুমি পথে লালকে হারাইবে। বাদশা তখন লালকে বলিল, জানাজানি হইয়া পড়িল। এখন চল আমরা পলাই। তুমি পুরুষ সাজ নাও।

মরদানা পোসাগ করি বান্ধিব কোম্বর
রাহা-খরচ নিব কিছু আশ্ছরুপি মোহর।

www.pathagar.com

দুইজনে তাহাই করিল এবং সে দেশ ছাড়িয়া দোসরা মুলুকে পৌছিল। তাহার পর ডাহিনে পাটন রাখিয়া বামে জুলুমাত শহরের দশ ক্রোশ তফাতে থাকিয়া আজব শহরের অভিমুখে চলিল।

এতেক বলিয়া দুহে ঘোড়া হেকে যায়
ভুলিল আজমের রাহা দিশা নাহি পায়।

পথ ভুলিয়া দুইজনে ফাঁসিয়াড়ার বাড়ির দরজায় পৌছিল। ফাঁসিয়াড়ারা সবাই শিকারে গিয়াছে। কেবল এক বুড়ী দরজায় বসিয়া আছে।

বুড়ীর আতিথ্য স্বীকার করিয়া লাল রন্ধন করিল। কিন্তু খাইবার আগেই বুড়ীর হাবভাবে ভয় পাইয়া দুইজনে ঘোড়া হাঁকাইয়া পলাইল। ইতিমধ্যে বুড়ীর ডাকে তাহার ছেলেরা আসিয়া পড়িয়া তাড়া করিল। বেগতিক দেখিয়া লাল স্বামীকে বলিল,

ঘোড়া হেঁকে প্রাণনাথ ভেগে যাহ তুমি
ফেসেড়ার সাথেতে লড়াই দিব আমি।
পুরুষ পরেশ-জাতি যেইখানে যাবে
আমা হেন কত নারী ঘরে বস্যা পাবে।

বাদশা বলিল,

দিআছি ডাহিন হাত পিরিত লাগিয়া
কোথাকারে যাব লাল তোমাকে ছাড়িয়া।

দুইজনে তখন ফাঁসিয়াড়াদের সম্মুখীন হইল। লালমোনের হুঙ্কারে ফাঁসিয়াড়ারা ভয় পাইয়া পিছু হটিয়া গেল।

সভার প্রধান ছিল গোপাল জগাই
দামুদরে ডেকে বলে আগু হ রে ভাই।

যে আগু হয় সে-ই লালের হাতে কাটা পড়ে। বাকি রহিল এক কম বয়সী ছোকরা, শিশু বলিলেই হয়। লাল তাহাকে কাটিতে গেলে সে বাদশার শরণ লইল। বাদশা তাহাকে কাটিতে নিষেধ করিলে

লালমোন বলে বাদশা তোমারে সমঝাই
কালসাপের বাছারে রাখিয়া কাম নাই।

বাদশা বলিল, ইহাকে দেখিয়া মায়া হইতেছে। সঙ্গে নেওয়া যাক, ছেলের মত মানুষ করিব। লালের নিষেধ না শুনিয়া বাদশা তাহাকে সঙ্গে লইল। বনে বনে তিনদিন ঘুরিবার পর একস্থানে পৌছিয়াই বাদশা বলিল, আর পারিনা। এস এই গাছের তলায় সাতদিন মোকাম করি।

সেইখানে তিন রোজ গুজারিয়া যায়
খোসালিত খানাপিনা পাকাইয়া খায়।

www.pathagar.com

চতুর্থ দিনে লালমোন গিয়াছে স্নানে। বাদশা গাছের তলায় বিছানা পাতিয়া ঘুমে অচেতন। সুযোগ পাইয়া

ফেঁসেড়া-নন্দন তলআর হাতে করি নিল
মারিয়া সমশের তার শির জুদা কৈল।

বাদশার কাটামুন্ড ভুমিতে গড়াইয়া পড়িয়া লালমোনকে ডাকিতে লাগিল। তাহার পর বাদশার পোষাক পরিয়া ফেঁসেড়া লালের কাছে গিয়া বলিল, তোমার পতিকে হত্যা করিয়াছি। তুমি এখন আমার ঘরে চল।

স্বামীর মৃত দেহ কোলে করিয়া লালমোন বিলাপ করিতে লাগিলঃ--

দিয়াছি ডাহিন হাত পিরিতি লাগিয়া
কেমনে থাকিবে নাথ মোরে পাসরিয়া
সংসারের মাঝে মোর নাহি বন্ধুজনা
দরিয়ার মাঝে যেন ভাসে টোকা পানা
কোথা যাবে প্রাণনাথ মোরে কর সাথী
দুজনে এক সাথে রচিব পিরিতি.....

চারিদিন ধরিয়া লালমোনের বিলাপ চলিলে পর সত্যপীরের টনক নড়িল। তিনি লালমোনের কাছে আসিয়া ব্যাপার জানিয়া লইয়া বলিলেন,

"মরেছে তোমার পতি সত্যপীরের হঠে।"
এতেক শুনিয়া লাল মানিল শিরনি
খোশলিত-মন বড় সত্য গুণমণি।

তখন পীর বলিলেন, "কাপড় কাণ্ডার করে দেহ লালমোন।" কাপড়ের ঘেরার মধ্যে

দয়ার সাগর পীর এলাহি ভাবিয়া
কুণ্ডরের কান্ধে শির দিল বসাইয়া
ভেস্তের পানি পীর তার অঙ্গে দিল
হুকুম আল্লার শির জোড়া লেগে গেল।

আবার দুইজন পথে বাহির হইল। লালমোন কিন্তু পীরের শিরনি দিতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

মৃগাল শহরের নিকটে পৌছিয়া তাহারা এক পুকুরের ধারে বিশ্রাম করিতে বসিল। গাছের গুঁড়িতে ঘোড়া বাঁধিয়া বাদশা বাজার করিতে গেল। পথে এক ডাকিনী মালিনীর সঙ্গে তাহার দেখা।

পারুল নামেতে মালিনী রূপে বিদ্যাধরী
দেখি বাদশার রূপে ভুলিল সুন্দরী।

বাদশাও তার রূপে ভুলিয়া তাহার কাছে ফুলের হার চাহিল। তখন

www.pathagar.com

যোগবিদ্যা জানে সেই মালিনী পারুল
বাদশার হাতেতে দিল পড়িয়া এক ফুল।
খোশালে বাদশার বেটা ফুল সুঙ্গেছিল
সত্যের হঠেতে বাদশা কাল মেড়া হৈল।

মালিনী তাহাকে ঘরে লইয়া গেল।

রাত্রেতে মানুষ করে সঙ্গেতে যে থাকে
দিন হৈলে মেড়া করে পাটাতনে রাখে।

পুকুর ধারে বসিয়া উজীরজাদী পথ পানে চাহিয়া ভাবিতেছে। এমন সময় "আর এক তামাসা পয়দা কৈল সত্যপীর।" মৃগাল শহরের বাদশা সৈয়দ নেহারের ঘোড়া চুরি গিয়াছে রাত্রিবেলা। সকালে উঠিয়া বাদশা কোটালকে ডাকিয়া বলিল,

তাগিদ করিয়া ঘোড়া এনে দেহ মোরে
নহেত মশানে মাথা কাটা যাবে তোরে।

কোটাল আসিয়া পুরুষবেশী লালনোনকে ধরিয়া বাদশার কাছে লইয়া গেল।

গোশা হইয়া বাদশাজাদা বলে হানহান
এই বেটারে কাট লয়্যা দক্ষিণ মশান।

হুকুম শুনিয়া-

লাল বলে বাদশা তুমি বড়ই গুআর
মারিতে হুকুম দেয় না করে বিচার।

তখন বাদশা তাহাকে বিচারের প্রতীক্ষায় বন্দীখানায় রাখিতে বলিল। ছয়মাস ধরিয়া লালমোন বন্দীখানায় পচিতে লাগিল। অবশেষে পীরের দয়া হইল। তিনি জঙ্গল হইতে এক গন্ডার পাঠাইলেন শহর উৎখাত করিতে। সৈন্যসামন্ত বাদশা সকলে গন্ডারের কাছে হার মানিল। শেষে ঢেঁটরা দেওয়া হইল, যে গন্ডার মারিতে পারিবে সে বাদশাজাদীর পাণি গ্রহণ করিবে। এ খবর বন্দীখানায় লালের কানে পৌছিলে লাল কোটালকে ঘুঁষ দিয়া ছাড় পাইল এবং গন্ডার মারিল। লালের সহিত বাদশাজাদী মহাতাবের বিবাহ হইল। বিবাহ উৎসব চুকিয়া গেলে পর লালকে কাঁদিতে দেখিয়া

কন্যা বলে প্রাণনাথ কান্দ কি কারণে
হাস্যপরিহাস কথা কহ নাহি কেনে।

কহিতে কহিতে কন্যা গাত্রে হাত ফিরায়
কান্দিয়া কান্দিয়া লাল কহেন তাহায়।
এক মাস মাপ কর খাও মোর মাথা
পশ্চাতে কহিব আমি যত আছে কথা।
এইরূপে সেই রাত্র গুজরিয়া গেল
সত্যপীর বলে লালের এআদ পড়িল।

www.pathagar.com

সকাল বেলা কামিলা ডাকিয়া "সত্যের মহজিদ" (মসজিদ) কন্যা উঠাইয়া দিল। তাহার পর নাটগীতের আসর পাতিল। উদ্দেশ্য

আসিবে শহরের লোক তামাসা দেখিতে
প্রাণনাথ থাকে দেখা হবে তার সাথে।

মালিনীর বন্দী বাদশাজাদা নাচ-গানের খবর পাইয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিতে পারিল। মালিনীর সঙ্গে সেও আসিল। কিন্তু লালমোন ভিড়ের মধ্যে তাহাকে চিনিতে পারিলনা। চলিয়া যাইবার পূর্বে মালিনীর অসাক্ষাতে বাদশাজাদা মসজিদের দক্ষিণ গায়ে নিজের দুঃখকাহিনী লিখিয়া রাখিয়া গেল। পরদিন সকালে লালমোন মসজিদ দেখিতে আসিয়া সেই লেখা পড়িল এবং তখনি উজীরকে হুকুম দিয়া শহরের সমস্ত মেড়া হাজির করাইল। তাহার মধ্যে মালিনীর মেড়া না দেখিয়া মালিনীর ঘরে পেয়াদা পাঠাইয়া মালিনী ও মেড়া আনাইল। মালিনীকে অনুরোধ করা হইল মেড়াকে মানুষ করিয়া দিতে। মালিনী বলিল, "একথা শুনি নাই যে মেড়া মনুষ্য হয়।"

এতেক শুনিয়া লাল গোঁসায় জ্বলিল
মালিনীকে মারিতে তবে হুকুম করিল।
হুকুমে মারিয়া খাল উখালিয়া দিল
অবশেষে সেই মেড়া মনুষ্য করে দিল।

স্বামীকে পাইয়া লালমোন মহাতাবকে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বিদায় চাহিলে মহাতাব তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাপমায়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া সকল কথা জানাইল। বাদশা লালের কাছে গিয়া মহাতাবকে তাহার স্বামীর হাতে দিয়া সেইখানে তাঁহার পুত্রবৎ রাজ্য করিতে অনুরোধ করিল। লালমোন তখন সত্যপীরের মানত শোধ করিল।

সও লাক টাকার শিরনি আনিল ধাইয়া
সত্যের শিরনি লাল দিলেন বাটিয়া
মক্কায় বসিয়া পীর হাসেন নারায়ণ
এতদিনে আমারে বুঝিলেন লালমোন।

শেষের ভনিতায়ঃ-

আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়্যা যায়
হুকুম সত্যের যে আরিফ কবি গায়।
এইখানে এই কেচ্ছা হইল তামাম
বদন ভরিয়া লেহ সত্যপীরের নাম।
(১ পৃষ্ঠা-৪৭৬ থেকে ৪৮১)।

এই কাহিনীতে কিন্তু প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন-লাল উজীরজাদী আর তার প্রেমিক বাদশাজাদা। তাদের প্রেমে লুকোচুরির প্রয়োজন থাকলেও গোপন বিয়ে এবং দেশ ছেড়ে পালানোর প্রয়োজন ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ ফেঁসেড়ার বালক সন্তানের কি হল তা বলা হয়নি। তৃতীয়তঃমহাতাবের সাথে চন্দ্রবেশী লালের বিয়ের সময় লালের কি পরিচয় দেয়া হয়েছিল

www.pathagar.com

তাও বলা হয়নি। চতুর্থতঃ মালিনীর কি হল তাও বলা হয়নি। তবে হাঁ, একথা স্বীকার করতে হবে যে, গল্পটি পাঠকের মন আকৃষ্ট করে।

বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীর-সত্যানারায়ণ কাহিনীর মধ্যদিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা মিলন প্রচেষ্টা হইতেছিল এবং সে প্রচেষ্টা দুই তরফেই। হিন্দুরা পীর-গাথার লেখক, মুলমানেরা পীর-গাথার গায়ক। (১ পৃষ্ঠা-৪৭০)। সত্যপীর বা সত্য নারায়ণ দেবতা নহেন, মানব সন্তান এই মর্তেরই মানুষ।

সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে মানিক পীর এবং ত্রৈলোক্য পীরের কথাও রয়েছে।

মানিক পীর সুফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা যিশুর (ইশা) স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যিশুর সঙ্গে অভিন্ন।...... অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানের মত মানিকপীরের গান পথে-ঘাটে এবং তার পাঁচালী পীরের আস্তানায় শোনা যাইত। এই গানের গায়ক ও বাদক প্রায়ই মুসলমান। (১ পৃষ্ঠা-৪৮৫)।

মানিক পীরের প্রশস্তি, গানের নমুনা-

মানিকপীর, ভবপারে যাবার লা
জয়নাল ফকিরি নেলে, ফেনি খালে না।
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, নবি কর সার
মাজা দুলিয়ে চ'লে যাবা ভবনদী পার।
ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মান্‌ষির মাথায় কেশ
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পালা কল্লাম শেষ।

(১ পৃষ্ঠা-৪৮৫-দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে উদ্ধৃত)।

আজিমাবাদের ধানশিষ্যা গ্রামের রহিমের পুত্র অনাথ ফকিরের মানিক পীরের গীত নিম্নরূপঃ-

কৌউসে নোটায়্যা শির — বন্দিব মানিক পীর
পয়দা সব মানিকের ডেরে।
মানিক পয়দা হইল — এলাহি খবর পাইল
ব্যাধি করিল করতারে।
ব্যাধি করিল যত — তাহা বা কহিব কত
জবরিল মাঙ্গাইল সাঞি
এলাহি কহিল বাত — শুন জবরিল এই মত
মক্কায় চলিয়া যাও ধাঞি।
যত পীর পেকাম্বরে — আছিল মক্কা শহরে
বলাইয়া আন সভাকারে
আউল্যাগণে কহে বাত — ছাতি পরে দিয়া হাত

www.pathagar.com

তলব করহ কোন তরে।
এলাহি কহিল বাত শুন সভে এই মত
ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়া
যতেক আউল্যে ছিল ব্যাধির খবর পাইল
হেট শিরে রহিল বসিয়া।
বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়্যা নিল
ব্যাধিগণ সঁপিয়া দিল তারে
ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহা বা কহিব কত
যান দেওয়ান দুনিয়ার উপরে।
মানিকের কৌউস তলে গরিব ফকির বলে
তোমা বিনে নাহিক ভাবনা
এই যে আরজ করি রাখিবে আমার পুরী।
পূর্ণ কর নায়েকের বাসনা।

....

অনাথ ফকিরে গান রহিমের সন্তান
আজিমাবাদে ধানসিষ্যে যার জন্মস্থান।
মানিক ভাবিয়া গীত অনাথ ফকিরে গান
আজিমাবাদ ধানশিষ্যা যার জন্মস্থান।

....

মানিক ভাবিয়া গীত অনাথ ফকিরেতে গায়
আল্লা আমিন বল সভে দুই পালা হইল সায়।

হেয়াৎ মামুদের 'আম্বিয়া বানী'র' (১৭৫৭) বন্দনা অংশে দুই ভাই মানিক পীর ও শাহাপীরের কেরামতির ইঙ্গিত আছে।

মানিক পীর শাহা পীর বন্দো দুই ভাই
মারিয়া গোঠের গাবী দিয়াছে জিয়াই।
(১ পৃষ্ঠা-৪৮৬, ৮৬ ও ৮৭)

নাথ-গুরু মৎস্যেন্দ্র ও স্থানীয় যোদ্ধা-পীর মসনদ-আলী মিলিত হইয়া মছলন্দী বা মোছরা পীরে পরিণত হইয়াছেন।......পূর্ব বঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনারায়ণ––এই তিনে মিলিয়া ত্রিনাথ বা ত্রৈলোক্যপীর হইয়াছেন।

মোচরাপীরে কহে কথা সত্যপীরের ঠাই
ত্রৈলোক্যপীর আছে মোর জেষ্ঠ ভাই।
(৬ পৃষ্ঠা-২৪)।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, মানিক পীর, মোছরা পীর এবং ত্রৈলোক্য পীরের গান আসলে হিন্দু-মুসলমান মিলনের গান। এই ঐক্যের সূর গরীব উল্লার 'ইউসুফ জোলেখায়' ও রয়েছে। যেমন-

আসরে বসিয়া যত হিন্দু-মুসলমান
সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান। (৪ পৃষ্ঠা-২১৮)।

বস্তুতঃ সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, মানিকপীর, মোছরাপীর, ত্রৈলোক্যপীর এর পাঁচালী লেখক হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক হলেও তাঁদের মনে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা তা তাঁদের লেখা থেকে স্পষ্ট। তাঁদের কাছে পীর ও নারায়ণ ছিল অভিন্ন। সকল সম্প্রদায়ের লেখকেই আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন নিজ নিজ কাব্যে। হিন্দু লেখকদের আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার তাঁদের উপর মুসলিম লেখকদের প্রভাবেরই ফল। বস্তুতঃ মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান কবিদের এসব পাঁচালী ছিল ঐক্যের প্রতীক।

তথ্যপঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড-অপরার্ধ) ইস্টার্ণ পাবলিসার্স, কলকাতা। ১৯৭৫

২। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা-৭ম সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩

৩। সেক শুভোদয়া-এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৩।

৪। গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা। (১ম খন্ড) বাংলাদেশ সংস্করণ মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯

৫। দীনবন্ধু মিত্র-জামাইবারিক (নাটক)।

৬। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-১-১

৭। ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর-মানসিংহঃ অন্নদা মঙ্গল-বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ উদ্ধৃত।

৮। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম। ভারতী বুকষ্টল, কলিকাতা, ১৯৯৩।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও তার কবি

পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সুন্দর পতি,-এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি। (১ পৃষ্ঠা-৪৯৫)। প্রণয়-কাহিনীর একটা পরিণতি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে। (২ পৃষ্ঠা-১৯৯)। বিদ্যাসুন্দর পাঞ্চালী কাব্যের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীতে। দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি। শা বিরিদের (সাবরিদ খান) কাব্য আদ্যন্ত-শ্রীধরের কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (সাবরিদ খান ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। সপ্তদশ শতাব্দীতেও অন্ততঃ দুইজন, কৃষ্ণরাম দাস ও কবিবল্লব প্রাণরাম চক্রবর্তী বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়া ছিলেন।..... অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ সাত-আটজন লেখক বিদ্যাসুন্দর পাঞ্চালী লিখিয়া ছিলেন- কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, কবিরত্ন নিধিরাম আচার্য, রাধাকান্ত মিশ্র ও কবীন্দ্র চক্রবর্তী। (৩ পৃষ্ঠা ১৫৫/১৫৬)।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র (রায়গুণাকর)। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখ্য কবি, এবং ইঁহার আন্নদা মঙ্গল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। মুকুন্দরামের কাব্য যেমন পরবর্তী প্রায় সকল 'মঙ্গল'-কাব্যরচয়িতাকে প্রভাবিত করিয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যও তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাব্যকলা প্রভাবিত করিয়াছিল। (ঐ পৃষ্ঠা-১৫৬)।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মুল অবশ্য অনেক পিছনে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা।....এর গোড়া গুজরাটের রাজধানী 'অনহিল-পত্তনে,' ইংরেজী ১১শ শতকে।-এ মতে কাশ্মীরী পন্ডিত বিহলনের 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর ৫০টি শ্লোকই হল এর মূল।....কিন্তু শুধু চৌরপঞ্চাশৎ-এর কাহিনী নয়, বাঙলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মধ্যে দুটি বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়।......তার একটিতে বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষ করে বিদ্বান গুরুর সঙ্গে ছাত্রী সুন্দরী রাজকন্যার প্রণয় সঞ্চার। দ্বিতীয় গল্পটিতে আছে বাধা সত্ত্বেও প্রণয়ী কবির সঙ্গে প্রণয়িনী রাজকুমারীর গোপন মিলন। এটির প্রধান দৃষ্টান্ত অবশ্য কাশ্মীরের কবি বিহলনের (দ্বাদশ শতাব্দী?) চৌরপঞ্চাপৎ। (২ পৃষ্ঠা-১৯৯-২০০)।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী হচ্ছে -(১) বিদ্যাশিক্ষা অথবা পান্ডিত্যবিচার উপলক্ষ্যে কবিপন্ডিত গুরু ও কলাবিৎ রাজদুহিতা ছাত্রীর মধ্যে প্রণয় ঘটনা। (১পৃষ্ঠা-৪৯৫)। (২) বিদেশী রাজপুত্র সুন্দর মালিনীকে দূতী করিয়া রাজকন্যা বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে।

www.pathagar.com

কন্যার গোপন প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিয়া বিদ্যার মাতা স্বামীকে বলিয়াদেন। রাজা কোটালকে দিয়া সুন্দরকে ধরিয়া আনেন এবং প্রাণদন্ডের আদেশ করেন। সুন্দর কালীর ভক্ত ও বরপুত্র ছিল। সুতরাং যথা সময়ে দেবী আবির্ভূত হইয়া বিপন্ন ভক্তকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিলেন। সুন্দরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।.... এই গল্পের বীজ বিহলনের চৌরপঞ্চশিকা-নামক সংস্কৃত কবিতায় পাওয়া।.... সেকালে দেবদেবীর কথা না থাকিলে তাহা সাহিত্যই হইত না।....(তাই এই গল্পে) সুন্দর চোর সাজিয়া বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল-এই সূত্রে সে কালীর উপাসক হইয়া দাঁড়াইল।.....(বস্তুতঃ এই গল্পে) ধর্মের ছাপ লইয়া কাহিনীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে। (৩ পৃষ্ঠা-১৫৬)। একথা স্বীকার্য যে ধর্মের রাঙতামোড়া হলেও এটি অবশ্যই একটি লৌকিক কাহিনী হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সহস্রাব্দের প্রারম্ভের তিন চারি শতাব্দ হইতে এই কাহিনীর বিভিন্ন রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।.....চতুর্দশ শতাব্দের শেষের দিকে জৈন-কবি রাজশেখর সুরীর লেখায় প্রথম কাহিনীটি হইতেছে এইরূপঃ- উজ্জয়িনীতে এক দিগম্বর জৈন সাধু ছিলেন, নাম বিশালকীর্তি। তাঁহার এক শিষ্য মদনকীর্তি। মদনকীর্তি পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর এই তিনদিকের তার্কিকদের জয় করিয়া "মহাপ্রামাণিক-চূড়ামণি" উপাধি পাইয়া আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিল। শিষ্যের খ্যাতি লোকপরম্পরায় আগেই গুরুর কর্ণগোচর হইয়াছিল। সাক্ষাতে পাইয়া গুরু শিষ্যকে খুব প্রশংসা করিলেন। মদনকীর্তিও তাহাতে খুব প্রমোদিত। কিছুদিন পরে মদনকীর্তি দক্ষিণদেশ বিজয়ে যাইবার জন্য গুরুর অনুজ্ঞা চাহিল। গুরু বলিলেন, দক্ষিণদেশে যাইওনা, ও দেশ ভোগনিধি, ওখানে গেলে জ্ঞানবান্ তপস্বীও তপোভ্রষ্ট হয়। গুরুর নির্দেশ না মানিয়া বিদ্যামদমত্ত মদনকীর্তি নিজের শিষ্য ও লোকজন লইয়া মহারাষ্ট্রবাসী পন্ডিতদের জয় করিয়া কর্ণাটদেশে পৌছিল। সেখানে কুন্তীভোজ রাজাকে কবিতা শক্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিল। রাজা তাহাকে প্রাসাদের কাছে বাসা দিয়া বলিলেন, আমার পূর্বপুরুষদের প্রশস্তিকাব্য রচনা কর। মদনকীর্তি বলিল, আমি মুখে মুখে প্রত্যহ পাঁচশত শ্লোক রচনা করিতে পারি কিন্তু লিখিয়া উঠিতে পারিনা, আমাকে একজন লিখিবার লোক দিতে হইবে। রাজা বলিলেন, আমার কন্যা মদনমঞ্জরী পর্দার আড়ালে থাকিয়া লিখিয়া লইবে। এইভাবে কিছু দিন কাব্য রচনা চলিল। মদনকীর্তির সুকন্ঠের শ্লোক-আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে মদনমঞ্জরীর একদিন মনে হইল, ইহার রূপও নিশ্চয়ই সুন্দর, পর্দার আড়াল হইতে ইহাকে দেখা যায় কিরূপে। একটা উপায় করা যাক, রান্নায় নুন বেশী দিতে বলি। মদনকীর্তিও রাজকন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে দেখিতে উৎসুক। ভোজনে বসিয়া ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, অহো লবণিমা। রাজকন্যা উত্তর করিল, আহো নিষ্ঠুরতা। এই রকমে আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত হইলে উভয়ের মধ্যে মর্যাদাময়ী যবনিকার ব্যবধান সরিয়া গেল। রাজকন্যার রূপ দেখিয়া মদনকীর্তির কবিত্ব ছুটিল- (১পৃষ্ঠা-৪৯৫-৪৯৬)।

নিরর্থকং জন্ম গতং নলিন্যা

www.pathagar.com

যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিম্বম্।
'নলিনীর জন্ম বৃথা গেল,-সে চাঁদ দেখে নাই।'

রাজকন্যা উত্তর দিল--

উৎপত্তিরিন্দোরপি নিষ্ফলৈব
দৃষ্টা প্রবুদ্ধা নলিনী ন যেন।

চাঁদের জন্মও নিস্ফল, সে প্রস্ফুট নলিনী দেখে নাই। (৪ পৃষ্ঠা-৬৪-৬৬)।

অতঃপর কাব্য রচনা আর অগ্রসর হয়না। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কো হেতুরদ্য স্তোকং নিষ্পন্নম্? (রচনা এত কম হইল কেন?)। মদনকীর্তি চালাকি করিয়া দুই একটি কঠিন শ্লোক রচনা করে। সে উত্তর করিল, আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমার রচনার মানে যে না বুঝিবে তাহাকে আমি লিখিতে দিই না। আপনার কন্যা আজিকার শ্লোকগুলি সহজে বুঝিতে পারেন নাই। তাই আজ শ্লোক বেশী লেখা হয় নাই। রাজা বুঝিলেন, ব্যাপার সুবিধার নয়, বাঁকা কথা মনে হইতেছে। "শঠোত্তরমেবেদং দৃশ্যতে"- আচ্ছা দেখি ইহারা কি করে। পরদিন সকালে রাজা প্রচ্ছন্নভাবে একাকী যেখানে বই লেখা হয় তাহার পাশের ঘরে লুকাইয়া রহিলেন। রাজকন্যা আসিলে পূর্বদিনের প্রনয়-কলহের অবসান বাঞ্ছা করিয়া মদনকীর্তি একটি শ্লোক পড়িল। তাহা শুনিয়া উভয়ের গোপন প্রণয়ের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া রাজা মদনকীর্তিকে ডাকাইয়া মনদকীর্তির শ্লোকের গোড়াটুকু আওড়াইয়া বলিলেন, পন্ডিত, এই নূতন পদ্যটি কি? দিগম্বর পন্ডিত বুঝিল, রাজা বুঝিয়াছেন এবং অপরাধীকে পাকড়াইয়াছেন, তবুও উত্তর দিই। একটু ভাবিয়া বলিল, দেব, দুই দিন হইতে আমার চোখের পীড়া হইয়াছে, সেই জন্য এই অনুনয়সূচক পদ্যটি পড়িয়াছিলাম। এই বলিয়া সে শ্লোকটির চক্ষু-পক্ষে ব্যাখ্যা করিল। রাজা অন্তরে তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অকার্যকরণের জন্য তাঁহার রোষ গেলনা। রাজা ভৃত্যদের বলিলেন, এই কুকর্মকারীকে বাঁধ আর মারিয়া ফেল। মদনকীর্তিকে তাহারা বাঁধিয়া ফেলিল। রাজকন্যার কানে এই খবর পৌছিলে সে নিজে এবং তাঁহার বত্রিশজন সখী ছুরি হাতে লইয়া রাজার কাছে আসিযা বলিল, যদি আমার এই দয়িতকে ছাড়িয়া দেন তবে ভালো, যদি না ছাড়েন তবে চৌত্রিশ জনের হত্যার পাপ আপনার হইবে,-- এক দিগম্বর সাধুর হত্যা, আর তেত্রিশজন যুবতীর হত্যা। রাজা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল, দেব, আপনিই রাজকন্যাকে দিগম্বরের সঙ্গে জুটাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দোষ দিবেন কাহার? দিগম্বরকে মুক্ত করুন এবং তাঁহার হাতে রাজকন্যকে সমর্পণ করুন। রাজা তাহাই করিয়া রেহাই পাইলেন। মদনকীর্তি রাজ্যের অংশভাগী হইল। দিগ্‌বিজয়ের ধন শ্বশুরকে দিয়া ব্রহ্মচর্যব্রত ত্যাগ করিয়া মদনকীর্তি সংসারী হইল। (১ পৃষ্ঠা-৪৯৬-৪৯৭)।

এই কাহিনীতে অসঙ্গতি আছে। কুন্তীভোজ রাজা মদনকীর্তিকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ না দিয়ে রাজ্য থেকে বের করে দিলে কাহিনী অন্যরূপ হতো এবং রাজার জন্যে সেটিই অধিকতর সঙ্গত ছিল। কারণ, সেকালের রাজারা এ ধরনের ঘটনার প্রকাশ্য বিচার না করে হত্যাই করতেন এবং প্রকাশ্য বিচার করলে নির্বাসনই দিতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

বিহলন ও চৌরপঞ্চাশৎ লইয়া যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তাহা হইতেছে এইরূপঃ-- কনকাদ্রির উত্তরে মহাপাঞ্চাল দেশের রাজধানী লক্ষীমন্দির। সেখানে রাজা ছিলেন মদনাভিরাম, রানী মন্দারমালা। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান সুন্দরী যামিনীপূর্ণতিলকা সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিল, কিন্তু লেখাপড়ায় নয়। রাজা কন্যার জন্য ভালো শিক্ষক খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে বিহলনকে পছন্দ হইল। বিহলন উত্তম কবি এবং ষড়ভাষাভিজ্ঞ। বিহলন কুষ্ঠীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, রাজকন্যা ঘৃণা করিতেন অন্ধকে। শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ঠতা না হয় সেইজন্য রাজকুমারীকে বলা হইল তাহার শিক্ষক অন্ধ আর বিহলনকে জানানো হইল রাজকুমারীর কুষ্ঠরোগ। শিক্ষক-ছাত্রীর মাঝখানে রহিল পর্দার আড়াল। একদিন রাজকন্যা শুনিল, বসন্ত-পূর্ণিমার সন্ধ্যা বর্ণনা করিয়া শিক্ষকমহাশয় শ্লোক পড়িতেছেন। তখন রাজকন্যা বুঝিল গুরু অন্ধ নয়। তখনি রাজকন্যা পর্দা ঘুচাইয়া দিল। (৫ পৃষ্ঠা-১৭৩-৭৪)।

বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর জয়-জয়কার অষ্টাদশ শতকেই আর তা দেখা দেয় আবার দ্বিতীয়ার্ধে,-ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যখন সমস্ত শতাব্দীর মানস বিলাস রূপে রসিক জনদের মনোহরণ করে, তার পরে। (২ পৃষ্ঠা-২০০-২০১)।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর কাব্য কালিকামঙ্গল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রচনার ভাষা সহজ সরল বাংলা।

বলরাম ছিলেন কাশীজোড়ার রাজা লক্ষীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ। তিনি লিখেছেনঃ-

বিষ্ণুদাসের বংশ বিনদনে করে অংশ
ধন্যরাজা লক্ষীনারায়ণ
হইয়া ত সভাসদ বন্দিয়া কালিকাপদ
শ্রীকবিশেখর সুরচন।

বলরামের কাহিনী এরূপঃ--সুন্দরের পিতা গুণসাগর, মাতা গুণমতী, বাসস্থান উৎকল দাবিড়দেশ মানিকানগর। বিদ্যার পিতা বীর সিংহ, মাতা কুন্তী, নিবাস বর্ধমান। সুন্দরের যাত্রা পথে খুরদা, চটক পর্বত নীলাচল, ঝারিখন্ড ও বিষ্ণুপুরের উল্লেখ আছে। সুন্দরের পড়ুয়া ভূমিকায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন আছে। বিদ্যার রূপগুণের কথা শুনিয়া সুন্দর তাহাকে পাইবার আশা করিয়া কালীর পূজা করিয়াছিল। পূজা পাইয়া খুশি হইয়া দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেনঃ-

স্মরণ করিলে দেখা পাবে আমার।
লেহ মোর নিদর্শন শুআ পক্ষ হাথে
কথার দোসর হব পুত্র তোমার সাথে।
সর্ব শাস্ত্র জানে শুআ বিচারে পন্ডিত
প্রেম-আলাপনে শুআ সনে পাবে প্রীত।

www.pathagar.com

শুকের কথায় বাপ-মা ও মাধবভট্টকে না জানাইয়া সুন্দর বিদ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ধরিল পড়ুয়া-বেশ সুন্দর কুমার
উদ্দেশে গুরুর পদে কৈল নমস্কার।
স্বর্ণময় অলঙ্কার রজত মনোহর
বহুমূল্য রাখি বালা খুঙ্গির ভিতর।
করিঞা উত্তরমুখ চালিলা কুমার
শ্রীকবিশেখর বোলে দাস কালিকার।
(৬)।

প্রাপ্ত খন্ডিত অংশই সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়। বলরামের কাহিনীর সাথে সাবরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কাব্য কাহিনীর মিল রয়েছে।

গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর) একটি বৃহৎ রচনা। এটিও বিদ্যাসুন্দর এর কাহিনী। এটির উপাখ্যান এরূপঃ-- বীরসিংহ বিদ্যার পিতা। তাঁর রাজধানী রত্নপুর। সুন্দরের পিতা গুণসার, মাতা কলাবতী, জন্মস্থান গৌড়-রাজ্যের কাঞ্চননগর।

গোবিন্দ দাসের ভাষা সরল ও প্রসন্ন। সুন্দর গৃহগমনোদ্যত হইলে বিদ্যা যে পদটি গাহিয়াছিলঃ--

সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুর
ছাড়িব গোকুল-বাস জীবনের কিবা আশ
বধভাগী হইল অক্রুর।
এই সেই বৃন্দাবন কেলি কৈলা অনুক্ষণ
বসিয়া গাঁথিল পুষ্পমালা
যত সখিগণ এই প্রাণসুন্দর কই
কত না সহিব দেখ জ্বালা।
আর না দেখিব কানু আর না শুনিব বেণু
আর না কবির লাস-বেশ
এমন ব্যথিত থাকে বন্ধুরে বুঝাইয়া রাখে
বিধি বিনু নাহি উপদেশ।
ছাড়িব গোকুলচন্দ্র প্রাণে না জীবেক নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা
গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সবে
সবের আগে মরিবেক রাধা।
মথুরার নারী যত হর আরাধিল কত
জিনিতে কামের ফুলধনু
দাস গোবিন্দ বাণী বন্ধুর গমন শুনি
যমুনায় ছাড়িব গিয়া তনু।
(৭ পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬)।

www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখ্য কবি। কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু বিদ্যাসুন্দরের কবি নন-বিদ্যাসুন্দর তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের একটি অংশ মাত্র।.... ভারতচন্দ্র শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি নন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকবি-প্রতিনিধি। পলাশীর পূর্বেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি মুখপাত্র, পলাশীর পরেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি আদর্শ স্থাপয়িতা,- এবং সাহিত্যিক কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের যুগেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ সমালোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসাভাজন, অশ্রু-বিলাসী বাঙালী জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক তিনি।....... রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের রুচি, নীতি বা জীবনবোধ কোনটাই অনুমোদন করার মতো কবি নন;- কিন্তু তিনিও মনে করতেন, "রাজসভা-কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলের গান, রাজকণ্ঠে মনিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" (২ পৃষ্ঠা-২০১ ও ২০৭)।

ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের সন্তান ভারতচন্দ্র রায় বর্ধমানের রাজাদের কোপে জমিদারী হারিয়ে নিজ বিদ্যাগুণে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা এবং ফারসী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি কবিকঙ্কণের চন্ডীমঙ্গলের মতো মঙ্গলকাব্য হলেও এটিতে কবি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণাপূজা প্রবর্তন করেন। এই পূজা প্রবর্তনের পূর্ব ইতিহাস হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এই কাব্য রচনা করেন। ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করা হয়।... অন্নদামঙ্গল তিন খন্ডে বিভক্ত; প্রথম খন্ড-শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড-বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল, এবং তৃতীয় খন্ড-মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল।..... অন্নদার কৃপায় ভবানন্দের (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ) ভাগ্যোদয়, এই হল কাব্য-কথা। (২ পৃষ্ঠা-২০৩)।

ভারতচন্দ্র অগ্রগামীদের পন্থানুসরণে বলিয়াছেন যে তিনি এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয়েই দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের উক্তি অনুসারে কাব্যরচনার হেতু এই,-নবাব আলীবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বারো লক্ষ টাকা নজরানা চাহেন। টাকা দিতে দেরী হওয়ায় তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করা হয়। সেখানে রাজা দেবীর স্তব করিলে পর দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরিয়া স্বপ্নে আবির্ভূক্ত হইয়া বলেন,

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।
আমার মঙ্গলগীত করহ প্রকাশ,
কয়ে দিলাম পদ্ধতি গীতের ইতিহাস।
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়,
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়।
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়,

www.pathagar.com

মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়।
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও,
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।
আমি তারে স্বপ্নে কব তার মাতৃবেশে,
অষ্টাহ্ গীতের উপদেশ সবিশেষে।

তাহার পর

সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল সে দায়।

অন্নপূর্ণা মঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গীত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলেছিলেন,

ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন।
(১ পৃষ্ঠা-৫০৫/৫০৬)।

অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যবর্ণনা অন্নপূর্ণামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকর্তা ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তিবর্ণন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রশস্তি রচনা। (ঐ পৃষ্ঠা- ৫০৬)।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই কাব্যের দ্বিতীয় অংশ বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল। এই অংশটি মানসিংহের বর্ধমান আগমন লইয়া। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসিয়াছেন। ভবানন্দ কানুনগো, তিনিও রসদ জোগাইতে বর্ধমানে উপস্থিত। মানসিংহ বর্ধমান থাকিবার সময় সুন্দরের কাটা সড়ঙ্গ দেখিয়া ভবানন্দের নিকট বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী শুনিতে চাহিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সবিস্তারে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণিত। অর্থাৎ এই অংশ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান। (ঐ পৃষ্ঠা-৫০৭)।

ভারতচন্দ্রের কাহিনী এরূপঃ-- বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিচারে যে তাঁকে জয় করতে পারবে সে-ই হবে তাঁর পতি। কেউ বিচারে পারেনা, বিবাহও হয়না। রাজা তাই গোপনে ভাট পাঠালেন কাঞ্চীতে, কাঞ্চীর রাজা গুনসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর অসাধারণ পন্ডিত। ভাটের কাছে বিদ্যার খ্যাতি শুনে সুন্দরও এলেন পড়ুয়া রূপে বর্ধমানে। তারপর সুন্দরের বর্ধমান দর্শন। এদিকে সুন্দর-দর্শনে নারী গণের খেদ,

আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কূলে দিয়া চাই ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পাড়ে।

এদিকে সুন্দরের সঙ্গে ঘটল রাজবাটীর মালিনীর (হীরা মালিনীর) সাক্ষাৎ। .....সুন্দর বর্ধমান শহরে হীরা মালিনীর ঘরে বাসা নিলেন, বিদ্যার খোঁজ খবর করলেন। মাল্য রচনা

www.pathagar.com

করে ও শ্লোক রচনা করে হীরার হাতে পাঠালেন সেই 'করভোরু রতিপ্রাজ্ঞা'র উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না। বিদ্যার কাছ থেকেও এল তেমনি শ্লোকে রচিত উত্তর। এর পরে মালিনীর ব্যবস্থায় পালা আরম্ভ হল। প্রথম উভয়ের দর্শন, সুড়ঙ্গপথে একেবার রাজকন্যার গৃহে সুন্দরের উদয়, উভয়ের কৌতুকারম্ভ, বিচার, গন্ধর্ব-বিবাহ, বিহার। ফলে, বিদ্যার গর্ভ, রানীর কন্যাকে তিরস্কার, রাজার ক্রোধ, রাজাদেশে কোটালের চোরধরা, বিদ্যার আক্ষেপ, বন্দী সুন্দরকে দেখে নারীগণের পতিনিন্দা, রাজার নিকট চোরের শ্লোক পাঠ, এদিকে মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, কালীর অভয়দান, কালীর কৃপায় বীরসিংহেরও দিব্যজ্ঞান লাভ এবং বিদ্যা ও সুন্দরের পুনর্মিলনের শেষে বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা।...এটিই অন্নদামঙ্গলের উৎকৃষ্ট ভাগ। (২পৃষ্ঠা-২০৪/২০৫)।

সুড়ঙ্গ পথে চোরধরার জন্যে কোটালের ফাঁদ পাতার পরামর্শ এরূপঃ--

লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।
দেব উপদেব পড়ে মন্ত্রতন্ত্র-ফাঁদে
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ-ফাঁদে পড়ি কাঁদে।

সুন্দর দর্শনে নারীদের পতিনিন্দা উপলক্ষ্যে কবিপত্নীর উক্তিঃ---

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।

নারীর কোন্দল প্রসঙ্গে-

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
(১ পৃষ্ঠা ৫১০ ও ৫০৯)।

বিদ্যার উক্তিঃ---

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ্ মন টল টল।।

বিদ্যার দরবারে-

তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।।
(২ পৃষ্ঠা-২০৬ ও ২০৮)।

এই কাহিনীতে অসঙ্গতি আছে। বলা হয়েছে, সুন্দর রাজপুত্র। সুতরাং রাজকন্যার সাথে প্রেম করতে তাঁর চোর সাজার প্রয়োজন ছিলনা। তবে হিন্দু লেখকেরা যে কোন

www.pathagar.com

কাহিনীতে দেব-মাহাত্ম্য যোগ করতেন বিধায় এটিতেও তাই করা হয়েছে। অস্বাভাবিকতা আরোপ করা হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভার বিশেষ পরিচয় মেলে অন্নপুর্ণামঙ্গলের গানে। যেমনঃ-

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া।
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
একহাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
দিতে পার চতুর্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া।
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পারশিয়া অন্নসুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া।।

ভারতচন্দ্রের নিম্নের গানটি বাঙ্গালা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতাঃ-

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজুলিতে ময়ুরে নাচাও হে।
নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মধুসুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে।
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে,
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমন চাহে সেই মত চাও হে।

অথবা-

রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিতে না ধৈরজ ধরে পিক কলকল
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢলঢল।
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে
যায় যাক জাতি কূল কে চাহে তার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে।
(১ পৃষ্ঠা-৫১০-৫১১)।

www.pathagar.com

মানসিংহের আগ্রহ পূরণের জন্যে কাব্য রচনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র বলেছেনঃ-

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিৎ সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী।।
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু যে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহিভাষা যাবণী মিশাল।।
প্রাচীন পন্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।
(২পৃষ্ঠা-২০৭)।

মানসিংহ মোগল সেনাপতি। মোগলের রাজদরবারের ভাষা ফারসী, ধর্মীয় ভাষা আরবী, ভারত সাম্রাজ্যের সাধারণ ভাষা হিন্দী। কবি ভারতচন্দ্রের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু তিনি বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী ভাষায় শিক্ষিত। তাই মোগল সেনাপতি মানসিংহের আকাংখা পুরণের জন্যে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করলেও তাতে আরবী ফার্সী হিন্দী শব্দের মিশাল দিয়ে কাব্যকে রসাল করার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি তাঁর কাব্যে শব্দ গ্রহণ করেছেন যাচাই করে, বাছাই করে ও ওজন করে, বাক্য রচনায় উপযোগতিার জন্যে, ফারসী ও হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করেছেন লালিত্য গুণের জন্যে এবং এজন্যেই তিনি বলেছেন 'ভাষা কাব্যরস লয়ে।'

সুকুমার সেন বলেছেন, ফারসী না শিখিলে ভারতচন্দ্র মহত্তম কবি হইতেন কিনা বলিতে পারিনা তবে তাঁহার কাব্যের উপাদেয়তা কমিত, সন্দেহ নাই। (১পৃষ্ঠা-৫০৪)।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতচন্দ্র জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ফারসী শিখলেও তাঁর কাব্যে ফারসী ভাষা প্রয়োগ ইতোপূর্বেকার মুসলিম লেখকদের প্রভাবেরই ফল।

ভারতচন্দ্রের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সাথে ষষ্টদশ শতাব্দীর মুসলিম কবি সাররিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর মিল রয়েছে। মনে হয় যেন, উভয়েই একই কাহিনীর কাব্যরূপ দিয়েছেন। তবে হাঁ, ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য এবং শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতাগুণে তাঁর কাব্য অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্য, বিশেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দর অংশটি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি কলিকাতা অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেই কারণে কাব্যটির বহুসংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-৫০৩)। বাংলাদেশে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই যে এই কাহিনী জানেনা, বা চুরি করেও এই বিদ্যাসুন্দর পড়েনি।.....(ভারতচন্দ্রের) প্রভাব কত ব্যাপক ও কত দীর্ঘ স্থায়ী হয়েছিল তা তখনকার সাহিত্য ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারব-হালহেডের ব্যাকরণ (খৃঃ ১৭৭৮), ফরষ্টারের অভিধান (খৃঃ ১৭৯৯-১৮০২) ও লেবেডফের ব্যাকরণে (খৃঃ ১৮০১) ভারতচন্দ্রের বহু উধৃতি মিলে। (২ পৃষ্ঠা-২০৫ ও ২১১)।

www.pathagar.com

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যের যুগবিচারে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি। বৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধির ছটায়, বাক্যের ঘটায়, সব্যঙ্গ রসিকতায়, বিকার-বিলাসিতায়, তাঁকে সে যুগের মুখপাত্র মনে করতে পারি। (২ পৃষ্ঠা-২১০)।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাংলা সাহিত্যের মুসলিম লেখকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই ভারতচন্দ্রের পক্ষে তাঁর কাব্যে সাহসিকতার সাথে আরবী, ফারসী, হিন্দি শব্দ দু'হাতে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং যাচাই, বাচাই ও ওজন করে গৃহীত শব্দ তাঁর কাব্যকে অসামান্য করে তুলেছিল। ফলে তিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ও মুখ্য কবি হতে পেরেছিলেন, একথা স্বীকার্য।

তথ্যপঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ) ইষ্টার্ণ পাবলিসার্স, কলিকাতা। ১৯৭৫।

২। গোপাল হালদার-বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০

৩। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩

৪। প্রবন্ধকোষ-শ্রী জিনবিজয়ী সম্পাদিত, ১৯৩৫ ।

৫। রহস্য সন্দর্ভ, ১ম পর্ব, একাদশ খন্ড।

৬। বলরাম চক্রবর্তী কবি শেখরের কালিকামঙ্গল। সম্পাদক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রকাশক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৭ ।

৭। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-৯।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ত্রিপুরার রাজ সভায় সাহিত্য চর্চা রাজমালা, চম্পক বিজয় ও কৃষ্ণমালা কাব্য

বৃহৎ বঙ্গের ক্ষুদ্র পার্বত্য সামন্ত রাজ্য ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল বাংলা। সামন্ত রাজ শাসনের সময় যেমনি ঠিক তেমনি করদ রাজ্য হিসেবে শাসিত হওয়ার সময়েও ঐ রাজ্যে রাজভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। 'ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উৎসাহ বৰ্দ্ধক ছিলেন, তাহার এক প্রমান এই যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-২৬৬)। উল্লেখ্য যে, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। সুতরাং একথা বলা সঙ্গত যে, ছয় শতাধিক বছর আগেই বাংলা ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল।

সে সময় বাংলা ভাষা শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজের রাজদরবারেরই ভাষা ছিল না, এই ভাষায় সেই সুদূর অতীতে, মধ্যযুগে সাহিত্য চর্চাও হয়েছে। "..... ত্রিপুরা রাজ্যের লেখকেরা..... পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে 'রাজমালা' নামে বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের চারটি খন্ড এবং 'চম্পক বিজয়' ও 'কৃষ্ণমালা' নামে আরও দু'টি মুল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ...." (২ পৃষ্ঠা-২৮০)।

ত্রিপুরার মহারাজা ধর্মমানিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খৃঃ) 'রাজমালা' বঙ্গীয় পদ্যে লিখিতে আরম্ভ হয়। (১ পৃষ্ঠা-২৬৬)। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, 'প্রাচীন রাজমালার প্রথম খন্ড পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিপুরারাজ ধর্মমানিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খন্ড ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অমর মানিক্যের রাজত্বকালে, তৃতীয় খন্ড সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গোবিন্দমানিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খন্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমানিক্যের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল বলে 'রাজমালায়' লেখা আছে। ..." (৩ অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৫০)।

রাজমালার দুটি রূপ বর্তমানে প্রচলিত, একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক। প্রাচীন রাজমালার একটি পুথি (নং ২২৫৯) এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। পুথিটি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই পুথির লিপিকরের নাম পুথির ৪৯ খ ও ৫৫ খ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে-'রামনারায়ণ দেব।............এই পুথি থেকে চারটি খন্ডেরই রচনার ইতিহাস জানা যায়। ত্রিপুরারাজ

www.pathagar.com

ধর্মমানিক্যের রাজত্বকালে 'রাজমালার' প্রথম খন্ড রচিত হয়।.......... ধর্মমানিক্যের সভাসদ দুর্লভেন্দ্র চোন্তাই এবং ব্রাহ্মণ কুমার শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর মুখেমুখে ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করে যান এবং তা, অবলম্বন করে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি এই খন্ডটি রচনা করেন। কারও কারও মতে দুর্লভেন্দ্র চোন্তাই অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করেন এবং শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তা লিপিবদ্ধ করেন।

দ্বিতীয় খন্ড রচিত হয় ত্রিপুরারাজ অমরমানিক্যের রাজত্বকালে। (অমরমানিক্যের ১৫৭৭-৭৮ ও ১৫৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে)। দ্বিতীয় খন্ডের বিষয়বস্তু অমরমানিক্যের রাজসভায় ১০৫ বছর বয়স্ক সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ বিবৃত করেন। এরও লেখকের নাম জানা যায় না।

তৃতীয় খন্ডটি রচিত হয় ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমানিক্যের (রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটকের নায়ক) রাজত্বকালে। (গোবিন্দ মানিক্যের ১৬৫৯-৬০ ও ১৬৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে)। দুর্গামণি উজীরের মতে তৃতীয় খন্ডের রচয়িতা বা বক্তা দ্বারপন্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ, কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

রাজমালার চতুর্থ খন্ডটি রচিত হয় রাজা কৃষ্ণমানিক্যের রাজত্বকালে-১৭৬০ থেকে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কৃষ্ণ মানিক্যের অনুরোধে জয়দেব উজীর বিশ্বাসনারায়ণ নামক একজন লেখককে দিয়ে এই খন্ডটি রচনা করান। একমাত্র এই খন্ডেরই লেখকের নাম সঠিকভাবে জানা যায়। (২ পৃষ্ঠা-২৮০-১৮১)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত পুঁথিটিই (নং ২২৫৯) প্রাচীন রাজমালা। এটিতে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবেঃ-

শ্রীধর্মমানিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজ্যবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুঁথি।।
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা।
অতঃপর নৃপাচার্য্য না হইয়াছে গাথা।।
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুঁথি।।
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন।।
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দন্ড সাম দান নীতিতে প্রধান।।
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ-কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার।।
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী।

www.pathagar.com

দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চণ্তাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান।।
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কখন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ।।
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।
বংশ-কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ প্রতি।।
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চন্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর।।
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
বাজারে কহিল তিনে বংশের কখন।।
রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা।
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষণমালিকা।।
হরগৌরিসম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখন্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে।
এই চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়।
(৪- দুর্য্যখন্ড-প্রথম অধ্যায়)।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত রাজমালাতে রাজা ধর্মমানিক্যকে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বলছেন,

কল্যাণ মাণিক্য হবে গুণের সাগর।।
কতকাল পরে সে জন্মিয়া এই কূলে।
বহু রাজ্য শাসিবেক নিজ বাহুবলে।।
শৌর্য্য ধৈর্য্য হইবেক ত্রিলোচন সম।।
করিবে অনেক যুদ্ধ অনেক বিক্রম।।
(৫ পৃষ্ঠা-২০/২১)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে যখন রাজমালার তৃতীয় খন্ড রচিত হয় তখন গোবিন্দমাণিক্যের পিতা কল্যাণমাণিক্যের এই প্রশস্তি প্রথম খন্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।...... প্রথম খন্ডে রাজাদের পৌর্বাপর্য যেভাবে দেওয়া আছে, তা-ও মুদ্রার সাক্ষ্যের ফলে অনেকাংশে ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে।....তাই দুর্গামণি উজীর পুরাতন রাজমালা সম্পর্কে বলেছেন,

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে, পর পূর্বের কত।
সেই কারণে লোকে নাহি বুঝে তত।।
(৩ অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৫১)।

দুর্গামণি উজীর প্রাচীন 'রাজমালা' সংশোধনের কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন,

পরাতন রাজমালা আছিল রচিত।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গেত অলগ্নিক ভাষা কুৎসিত।।
....
বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল (শুদ্ধ করিল) পুনি উজীর দুর্গামণি।।
(৯ পৃষ্ঠা-১৮)।

রাজমালার দ্বিতীয় খন্ডে (প্রাচীন রাজমালা, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ধন্যমাণিক্যের বাংলায় অভিযান এবং বাংলার সুলতানের বাহিনীর ত্রিপুরা অভিযানের কথা বলা হয়েছে। কাব্যাংশটি নিম্নরূপঃ-

কালক্রমে মহারাজ বলবন্ত হৈল।
বঙ্গ অধিপতি হৈব মনে ইহা কৈল।।
গঙ্গামণ্ডল, পাটীকারা মেহেরকুল নাম।
কৈলাশহর বেজোড়া আদি ভানুগাছ গ্রাম।।
বিষ্ণুজুড়ি লাঙ্গলা জিনিল অনুক্রমে।
জিনিল ইসব দেশ আপনা বিক্রমে।।
বরদাখাত আছিল গৌড়ের অধিকারে।
নিজ বাহুবলে রাজা জিনিল তাহারে।।
প্রতাপরায় নামে তার জমিদার ছিল।
গৌড়েতে না মিলে সেই আইসে নিজ দল।।
এহিরূপে নানা দেশ জিনিল সকল।
নিজ ছত্র তলে তাকে না মিলে খন্ডল।।
তবে রাজা সৈন্য দিয়া বৈসাইল থানা।
লস্কর করিল রাজা নিজ একজনা।।
আমল করিয়া যদি সর্ব্ব সৈন্য আইল।
খন্ডলের লোকে তবে লস্কর ধরিল।।
গৌড়রাজ্যে লৈয়া চলে বান্দিয়া তাহারে।
কতদিনে দিল নিয়া গৌড় অধিকারে।।
হস্তীতে মারিতে আজ্ঞা করে গৌড়েশ্বরে।
তাহাকে মারিতে নিছে বান্দিয়া জিঞ্জিরে।।
লস্করে জানিল তবে মরণ নিশ্চয়।
একজনের হাত হতে খড়গ কাড়ি লয়।।
মারেন বিংশতি জন বিক্রম করিয়া।
মাহুতে টুয়াইল হস্তী অঙ্কুস মারিয়া।।
হস্তী হস্ত খড়েগ কাটে মারে তরবার।
ভঙ্গ দিল সেই গজে করিয়া চিৎকার।।

www.pathagar.com

আর মহা মত্ত গজ দিল টুয়াইয়া।
দন্তেতে মারিল চোট বিক্রম করিয়া।।
ধন্য ধন্য বলি তাকে কহে সর্ব্বলোকে।
এমত বিক্রম লোক পর্ব্বতেত থাকে।।
আর চোট মারিতে খড়্গ ভাঙ্গি গেল।
পড়িয়া হস্তীর হাতে পরাণ তেজিল।।
ই কথা শুনিয়া পরে বলে গৌড়েশ্বর।
আপনার কর্ম দোষে সেখানে মরিল।।
শ্রীধন্যমানিক্য রাজা ই কথা শুনিল।
অগ্নিসম হইয়া ক্রোধ জ্বলিতে লাগিল।।
রাইকছাগ সেনাপতি পাঠাইয়া দিল।
খন্ডলের লোক তবে আসিয়া মিলিল।।
খন্ডল দেশেতে ছিল দ্বাদশ বসিক।
রাজার সাক্ষাতে নিল করিয়া রসিক।।
একদিন বলে রাজা বসিকের স্থানে।।
কালি তোমি সব আইস আমা বিদ্যমানে।।
সংকেত শিখাইল রাজা সব ত্রিপুরাকে।
মারিতে কহিল রাজা সবে একে একে।।
মিত্রতা করিতে আমি বলিব জখনে।
তোমরা তারার শির কাটীবা তখনে।।
আমিহ কাটীব তবে প্রধান বসিক।
আগে বসাইব মান্য করিয়া অধিক।।
ইসব মন্ত্রণা শুনি রাজসৈন্যগণে।।
সুসজ্জ হইয়া আইল আপনার মনে।।
বসিক সকল আইল রাজা ভেটীবারে।
সঙ্গে দুই হাজার সেনা লৈয়া ধনুঃশরে।।
বসিয়াছে মহারাজা সিংহাসনপরে।
বসিক সকল নিয়া বৈসাইল উপরে।।
এক এক ত্রিপুরেত এক বঙ্গজন।
পংক্তিক্রমে দাড়াইল বন্ধুতা কারণ।।
রাজআজ্ঞা অনুসারে দাড়াইল গিয়া।
ইসারাতে কৈল সেলামবাজি দিয়া।
প্রণাম করিতে বসিক মস্তক নামায়।
সেইকালে মারণের সময় যে পাএ।।
প্রধানকে নরপতি আগে দিল কাটা।

www.pathagar.com

পরেতে ত্রিপুরে কাটে যার যেই বাঁটা।।
এহি মতে নাশ কৈল খন্ডলের প্রজা।
সসৈন্যে খন্ডল দেশে গেল মহারাজা।।
লুটীয়া কাড়িয়া সব নির্দ্ধন করিল।
তবে সে খন্ডল দেশ আপনা হইল।।
দেশে আইসে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মে করে নিষ্ঠা।
মঠ দিয়া ধন্যসাগর করিল প্রতিষ্ঠা।

....

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা চাটীগ্রাম চলে।
চৌদ্দস পাচত্তিস শকে নিজ বাহুবলে।।
চাটীগ্রাম বিজয়ী বলি মোহর মারিল।
গৌড়েশ্বরের সৈন্য সব ভঙ্গ দিয়া গেল।।
হোসন শাহা গৌড়পতি ই কথা শুনিয়া।
গৌরাই মল্লিক ভেজে বহু সৈন্য দিয়া।।
দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল মল্লিকের সাতে।
বহুল কটক দিল নিজে ছিল জতে।।
বহুতর তরী বর গোমতী কারণ।
গজ বাজী বহু সাজে করিবারে রণ।।
সাহেক মেহেরকুল আসিলেক বল।
গজ কাছে বড় নাচে পাইয়া রঙ্গস্থল।।
কোটফাটে চোট মারে হইয়া আনন্দ।
রাজার প্রজার মাঝে হৈল নিরানন্দ।।
শরে মারে ধারে কারে পড়ে রাজসেনা।
চলে বলে দলে করে চন্ডীগড় থানা।।
পাছে পাছে কাছে কাছে গেল গৌড় সেনা।
গোড়াই ভোড়াই হৈল না মারিয়া থানা।।
ছিলে খোজা দিলে রোজা বান্দিতে গোমতী।
কাটে মাটী পরিপাটী যত্ন পাইতে অতি।।
মনে করে চান্দ ধরে যুক্তি কৈলে সারা।
ছিলে যদি দিলে বিধি মরিবে ত্রিপুরা।।
তিনদিন গতিহীন রাখিল গোমতী।
চারিদিনে ভাঙ্গিয়া চলয়ে বেগবতী।।
পাঠান সুঠান নহে চাবুক লইয়া।
বারে বারে মারে ধরে কর্কশ বলিয়া।।
গুরু রোষে ভর শেষে পাঠান বর্বর।

www.pathagar.com

রঙ্গে নদী ভাঙ্গে বিধি কাঁপে থরথর।।
এত শুনি নৃপমণি হইয়া বিস্ময়।
মারে ধরে মনে করে শরীরে না সয়।।
রাখে প্রজা ডাকে রাজা গুরু পুরোহিত।
অরি তরে অবিচারে (অভিচারে) কার্য্য কর হিত।।
পরে তরে অবিচারে করিতে লাগিল।
গুরুসুতে বিধিমতে কর্ম্ম আরম্ভিল।।
সপ্তদিবা গুপ্ত কিবা মন্ডপে রহিল।
যজ্ঞশেষে কুণ্ডদেশে চণ্ডাল কাটীল।।
রায় ধরে করে করে চণ্ডালের মাথা।
মলিক হলিক যথা গাড়ে নিয়া তথা।।
শর্ব্বরীতে বর্ব্বরে যে পাহে মহাভয়।
নাশিল আসিল রাজসৈন্য এহি কয়।।
রব উঠে সব লুটে গোরাই ভাঙ্গিল।
ছাড়ি কাজ বড় লাজ দূরে তলাসিল।।
কাপুরুষ না পৌরুষ তারে কেহ করে।
শুনিয়া শুনিয়া গৌড়পতি নিলে তারে।।
কহিল সরির জেন(?) তেন তিরস্কার।
হইল রহিল তার চন্দ্রের খাঁখার।।

....

পুনরপি শ্রীধন্যমাণিক্য মহারাজা।
চাঁটীগ্রাম লইবারে পাঠাইলে প্রজা।।
মারণে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাংমর্দ্দন নারায়ণকে বৈসাইল থানা।।
রাম্বু আদি ছত্রসীক মারিয়া লইল।
রসাঙ্গ নিকটে জাইয়া পুস্করণি দিল।।
রসাঙ্গ মারিতে গীয়াছিল সেনাপতি।
সেই হতে রসাঙ্গমর্দ্দন নাম খ্যাতি।।
রাইকছাগ রাইকছম দুই সেনাপতি।
তাহাকে ভেজিলে তথা ত্রিপুরের পতি।।
চৌদ্দশ ছত্তিস শকে চাটীগ্রামে গেল।
শুনিয়া হোসন শাহা বড় ক্রোধ হৈল।।
উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।
ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল।।
ই বলিয়া হৈতন খাঁরে তৈনাথ (?) করিল।

www.pathagar.com

করবে খাঁন পাঠানেরে তার সঙ্গে দিল।।
রাঙ্গামাটি জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল।
গৌড়পতি বহু সৈন্য তার সঙ্গে দিল।।
একশত হস্তী পঞ্চসহস্র ঘোটক। '
লৈক্ষ পদাতি চলে অসংখ্য কটক।।
দ্বাদশ বাঙ্গলা চলে হৈতন খাঁর সাতে।
বিদায় করিল দিব্য সিরপারা (শিরস্ত্রাণ?) মাথে।
চলিলেক হৈতন খাঁন মহী কম্পমান।
কতদিনে উত্তরিল দেশ সন্নিধান।।
সরালি দেশেতে সে বাঙ্গলা পথ পাইল।
কৈলাগড়ে উত্তরিয়া বিশালগড়ে আইল।।
জামির খানি গড়েতে ত্রিপুরা রহে যবে।
প্রভাতে পাঠান গেলা সেই গড়ে তবে।।
খড়গরায় আদি করি আছিল ত্রিপুর।
করিয়া অনেক যুদ্ধ মারিল প্রচুর।।
মারিলেক সেই গড় হৈতন খাঁ পাঠান।
ছয়কড়িয়া গড়ে গেল রাজা বিদ্যমান।।
গগন খাঁ নামে ছিল রাজসেনাপতি।
মহা ঘোরতর যুদ্ধ কৈল মহামতি।।
আপ্তপরভেদ কিছু না করে বিচার।
এহিমতে ঘোর যুদ্ধ হৈল অপার।।
তিন প্রহর পরে যুদ্ধে গগন খাঁ ভাগীল।
হৈতন খাঁর সৈন্য মধ্যে জয়শব্দ হৈল।।
যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটী আইল।
হৈতন খাঁ সেই পথে তথাতে আসিল।।
গঙ্গানগরেত গিয়া ডোমঘাটীর পথে।
গড় ধরি হৈতন খান রহিল তথাতে।
এক মহা দীঘি দিল আপনার কাছে।
না খাইল গোমতীর জল বিষ মাখি দিছে।।
সেই হেতু তুডুক দীঘি দেশেতে প্রচার।
শ্রীদেবমাণিক্যে তাহা করিলে প্রচার।।
তবে মহারাজা রহে ছলগঙ্গার পারে।
আর জত সেনাপতি রহে থরে থরে।।
ছলগঙ্গাত্রিবেগেতে দেবদ্বার নাম।
তার কত বাঁক নামাএ মাছিছা উপাম।।

www.pathagar.com

রাজা আইল গড়পরে চাইতে শত্রুবল।
দেখিলেক মহরস (মহারাজ?) উচ্চ এক স্থল।।
নিচের বাঁকেতে গৌড়কটক রহিছে।
উচ্চেতে ত্রিপুরার গড় নির্ম্মাণ করিছে।
বসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়াতলে।
ক্রোধ হইয়া বলে রাজা ডাইন সকলে।।
আমার দেশের লোক খাইতে ভাল পার।
হৈতন খাঁরে এবে কেনে তোমরা না মার।।
নৃপতির বাক্য শুনি বলাংস (বলাংশ?) তখনে।
প্রণাম করিয়া কহে রাজা বিদ্যমানে।।
মঙ্গলবারেতে আমি শুষিব গোমতী।
সপ্তদিন এহিমতে রাখিব সম্প্রতি।।
বলাংস কথাতে নৃপতি তুষ্ট হৈল।
দুই কুলা বাহুযুগে বান্দিয়া উড়িল।।
দুইশত উচ্চ হৈল পথের কিনারা।
উড়িয়া পড়িল মধ্যে নদী হৈল চরা।।
উজানে চলিল ভাটী ভাটী হইল চর।
দেখিয়া গৌড়ের সৈন্য তুষ্ট হৈল বড়।
হোসন সাহার ভাগ্যে নদী হইল চর।
চরে জাইয়া মরা (মোরা) সবে করি বাস ঘর।।
নদীতীরে পাথরের প্রতিমা করিয়া।
হিন্দু সবে পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।।
মাছিছা বলি সেই স্থান কহে সর্ব্বলোকে।
রাগে রঙ্গে গৌড় সেনা নিদ্রা যায়ে সুখে।।
সাড় বান্দি আজ্ঞীতে সাড় বান্দিল বিস্তর।
তিন তিন পুতলা দিল সাড়ের উপর।।
দুই দুই লুকা (উল্কা) দিল পুতলার হাতে।
হাজারে হাজারে লুকা পুতলার হাতে।।
জল হতে বলাংস উঠিল তখনে।
মহাশব্দ করি স্রোত উঠিল গগনে।।
হাজারে হাজারে সাড় আসিতে লাগিল
সহস্রে সহস্রে লোক তখনে দেখিল
গৌড়পতির সৈন্য সব সুখে নিদ্রা যায়ে।
সেইকালে নদী বেগে সকল ডুবায়ে।।
হস্তী ঘোড়া উট আদি ভাসিল বেগেতে।

www.pathagar.com

নির্ব্বল মনুষ্যে পারে তাতে কি করিতে।।
জ্বলিছে আলোকা সব পুতলা হস্তেতে।
তা দেখি বলিল ত্রিপুর আসিল মারিতে।।
গৌড়সেনা নিকটে আছিল এক বন।
সেই কালে তাতে অগ্নি দিল একজন।।
নানামতে শব্দ তথা বনেরে করিল।
ত্রিপুর আসিল বলি ভয় ভঙ্গ দিল।।
সর্ব্বসৈন্য প্রলয় করিল নদীস্রোতে।
পিতাএ পুত্র না জিজ্ঞাসে ভাঙ্গে এহি মতে।।
হৈতন খাঁ করবে খাঁ সহিতে না পারে;
তবেহ বাজিলে শেষে ঘোটক উপরে।।
কাটীতে কাটীতে চলে ত্রিপুরার সেনা।
এক রাত্রি মধ্যে তবে লৈল চারি থানা।।
বহু অশ্ব গজ পরে পাইল সেইখানে।
হৈতন খাঁ কটক সঙ্গে ছিল সেই স্থানে।।
ছয়কড়িয়ার ঘাটে যাইয়া সত্য করি কয়।
এতসৈন্য আসি আমি হৈল পরাজয়।।
এহার অধিক সৈন্য যে জনে পাইবা।
সে জন নির্ভয়রূপ এদেশে আসিবা।।
এহা হতে অল্প সৈন্য যাহার নিকটে।
সত্য সত্য বলি আসি না পড় সঙ্কটে।।
যে সব পাঠান জাতি যে মোর বান্ধব।
সৈন্য হীনে যেই আইসে সে প্রাণী গর্দ্দভ।।
ই বলিয়া হেতন খাঁ গৌড়ে চলি গেল।
গৌড়েশ্বরে নিষ্ঠুর বহু তাহারে বলিল।।
৬ পৃষ্ঠা-২৫-৩১)।

এই দীর্ঘ বিবরণ থেকে ত্রিপুরার রাজা ও বাংলার রাজার (গৌড়) সংঘর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

প্রথম পর্যায়ে সূচনা হয়েছিল ত্রিপুরারাজ ধন্যমানিক্যের বাংলা-অভিযানের মধ্য দিয়ে। এই অভিযানে ধন্যমানিক্য বাংলার সুলতানের শাসনাধীন গঙ্গামণ্ডল, পাটীকারা, মেহেরকূল, কৈলাসহর, বেজাড়া, ভানুগাছ, বিষ্ণুজুড়ি, লাঙ্গলা প্রভৃতি দখল করে নিয়াছিলেন।...... অতঃপর খন্ডল অধিকারে রাখতে ধন্যমানিক্য বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল ধন্যমানিক্যের চট্টগ্রাম অভিযানের মধ্যদিয়ে এই অভিযানে তিনি চট্টগ্রাম দখল করেছিলেন, তবে রাখতে পারেননি।

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্যায়ে সূচনা হয়েছিল ধন্যমানিক্যের চট্টগ্রাম পুনঃদখল অভিযানের মধ্য দিয়ে। তবে এই অভিযানেও শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজের পরাজয় ঘটে।

এই কাব্যে কিছু অলৌকিক কাহিনী প্রবেশ করানো হয়েছে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "..... অলৌকিক কান্ড ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। এগুলিকে অবিশ্বাস করে উল্লিখিত বিবরণের (কাব্যের বিবরণের) বাকী অংশকে সত্য বলে গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, গৌড়াই মল্লিক ধন্যমানিক্যের কাছে পরাজয় বরণ করেন নি; তিনি গোমতী নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন এবং গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করে ত্রিপুরার ব্যাপক বিপর্যয় ঘটান। হৈতেন খাঁও সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করেন নি, কিন্তু এইবার ত্রিপুরারাজ প্রথমে গোমতীর জল রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করে তাঁকে খানিকটা বিপদে ফেলেছিলেন।..... অলৌকিক অংশ বাদ দিলে রাজমালা-বর্ণিত হোসেন শাহ-ধন্যমানিক্যের সংঘর্ষের বিবরণ মূলত সত্য বলেই মনে হয়। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ধন্যমানিক্য একবার বাংলার চট্টগ্রাম পর্যন্ত দখল করলেন, কিন্তু তার পরেই বাংলার সেনাপতি তাঁকে বিতাড়িত করে তাঁরই রাজ্যের গোমতী তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত জয় করে নিলেন। এর কিছুদিন পরে আবার ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অবধি জয় করলেন, কিন্তু এবারও বাংলার সেনাপতি তাঁকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে গোমতী নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করলেন এবং তার পরে খানিকটা পিছু হাট ছয়কড়িয়ায় এসে ঘাঁটি গড়লেন। সুতরাং ত্রিপুরার ছয়কড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চল যে শেষ অবধি হোসেন শাহেরই অধিকারে ছিল সে সম্বন্দে 'রাজমালার' মধ্যে স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে। (৩ অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৬২/১৬৩)।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ধন্যমানিক্য ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ) চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন, 'রাজমালার এই উক্তি সত্য। কারণ ধন্যমানিক্যের চট্টগ্রামজয়ী উপাধি সংবলিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রাগুলি ১৪৩৫ শকাব্দেই (১৫১৩-১৪ খৃঃ) উৎকীর্ণ। (৬ পৃষ্ঠা-২৬)।ডঃ অমরনাথলাহিড়ী এই জাতীয় একটি মুদ্রার আলোক চিত্র ও বিবরণ প্রকাশ করেছেন। (৭ পৃষ্ঠা-৫০৪)।

এদিকে হোসেন শাহের অধীন চট্টগ্রামের (পরাগলপুরের) শাসক পরাগলখান ও তাঁর পুত্র ছুটি খানের (নসরতখান) আদেশে যে দুটি মহাভারত লেখা হয়েছিল তাতে হোসেন শাহের কাছে ত্রিপুরা রাজের পরাজিত হওয়ার কথা উল্লিখিত রয়েছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস লিখেছেন,

সুলতান হোসেন সাহা পঞ্চগৌড়নাথ।
ত্রিপুরার দ্বার সমর্পিল যার হাথ।
(৩ অষ্টম অধ্যায় পৃষ্ঠা-১৬৪)।

শ্রীকর নন্দী লিখেছেন,

তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান।।
....

www.pathagar.com

ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহবরে গিয়া করিল প্রবেশ।।
গজবাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবনমধ্যে তাঁর পূরীর নির্ম্মাণ।।
অদ্যাপি অভয় না দিল মহামতি।
পাঠান্তর- যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি।।
(৮ এবং ১ এর ১৭০ ও ১৭১ পৃষ্ঠায় উধৃত)।

বস্তুতঃ রাজমালার অলৌকিক অংশ বাদ দিলে এই গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য এবং বিবেচ্য।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "..... বঙ্গদেশের ইহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় ইতিহাস। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি ইহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আর্যাবর্তের......বহু দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।......বঙ্গদেশের অন্যান্য রাজাগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নপর হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিদগণের কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না।....... কহলনের রাজ-তরঙ্গিনী হইতে বাঙ্গালা রাজমালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশী ছাড়া কম নহে।" (১ প্রথম খন্ডা, পৃষ্ঠা ২৬৮/২৬৭)।

বস্তুতঃ কয়েকশ বছর ধরে বহুসংখ্যক লেখকের দ্বারা রচিত রাজমালা একটি ইতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ। অলৌকিক অংশ বাদ দিলে রাজমালার অন্যান্য তথ্য ঐতিহাসিক সত্য। তাই রাজমালা বাংলার ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অংশ, সম্পূরক অংশ।

ত্রিপুরা রাজ্যে রচিত বাংলার ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে রাজমালার পরেই 'চম্পক বিজয়' ও 'কৃষ্ণমালার' নাম উল্লেখযোগ্য। চম্পক বিজয় গ্রন্থে ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় রত্নমানিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১০ খৃঃ) নরেন্দ্রমানিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্নমানিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি বর্ণিত হয়েছে। রত্নমানিক্যের অন্যতম সেনাপতি মীর খাঁ গাজীর আদেশে শেখ মহাদ্দি নামক একজন কবি এই বইটি রত্নমানিক্যের রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় রাজত্বকালে রচনা করেন।

দূর্গামনি উজীর কর্তৃক সংশোধিত 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ কৃষ্ণমানিক্যের ভাইপো রাজধর মানিক্যের রাজত্বকালে (১৭৮৩-১৮০২ খৃঃ) কবি রামগঙ্গা বিশারদ 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে কৃষ্ণমানিক্যের জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

'চম্পক বিজয়' ও 'কৃষ্ণমালা' প্রামাণিক বই। 'রাজমালা' সবটা প্রামাণিক নয়। (২ পৃষ্ঠা-২৮৩)।

www.pathagar.com

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্য (সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে) তাঁহার এক সভাপন্ডিত সিদ্ধান্ত স্বরস্বতীকে দিয়া 'নারদীয় পুরাণ' অনুবাদ করাইয়াছিলেন। গোবিন্দ মানিক্য ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাই তিনি চাহিয়াছিলেন যে এই বৈষ্ণব পুরাণখানি যেন তাঁহার সভাসদদের ও পঠনক্ষম প্রজাদের ঘরে ঘরে পঠিত ও রক্ষিত হয়। (১০ পৃষ্ঠা-১২৯)।

ডঃ সেনের উপরোক্ত তথ্য এটাই প্রমান করে যে, ত্রিপুরায় আলোচ্য তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরো কিছু কিছু সাহিত্যকর্ম হয়েছিল।

ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয় গৌড়ে হোসেন শাহী শাসনামলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরায় সাহিত্য চর্চার সূচনা হয় সংস্কৃতজ সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে নয়, বাংলার বিষয়, ত্রিপুরার রাজপরিবার নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপুরা রাজদরবারে বাংলা সাহিত্য চর্চা যথার্থ স্থান লাভ করেনি। আমরা মনে করি, গ্রন্থ সংখ্যা মাত্র তিনটি হলেও এবং ভাষা মধ্যযুগের প্রশংসিত গ্রন্থাদির ভাষার সাথে তুল্য না হলেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপুরার সাহিত্য বিশেষ স্থান পাওয়ার যোগ্য। কারণ এই তিন গ্রন্থে কবিত্ব-কুসুম না থাকলেও রয়েছে ইতিহাসের সারবস্তু।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খন্ড), সম্পাদক- অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। কলিকাতা, ১৯৯১।

২। সুখময় মুখোপাধ্যায়-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম। ভারতী বুকষ্টল, কলিকাতা, ১৯৯৩।

৩। সুখময় মুখোপাধ্যায়-বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন/ ১৯৮০

৪। কৈলাস চন্দ্র সিংহ-ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।

৫। রাজমালা, ১৯৬৭ সংস্করণ। শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার।

৬। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৫৪।

৭। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলার ইতিহাস,' মধ্যযুগ, ২য় সংস্করণ।

৮। সাহিত্য পত্রিকা, অগ্রহায়ন, ১৩০১।

৯। সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়-ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা।

১০। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-১।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিদ্যাপতি, কুৎবন ও রামাইপন্ডিত এবং তাঁদের সাহিত্য কর্ম

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। " ..... মিথিলা বাংলার পঞ্চবিভাগের এক বিভাগ ছিল এবং মিথিলার রাজসভায় লক্ষণাব্দ প্রচলিত ছিল। তাই কোন কোন লেখক (পন্ডিত) বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন।...... বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধূতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপ তিনি আমাদেরই (কবি) থাকিবেন। ....(বস্তুতঃ) বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলীদিগের দাবী তুল্যরূপ।...." (১ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা-২৫৩-২৫২)।

মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৭০-১৪৬০ খৃষ্টাব্দ। বাংলাদেশে যে সময় গিয়াসুদ্দিন রাজা ছিলেন, সেই সময় মিথিলায় বসে বিদ্যাপতি তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ পদ রচনা করে ছিলেন। অনেক মনে করেন বিদ্যাপতির সঙ্গে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের যোগাযোগ ছিল এবং বিদ্যাপতি তাঁর একটি পদে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের নাম করেছেন। (২ দ্বিতীয় অধ্যায়- পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫)। এরকম ধারনার কারণ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদের ভনিতা। ভনিতাটি এই,

> বেকতও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
>
> মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরে জীবে জীবথু গ্যাসদীন সুরতান।।

(৩)

বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন।... খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়।....... কবির আদেশে দেবশর্মা কাব্য প্রকাশের টীকার নকল করেন ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে। ...... (কবি রচিত) সংস্কৃত লিখনাবলীতে ১৪০৮ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে।...... কবির স্বহস্ত লিখিত ভাগবত ১৪০০ খৃষ্টাব্দে লেখা।..... কবির পদাবলীতে নাসির শাহের উল্লেখ আছে। নাসির শাহ ১৪২৬ হইতে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।.......সুতরাং..... কবি ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ কিংবা তদ্রূপ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫২)।

www.pathagar.com

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির জীবনকাল সম্পর্কে প্রায় একমত হয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্যে উল্লিখিত গিয়াসুদ্দিন সুলতান যে সিয়াসুদ্দিন আজম শাহ এই মত গ্রহণে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অস্বীকৃতি দুঃখ জনক। আমাদের মনে হয়, যে কারনে তিনি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেষ্টা হিসেবে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে গ্রহণ করতে পারেননি ঠিক সে কারণেই গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের কতিত্বের স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। এটা ইতিহাসের তথ্য ও যুক্তি অস্বীকৃতি। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে বিদ্যাপতির প্রশংসিত সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ভিন্ন অন্য কেহ নন।

বিদ্যাপতির পূর্ণনাম ছিল বিষয়িবারবিস্ফী বিদ্যাপতি ঠাকুর। তিনি মহারাজ শিবসিংহের সভাসদ পন্ডিত এবং চন্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন।..... গঙ্গাতীরে এই দুই কবির সম্মিলন হইয়াছিল। (১ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬)।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভুত হয় নাই- কিন্তু এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের নিকটবর্তী ছিল। এই জন্য এই সাদৃশ্য। হিন্দি, মৈথিলী........ প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়।....... পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মিথিলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে।..... (তাই) বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতির পদগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া বিদ্যাপতির নবকলেবর সৃষ্টি করিয়াছেন। (১ পৃষ্ঠা-২৭৩, ২৭২ ও ২৬০)। এজন্যেই আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলীদের দাবী তুল্যরূপ। অর্থাৎ বিদ্যাপতি মিথিলার করি হয়েও বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করে বাঙ্গালীর কবি হয়ে বসেছেন।

সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি যেমন তীক্ষ্ণ চক্ষুর অধিকারী ছিলেন ঠিক সেরূপ অলঙ্কার শাস্ত্র প্রয়োগেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। নায়িকার দু'চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তিনি নানা উপমায়। যেমন,

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মন্ডিত জনু পঙ্কজপাতা।

....

লোচন জনু খির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।

....

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ-"কজ্জ্বল-শোভিত সলিলার্দ্র চক্ষু ইষৎ রক্তাভ হইয়াছে, পদ্মদলে যেন ঈষৎ সিন্দুরের লেপ পড়িয়াছে।.....চক্ষুর তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়-মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছেনা।........ কজ্জ্বলযুক্ত চোখের বঙ্কিম চাহনিতে কৃষ্ণতারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

বিদ্যাপতি রাধিকার বয়ঃসন্ধির ছবি বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ-

ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস।।
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।।
হৃদয়জ মুকুল হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর।।
কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে।।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি।
মুকুর লেই যব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে..... বিহার।
শুনিতে রসের কথা থাপরে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত।।

অর্থাৎ রাধা কখনও (বালিকা-সুলভ উচ্চ হাস্য) হাসিয়া ফেলেন, কখনও (নবাগত যৌবনের ভারে) তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি খেলা করে। কখনও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখনও তাঁহার গতি (যুবতীর ন্যায়) মৃদুমন্দ; ফুলধনুর পাঠশালায় ইনি নূতন শিক্ষার্থী; নিজের শরীরের প্রতি আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখনও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিষয়ক কথা শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার দিকে নত করিয়া একাগ্র-কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে কান্না ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ-বিন্যাসাদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেমসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই দিকে আকৃষ্ট হন।

রাধার লজ্জা বর্ণনায়ঃ-

একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান।।
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরনী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ।।

www.pathagar.com

ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ।।

অর্থাৎ-একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুথালুভাবে বসিয়া আছি। অলেক্ষ্যে কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিক ঢাকিতে অন্যদিক মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরনী ফাটিয়া যাউক, তাহাতে প্রবিষ্ট হই।..... কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিতে পাইলেন।

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত।.....বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদের অগ্রগণ্য। (১ পৃষ্ঠা-২৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭)।

বাঙ্গালা দেশের ও মিথিলার ভাষা এক না হইলেও এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত যে পরস্পর সহজ বোধ্য ছিল। বাঙ্গালা কবিতা মিথিলায় সমাদৃত হইত এবং মৈথিলী গান বাঙ্গালায় অনুকৃত হইত।....... বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলী বাঙ্গালায়.... এক নতুন কাব্যভাষা ব্রজবুলির প্রচলন করিয়াছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যায় মৈথিল পদের অনুকরণে ব্রজবুলি পদাবলী রচনায় উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তবে সবচেয়ে বেশী বাঙ্গালাদেশে।......... বিদ্যাপতির পদাবলী শেষ পর্যন্ত মিথিলায়....... টিকিয়া থাকে নাই, ছিল বাঙ্গালা দেশে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তা এবং কীর্তনিয়াদের চেষ্টাতেই বিদ্যাপতির পদগুলি সঙ্কলিত ও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। চৈতন্য বিদ্যাপতির গান শুনিতে ভালো বাসিতেন। প্রধানতঃ- এই কারণেই বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বিদ্যাপতিকে "মহাজন" অর্থাৎ বৈষ্ণব মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়াছিলেন। (৪ পৃষ্ঠা-১১,১২,১৩ ও ১৪)।

একারণে বিদ্যাপতি বাঙ্গালী না হয়েও বাংলার কবি। তাই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতির পদগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার পরিচ্ছন্দ পরাইয়া বিদ্যাপতির যে নবকলেবরের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বাদ দিতে পারি না। (১ পৃষ্ঠা-২৬০)। তাই বিদ্যাপতি বাঙ্গালী না হয়েও এবং বাংলা ভাষায় কোন পদ বা কবিতা না লিখেও বাঙলার কবি, বাঙ্গালী কবি।

শেখ কুতবনকেও অনেক পন্ডিত বাঙ্গালী কবি বলে মনে করেন। কিন্তু কুতবন আসলে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের নন, তিনি ছিলেন জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর সভাকবি। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মৃগাবতী' প্রাচীন অধবী ভাষায় রচিত। কুৎবন সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রামাই পন্ডিত এবং শূন্য-পুরাণ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে শূন্য-পুরাণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। শূন্য-পুরাণ পুস্তকখানি প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেছে। সম্পাদকের মতে রামাই পন্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের বিকৃতরূপ ধর্মপূজার যে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।.... রামাই পন্ডিতোক্ত শূন্যবাদ বৌদ্ধধর্মেরই

www.pathagar.com

কথা।.....শূন্য-পুরাণে একান্নটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পন্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী...... রামাই পন্ডিতের রচনার উপরে পরবর্তী অনেক লেখক কারুকার্য করিতে ছাড়েন নাই। .... (১ পৃষ্ঠা-৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪)।

বইটির (শূন্য-পুরাণ) বানান পরিচিত ধরনের নয় বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে বইট খুবই প্রাচীন। কেহ বলিয়াছিলেন একাদশ শতাব্দী, কেহ বলিয়াছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দী, অপরে বলিয়াছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নয়। কিন্তু শূন্য-পরাণ তো একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্র, ছড়া এবং কাহিনীর টুক্‌রামাত্র সঙ্কলিত আছে। এগুলি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত ও লিপিবদ্ধ। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে, এই রচনাগুলি দুইশত বৎসরের বেশী পুরানো নয়। পুথিও সেই সাক্ষ্য দেয় (৪ পৃষ্ঠা-১১২)।

রামাই পন্ডিতের শূন্য-পুরাণ একটি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য। রামাই পন্ডিতের কাব্যে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্তী ধর্মকাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি হিন্দুদেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বীকার্য যে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ হস্তে শ্রমনগণ হৃতসর্বস্ব ও পরাভূত হইলেন; ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলিও আয়ত্ব করিয়া ভারত-বিজয়ী যে বিরাট পূজার আয়োজন করিলেন তাহাতে বাইতি, হাড়ি প্রভৃতি জাতির ধর্মযাজকত্ব রক্ষিত হইল না; ধর্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অভিসন্ধিৎসু পাঠক ইহার গোড়ায় ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধ ধর্মের লুক্কায়িত ছায়া আবিস্কার করিতে পারিবেন।...... শ্রীধর্ম্মমঙ্গল মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দু পুরোহিতগণের কক্ষতল হইতে এই পুঁথি স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই, তবে প্রত্মতত্ত্ববিদগণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্ত প্রায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন। ..... (১ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৩ ও ৪৮২)।

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যের অতি প্রাচীন বিষয়। ১১শ শতাব্দীতে রচিত (বলিয়া কথিত) শূন্যপুরাণে শিবের গান আছে, ভাষার নমুনা নিম্নরূপঃ-

যখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর।।
রজনী পরভাতে ভিকখার লাগি যাই।
কুথাএ পাই ভিক্ষা কুথাএ না পাই।।
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরষ গোসাঞি ভিকখাও ভাত।।
আহ্মার (আমার) বচনে গোসাঞি তুহ্মি (তুমি) কর চাষ।
কখন অর্দ্ধ হএ গোসাঞি কখন উপবাস।
পুখরি কাঁদাএ লইব ভূমখানি।

www.pathagar.com

আরসা হইলে যেন ছিচয়ে পানি।।
আর সব কিঁষাণ কাঁদিব মাখে হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছাএ ধান্য আনিব দাইআ।।
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।।
কার্পাষ চষহ পরভু পরিবা কাপড়।
কত না পরিবা পরভু কেওদা বাঘের ছড়।।

অর্থ হচ্ছে-"প্রভু, তুমি প্রাতে উঠিয়া ভিক্ষায় রাহির হও, কোথায় কিছু পাও, কোথায় ও বা কিছু পাওনা, হরীতকী বা বয়ড়া ফল খাইয়া দিন কাটাইয়া দাও। প্রভু তোমার কত কষ্ট। যেদিন চারটি ভাত পাও, সেদিন তোমার কত আনন্দ। তোমার এত দুঃখ আর দেখিতে পারি না। তুমি চাষ কর, যে ভাবে চাষ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি-পুকুরের ধারের জমিটি লইবে, যেহেতু যদি জমিতে জল না থাকে তবে যেন পুকুর হইতে জল সেঁচিয়া আনিতে পার; প্রভু ধান্য হইলে নিজের ঘরের ভাত কতসুখে খাইবে। আর একটা কথা, কত আর কেঁদো বাঘের ছাল পরিয়া থাকিবে? কার্পাসের চাষ করিয়া তুলা বাহির কর। তাহা হইলে কাপড় পরিতে পারিবে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে, উপরোক্ত অনুবাদ শোনে দু'জন সুবিখ্যাত ইউরোপীয় সাহিত্যিক এই মত প্রকাশ করেন যে, এটি চাষার গান নয়, ভক্তের উচ্চাঙ্গের সাধনা। তাঁরা বলেন যে, এই কবিতায় ভক্ত আরাধ্যের নিকট কোন কিছু কামনা না করিয়া, ভিক্ষা না চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া আরাধ্যের দুঃখে দুঃখি হইয়াছেন। দিগম্বর ভিখারীর দুঃখে ভক্তের মন গলিয়া গিয়াছে, নিজের সুখ দুঃখের চিন্তা বিসর্জন দিয়া আরাধ্যের দুঃখে কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন। বস্তুতঃ এই কাব্যাংশে গভীর ভক্তিরস সঞ্চিত রয়েছে। (১ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬৩/৪৬৪)।

শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মা অধ্যায়ে (যেটি পরবর্তী যোজনা) বলা হয়েছেঃ-

জাজপুর পুরবাদি সোল শঅ ঘর বেদি
বোদি লয় কোবোল দুর্জ্জন
দখিণ্যা মাগিতে জায় যার ঘরে নাঞি পায়
শাপ দিয়া পুড়ায় ভূবন।
মালদহে লাগে কর ন চিনে আপন পর
জলের নাহিক দিক পাশ।
বলিষ্ঠ হইয়া বড় দশ বিশ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাশ।।
বেদকরে উচ্চারণ বের্যাঅ অগ্নি ঘণে ঘণ
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেত পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম

২৮২❖ মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি

www.pathagar.com

তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এই রূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে ডাকিয়া ধর্ম্ম মনেত পাইআ মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার।।
ধর্ম হৈল্যা জবন রূপি মাথায়ে এত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভূবণে লাগে ভএ
খোদাএ বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্বদায়।
যথেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিলা ইজার।।
ব্রহ্মা হৈল্যা মহাম্মদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ (আদম) হৈলা সুলপানি।
গণেশ হইলা গাজী কার্ত্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি।।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেক (শেখ)
পুরন্দর হইলা মলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হৈয়্যা সেবে
সভে মিলে বাজায় বাজনা।
আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহু হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবিনুর।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।।
দেউল দোহরা ভাঙ্গে কাড়া ফিরয়া খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পাএ রামঞি পন্ডিত গায়
ই বড় বিষম গন্ডগোল।।

(৫, Dr. A. Karim's Social History of the Muslims in Bengal এর ১৮৭-১৮৮ এবং ডঃ এনামুলক হকের মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের ১৭ পৃষ্ঠায় উধৃত নিরঞ্জনের রুষ্মা অধ্যায়)। ✳ বিভিন্ন গ্রন্থে ছাপানো নিরঞ্জনের রুষ্মার শব্দ, বানান ইত্যাদিতে গরমিল রয়েছে।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন "কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে

www.pathagar.com

করিয়া সদ্ধর্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শণে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।" (১ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৭)।

ডঃ এম, এ, রহিম 'শূন্য পুরাণ সম্পর্কে বলেছেন, 'ইহা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের মুক্তি হিসেবে মুসলিম শাসনকে সাদরে গ্রহণ করার বিষয় নিয়া রচিত একখানি তাৎপর্যপুর্ণ গ্রন্থ। এ পুস্তকখানি চতুর্দশ শতকে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। (৬ পৃষ্ঠা-২৬৪)।

শূন্যপুরাণে অবশ্য গৌড়ের সুলতানকে ধর্মঠাকুর রূপে দেখানো হয়েছে এভাবেঃ-

হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।
হিন্দুকুলে বোলাইলে ধর্ম অবতার
মোমিনকুলে বোলাইলে খোদায় খোনকার।।
(৪ পৃষ্ঠা-১১৩)

ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত বলিয়া চিহ্নিত রামাই পন্ডিতের নামেই সংজাত-পদ্ধতির নিবন্ধগুলি সব প্রচলিত।....ধর্মপূজার ছড়া ও নিবন্ধগুলি ধর্ম পূজার প্রবর্তক কোন একটি শ্রীরামাই পন্ডিতের লেখা হইতে পারে না। (কারণ) এগুলি যে সব পুথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দে গ্রন্থবদ্ধ। সবচেয়ে পুরানো পুথিগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে লেখা নয়। (অথচ রামাই পন্ডিতের জীবন কাল অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দের আগের।) (৭ পৃষ্ঠা-১৪০/১৪১)।

× (বিভিন্ন গ্রন্থে ছাপানো নিরঞ্জনের রুস্মার শব্দ, বানান ইত্যাদিতে গরমিল রয়েছে)।

ডঃ সুকুমার সেন আরো লিখেছেন, (ধর্ম পূজায়) গাজনের শেষ দিনের অনুষ্ঠান 'ঘরভাঙ্গা'য় গীত জালালী কলিমা (নিরঞ্জনের রুষ্মা অর্থাৎ নিরঞ্জন ঠাকুরের ক্রোধ)। হয়ত এই ছড়ায় বহুকাল পূর্বের কোন এক শোচনীয় যজ্ঞভঙ্গ-কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত। ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান জাজপুর উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জাজপুর (কবিতাংশ পূর্বে উল্লেখিত)। চতুর্দশ শতাব্দের মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ তোগলক উড়িষ্যা ও বাংলায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালাইয়া ছিলেন মনে হয় তাহারই স্মৃতি এই জালালী কলিমা। কবিতাটির প্রথম অংশে পাই, প্রজার পাপের ফলে ধর্মঠাকুরের যবনবেশ ধরিয়া আসা ও হিন্দুর উপর অত্যাচারের কথা। শাসকের পীড়নকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লওয়া অদৃষ্টবাদী আমাদের ধর্মবুদ্ধিতে মোটেই অনপেক্ষিত নয়। একদা যে মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়া 'যবনরূপী' ধর্মঠাকুরকে চিনিতে পরিয়াছিল সেই মনোবৃত্তিই কয়েকশত বৎসর পরে ইংরেজ-রাজত্বকে বিধির বিধান ভাবিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তাই কবিতায় বলা হয়েছেঃ-

অপূর্ব শুনহ সবে　　　স্বর্গের যাতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেবরূপী
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা　　　পরিধান কুর্ত্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী।

www.pathagar.com

বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর-বেশে
কৈলকাতা পুরানা-কুঠী আদি
গত আমল সুবেদারী শুভ সন বাহাত্তরী
আংরেজ-আমল তদবধি।
(৮ পৃষ্ঠা-৯৭)

ইতোপূর্বে উল্লিখিত নিরঞ্জনের রুষ্মায় একদিকে জাজপুর নিবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্মদ্বেষ এর কথা এবং জাজপুরে দেউল দেহারা ভাঙ্গার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যদিকে ব্রহ্মাও বিষ্ণুর মুহাম্মদ ও পয়গম্বরে রূপান্তর অর্থাৎ ধর্মান্তরের কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস আমাদের সামনে এই তথ্য তুলে ধরে যে, দীর্ঘস্থায়ী বৌদ্ধশাসনাবসান যারা ঘটিয়েছিল তারা বৌদ্ধদের মঠ ধ্বংস করেছিল এবং পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতা দখলকারী মুসলমানেরাও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করেছিল। তাইতো ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, ”...... আমরা মন্দিরের ইস্টকদ্বারা মসজিদ রচিত হইতে দেখিয়াছি-এখন হিন্দু মন্দিরের উপকরণ অনুসন্ধান কালে বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া কেন আশ্বর্যন্বিত হইব? এমনকি জগন্নাথ বিগ্রহের বৌদ্ধ উপাদান এখন এক প্রকার সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে। অথচ তিনি হিন্দুর পূজ্য থাকিবেন। (১ দ্বিতীয় খন্ড ৪৮২ পৃষ্ঠা)।

মুসলিম শাসকেরা বিজিত হিন্দু রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে যে মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা চলেনা। এই প্রসঙ্গে ইলিয়াস শাহী সুলতান সিকান্দর শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “.... (আদিনা মসজিদের) ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেবমুর্ত্তি ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে সিকান্দর শাহের আদেশে বিভিন্ন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। .... (কিন্তু) মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে সমস্ত মসজিদ তৈরী হত, তাতে সাধারণতঃ দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হত অথবা উল্টে রাখা হত। কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যে সব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অনেকগুলিই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজাভাবেই বসানো আছে। তাদের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভিতরে বেশ ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়তঃ এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের প্যানেলে খুব সুন্দর ভাবে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে, ঐ প্যানেলগুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত। কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙেগ অবিকল মিলে যায়। বাইরের থেকে আনা মূর্তি-সংবলিত প্যানেলকে দরজার মাপের সঙ্গে কৃত্রিম ভাবে মেলানো হলে তার মধ্যে এসব সুসমতা ও পরিপূর্ণতা রক্ষা করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। সুতরাং সিকান্দর শাহ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়ে তার থেকে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, এ কথা নিংসংশয়ে বলা চলেনা। (২ দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৫১।

সুখময় মুখোপাধ্যায় আরো লিখেছেন,..... হিন্দু রাজার রাজ্যে যুদ্ধাভিযান করার সময় এঁদের মধ্যে (মুসলিম সুলতানদের) অনেকে মন্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি ধ্বংস করতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষই তার একমাত্র কারণ নয়; মন্দির ও মূর্তিগুলির ভিতরে অনেক ধনরত্ন থাকত, সেগুলি হস্তগত করার জন্যও ঐ গুলি ভাংতেন। অবশ্য এই ভাঙ্গা সম্বন্ধেও অনেকখানি অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, হোসেন শাহ থেকে আরম্ভ করে বহু সুলতানই উড়িষ্যার অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আসলে এঁরা উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে সামান্য আঁচড় কাটার বেশী কিছু করতে পারেননি, করা এদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কারণ এত বড় বড় মন্দির ভাঙতে হলে যত মজুর দরকার, হিন্দু রাজ্যে এই কাজের জন্য এত মজুর পাবার উপায় ছিল না।

বাংলায় সুলতানরা (দু'একজন বাদে) নিজেদের রাজ্যে মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয়না। হিন্দু প্রজা ও হিন্দু অমাত্য-কর্মচারীদের মনে অযথা আঘাত দিলে তার ফল ভাল হবে না মনে করেই সম্ভবতঃ এঁরা এই ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলার যে সমস্ত স্থানের নাম পৌত্তলিকতাগন্ধী, সেগুলির অধিকাংশই এই সুলতানদের আমলে অপরিবর্তিত ছিল। তাদের মুসলমানি নাম দেওয়া হয়নি; এ ব্যাপারেও এঁরা সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিচয় দেন। (২ নবম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩০৫)।

সুতরাং নিরঞ্জনের রুস্মা মুসলিম আগ্রাসন বোঝানোর জন্য লেখা হয়নি ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রসঙ্গে সদ্ধর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশে রচিত হয়েছে বলে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাই সত্য।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা। ১৯৯১

২। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। শান্তি নিকেতন।

৩। বিদ্যাপতি-খগেন্দ্রাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত। ২ নং পদ।

৪। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা। (৭ম সংস্করন) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩)।

৫। Sunnya Puran ed. C. C. Bandopadhya, Calcutta, BS. 1336, Chapter entitled Niranjaner Rushma.

৬। ডঃ এম, এ, রহিম- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৭। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রথম খন্ড, অপরার্ধ। ইষ্টার্ন পাবলিসার্স, কলিকাতা (৩য় সংস্করণ, ১৯৭৫)

৮। রামপ্রসাদ শর্মা-দ্বারসায়েরের কবিতা (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম খন্ড)।

www.pathagar.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভীত মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম

পন্ডিতেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। সেই পর্ব গুলো হচ্ছে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খৃষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত আদ্য পর্ব, ১৩৫০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত মধ্য পর্ব এবং ১৭৫০ থেকে যে পর্বের সূচনা তা আধুনিক পর্ব। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে এখন আধুনিক যুগ অতিক্রম করছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত হয় একমাত্র চর্যাপদ। এটি কিন্তু পুরো বাংলা ভাষা নয়। কারণ এর অর্ধেক বোঝা যায়, অর্ধেক বোঝা যায় না। সন্ধ্যা ভাষায় রচিত চর্যাপদ ছাড়া বাংলা ভাষায় আর কোন গ্রন্থ প্রাচীন যুগে রচিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়নি। আজো বড়ু চন্ডী দাস রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনই সত্যিকার অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। কারণ এটিই খাঁটি বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থ। এটির রচনা কাল মধ্যযুগ। খাঁটি বাংলাভাষায় রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে কৃত্তিবাস ওঝা রচিত রামায়ণ। এটি গৌড়ের শাসক গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০ খৃঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বিধায় মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। চর্যাপদকে যেহেতু প্রথম বাংলা গ্রন্থ ধরা হয় সেহেতু রামায়ণ তৃতীয় বাংলা গ্রন্থ। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম অব্রাহ্মণের রচিত গ্রন্থ হচ্ছে মালাধর বসু (গুনরাজ খাঁ) রচিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। কারণ ১৪৭৩-১৪৮০ সময়ে মালাধর বসু এটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলায় অব্রাহ্মণেরা সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন ধর্মীয় বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে। অতঃপর অপৌরাণিক বিষয় বস্তু নিয়ে বিপ্রদাস রচনা করেন মনসা বিজয়। (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে)। হোসেন শাহ বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চায় উদার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা দেয়ায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র তথা সকল শ্রেণীর মানুষ এগিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে। হোসেন শাহর কর্মচারী যশোরাজ খান রচনা করেন কৃষ্ণ লীলা কাব্য, বিজয় গুপ্ত রচনা করেন মনসা মঙ্গল কাব্য, রূপ গোস্বামী রচনা করেন উদ্ভব সন্দেশ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সূচনায় হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সময়ে পরাগলপুরে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস অনুবাদ করেন মহাভারত। এটি পরাগলী মহাভারত

www.pathagar.com

নামে পরিচিত। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সভাকবি শ্রীকরনন্দী পরাগলপুরে বসে অনুবাদ করেন অশ্বমেধ পর্ব, এটি ছুটিখানি মহাভারত নামে পরিচিত।

যুবরাজ ফিরোজ শাহের উৎসাহে দ্বিজ শ্রীধর রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। অতঃপর বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন কতিপয় মুসলিম লেখক। শাহ্ মোহাম্মদ সগীর রচনা করেন ইউসুফ-জোলেখা নামক প্রণয় কাব্য। ষোড়শ শতাব্দীতেই দ্বিজ শ্রীধরের পর মুসলিম কবি সাবরিদ খান রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। জাফরাবাদে (সন্দ্বীপ চ্যানেলে বিলীন) বসে সামন্ত শাসক নিজাম শাহের (নোগাজিল) পৃষ্ঠ পোষকতায় তাঁর দৌলত উজীর (রাজস্ব কর্মকর্তা) বাহরাম খান রচনা করেন লায়লী-মজনু কাব্য। ষোড়শ শতাব্দীতেই পরাগলপুরে আবির্ভূত হন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রভাবশালী কবি সৈয়দ সুলতান। সৈয়দ সুলতান লেখক ও গায়ক, সুফী ও যোগী এবং পীর ও শিক্ষক ছিলেন। সৈয়দ সুলতান সুফী সাধক এবং তিনি রাধা কৃষ্ণের পদাবলীর গায়কও। কাব্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকে বিশেষ প্রধান্য দেয়ায় সৈয়দ সুলতান সুফী সাধক না যোগ সাধক ছিলেন এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। কিন্তু ডঃ আহমদ শরীফ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে সৈয়দ সুলতান আসলে সুফী সাধক ছিলেন। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বলেছি যে, সৈয়দ সুলতান বেদপুরাণ রামায়ণ, মহাভারত আত্মস্থ করে তার ভিত্তিতে ইসলামের নবীদের জীবনের তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরে অমুসলিম সাহিত্যিকদের ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে, কোরান কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান দান ও আলোচনায় পরোক্ষভাবে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সাহিত্য বাংগালী হিন্দু মুসলা মানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে নিবীড় করে। সেই যুগে, সমসাময়িক কালে সাহিত্য চর্চা করেছেন মুহাম্মদ খান। এই শক্তিশালী কবি মুহাম্মদ খান নিজেকে সৈয়দ সুলতানের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই দু'জনের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম শাসকদের, বিশেষ করে হোসেন শাহী বংশের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় চৈতন্য সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার এবং অব্রাহ্মণ তথা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রদের সাহিত্য চর্চার কথা আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে। সৈয়দ সুলতান যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সর্বাধিক প্রভাবশালী সাহিত্যিক ছিলেন তার প্রমাণ মিলে বহু সংখ্যক সাহিত্যিক যে তাঁর শিষ্য ও ভাবশিষ্য ছিলেন একথার স্বীকৃতিতে। দশম অধ্যায়ে সৈয়দ সুলতানের শিষ্য, ভাবশিষ্য, প্রশিষ্য কবি মঙ্গলচাঁদ, শেখ পরাণ, শেখ মুতালিব, শাহ মীর মোহাম্মদ শফি, শরীফ শাহ, চম্পাগাজী, আবুদল করিম খোন্দকার প্রমুখের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মুহাম্মদ খানের শিষ্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য বিশিষ্ট কবি জেনুদ্দিন, হামিদুল্লা, আলী রাজা, পরবর্তীকালের কবি মর্দন, দ্বিজ লক্ষীনাথ, নরোত্তম কেরানী, রামতনু ভট্টাচার্য, গঙ্গারাম দাস, দীনদয়াল দাস, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, মুক্তারাম সেন, দেবীদাস শর্মা, দ্বিজ রাম দেব, দ্বিজ রতিদেব, নিধিরাম আচার্য, রাধারমন রক্ষিত প্রমুখের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে চাটিগাঁ বাঙ্গালা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হইয়াছিল।.....চাটিগাঁ হইতে এই সংস্কৃতির ঢেউ অনতিবিলম্বে....আরাকানে পৌঁছিয়াছিল। রোসাঙ্গ রাজ অমাত্যেরা বেশীর ভাগ ছিলেন সিলেট চাটিগাঁ অঞ্চলের

মুসলমান। ইহাদের প্রভাবেই সপ্তদশ শতাব্দে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিগৃহীত হইয়াছিল। (১ পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৪)। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা অন্ততঃ দুইজন খুবশক্তিশালী কাব্য রচয়িতাকে পাইতেছি,-- দৌলৎকাজী এবং আলাওল। দুইজনেই আরকানের রাজার ও রাজসভাসদদের সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।......আরাকান রাজ সভার মারফৎ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব্য উপন্যাস জাতীয় গল্প, রূপকথা ও লৌকিক কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আমদানী হইয়াছিল।....আরাকান রাজসভায় সংবর্ধিত সব বাঙালী কবিই মুসলমান।..... বাংলার মুসলমানেরা অনেককাল পূর্ব হইতেই মনে প্রাণে বাঙ্গালী। (২ পৃষ্ঠা ৯৫)। সুতরাং মুসলিম কবিদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে আরব্যোপন্যাসের কাহিনী, ফার্সী লৌকিক কাহিনী আমদানী করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। মনে প্রাণে বাঙালী মুসলমান লেখকেরা তাই ইতোপূর্বেই ব্রজবুলিতে রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনার সাথে সাথে আরব্যোপন্যাস, ফার্সী লৌকিক কাহিনীভিত্তিতে ইউসুফ-জোলেখা (শাহ মোহাম্মদ সগীর)-লায়লী-মজনু (দৌলত উজীর রাহরাম খাঁ), নবীবংশ (সৈয়দ সুলতান) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন, রচনা করছিলেন ভারতীয় লোক কাহিনী ভিত্তিক বিদ্যাসুন্দর কাব্যও (সাবরিদ খান)। এই জন্যেই 'সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংযোগের সাহিত্য হয়ে ওঠেছে। (৩ পৃষ্ঠা ১৪৯/৫০)। বস্তুতঃ ভাগবত, পূরাণ ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য রচনার সূচনা, সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই সাহিত্যের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় হিন্দি, আরবী, ফার্সী। অর্থাৎ যে বাংলা সাহিত্য প্রথমে ছিল Matter of Sanskrit, তা সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে হয় Matter of Arab, Matter of Persian, Matter of Hind, এর আগে সাবরিদ খান অবশ্য এই সাহিত্যে Matter of Bengal যোগকরেন। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই বাংলা সাহিত্যে যে বিষয়গুলো সমন্বিত হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে Matter of Sanskirt, Matter of Bengal, Matter of Hind, Matter of Arab এবং Matter of Persian. বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে সমসাময়িক কালের বহুজাতিক সাহিত্য। অতঃপর অসংখ্য হিন্দু মুলসমান কবি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সময়ের অর্থাৎ মধ্য যুগের সাহিত্য ছিল পুথি সাহিত্য। এই সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিকরা বাংলার সাথে সাথে গ্রহণযোগ্য আরবী ফার্সী হিন্দি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। অতঃপর আসে অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর (১৭১২-১৭৬০)। তিনি (ভারতচন্দ্র) বিদেশী (ফারসী) ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া সাহিত্যে বৈচিত্র ও ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।.... সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসী তুল্যরূপে অধিগত হইয়াছিল

www.pathagar.com

বলিয়াই ভারতচন্দ্র গতানুগতিক সাহিত্যের কিঞ্চিত মোড় ফিরাইতে পরিয়াছিলেন। (১ পৃষ্ঠা-৩৬৭/৩৬৮)। 'আলাওল এর ক্লাসিক বা শিষ্ট রচনা রীতির পরিণতি ভারত চন্দ্রে।.....বাঙলার শব্দ-ভান্ডারের দ্বার ফারসী ও হিন্দির জন্য আলাওল প্রমুখ কবিরা উন্মুক্ত করেছিলেন কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো তাঁরা ফারসী হিন্দি শব্দকে এমন দুহাতে গ্রহণ করতে সাহসী হননি। অথচ ভারত চন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দকে গ্রহণ করেছেন যাচাই করে, বাছাই করে, ওজন করে, প্রত্যেকটি ফারসী ও হিন্দি শব্দের স্থান হয়েছে লালিত্যগুণের জন্য, বিশেষ বাক্য রচনায় তার উপযোগিতার জন্য। (৩ পৃষ্ঠা-২০৭)।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ফারসী হিন্দি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করলেও তাঁর কাব্য দুর্বোধ্য হয়নি। পাঠে মনে হয়, এসব শব্দ বিদেশী নয়, বাংলা। যেমন তিনি তাঁর মানসিংহ ও প্রতাপদিত্যের যুদ্ধ কবিতায় লিখেছেনঃ--

ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভো রঙ্গ ভম্‌ভম্ দামামা দম্ দম্
বানন্ন ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে।।
কত নিশাণ ফর ফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান রাজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে।।
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিপাইগণ রণমাঝে।
পরি করাই বখতর পোষাক বহুতর
সুশোভি শিরপর তাজে।।
বসি অমারি ঘর পর আমীর বহুতর
হুলায় গজবর রাজে।
পুর যশোর চমকৃত নকীব শত শত
হঁসার ফুকরত কাজে।।
হয় গজের গরজন সোনার তরজন
পয়োধি ভরছন লাজে।।
দ্বিজ ভারত কবিবর রচনায় এঁহিপর
প্রতাপ দিনকর সাজে।।
যুজে প্রতাপ আদিত্য বুঝে প্রতাপ আদিত্য
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য।।
শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে কৃপা করি।।
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহ রাজে।

www.pathagar.com

লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপআদিত্য সাজে।।
ধূ ধূ ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্
দামামা দম্ দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দূড় দূড় দূড়
কামানের গোলা গাজে।।
সিদুর সুন্দর মন্দিত মদগর
ষোড়শ হলকা হাতী।
পতাকা নিশাণ রবি চন্দ্র বাণ
অযুতেক ঘোড়া সাথী।
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুইদলে গালাগাল।।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খরতরবারে
মালে মালে মুন্ডে মুন্ডে।।
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তমঃ রণ ভূমে
আত্মপর নাহি সুঝে।।
তীর শণ শণি গুলি ঠন ঠনি
খাঁড়া ঝণ ঝণু ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শুল গেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে।।
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুণে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ।।
পাতশাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ আদিত্য হারে।
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপআদিত্য লৈল।।
দলবল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে
রায়গুণাকর গায়।
(৪ পৃষ্ঠা-৩২, ৩৩, ৩৪)

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের আগে ভারতচন্দ্রের মতো এমন বাঙলা ছন্দের যাদুকর আর জন্মাননি। 'সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ফারসী-হিন্দুস্থানী এই চারিভাষার শব্দ ভাণ্ডার হইতে ইচ্ছা মত শব্দচয়নের সামর্থ্য খুব কম বাঙ্গালী কবিরই দেখা গিয়াছে।.....ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত রচনার দক্ষতা, সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনার কৌশল সম্পর্কে নিম্নে একটি শ্লোক (সংস্কৃত ও বাংলা) উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ---

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম।
যদিদানাং তৎ ত্বং নৃপ ন করুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সরিরাখো হরি হরি।।
ওহে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরণ কর না কালিয়হ্রদে
ছিলো নাগগ্রস্ত প্রথম সময়ে সব জনপদে।
কবে রাজন চেস্টা করিবে তুমি হে নাগদমনে
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি।।
(১ পৃষ্ঠা-৫০৮)।

কবি ভারতচন্দ্র এখনো আমাদের নিকট বাঙলা কাব্যের এক শ্রেষ্ঠ কলাকার।..... যেমন তাঁর শব্দের অফুরন্ত ভান্ডার, তেমনি তাঁর অভ্রান্ত শব্দ-চয়ণ।...... ভারতচন্দ্রের মতো এত ঝক্‌ঝকে তক্ তকে কথা বাঙলা সাহিত্যে আর কেউ যোগাতে পারেন নি-স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও না। (৩ পৃষ্ঠা ২০৬, ২০৭ ও ২০৮)।

ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্‌ব্যবহারের চটকে, ভারতচন্দ্রের রচনা সেকালের শব্দশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "রাজসভা-কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠে মনিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য"। (১ পৃষ্ঠা-৫০৮)।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি, মুখ্যকবি। সে যুগে রামপ্রসাদ প্রমুখের মতো শক্তিশালী কবি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও মধ্যযুগের শেষ পাদ বিচারে তাঁদের কাব্য আমাদের আলোচ্য সূচী ভূক্ত হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। কারণ মুসলিম লেখকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে Matter of Sanskrit এর সাথে Matter of Persian, Matter of Turks, Matter of Arabia, Matter of Hind এবং Matter of Bengal এর সমন্বয় সাধনের যে সূচনা করেছিলেন কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্র সেই পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হন এবং ভারতচন্দ্র তাতে পরিপূর্ণতা দানে সফলতা দেখান।

হালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ভূমিকায় তাই বলেছেন," এই যুগে তাঁরাই মার্জিত কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে অজস্র আরবী-পারসী বিশেষ্যের সংমিশ্রণ ঘটান। (৪ ভূমিকা-পৃষ্ঠা-৭)।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মেটার অফ ইউরোপ, বিশেষ করে ইংরেজী, ডয়েস, ফ্রেন্স, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের শব্দ, রচনা শৈলী, দর্শন প্রভৃতি সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটে, বাংলা সাহিত্যের বিশ্ব সাহিত্য হওয়ার পথ খুলে যায়।

বাঙলা সাহিত্য রচনার সূচনা তথা চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত সময় কালের সাহিত্যসম্ভার তথা রচনাদি পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পস্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম লেখকেরাই বাংলা সাহিত্যেকে সংস্কৃতের খোলস থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে Matter of Sanskrit কে পরিহার না করে তার সাথে Matter of Persia, Matter of Arabia, Matter of Truks, , Matter of Hind এবং Matter of Bengal কে সাফল্যের সাথে যুক্তকরে ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের প্রভাবেই সমসাময়িক কালে অমুসলমান সাহিত্যিকরাও Matter of Arabs , Matter of Persia , Matter of Hind, এবং Matter of Bengal প্রভৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে। ভারত চন্দ্রের রচনা এর প্রকৃষ্ট প্রমান তা আগেই বলা হয়েছে। তাই একথা বলা যায় যে মধ্যযুগের মুসলিম লেখকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যে পথ অনুসরণ করেছিলেন সমসাময়িককালের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল লেখক সে পথ অনুসরণ করায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ এক সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ আজকের সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভীত রচনা করেছেন মধ্যযুগের মুসলিম লেখকেরা, প্রাথমিক যুগে যে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে যুগের মুসলিম শাসকেরা। তাই আজ একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও লেখকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি। বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস এই সত্য প্রমাণ করে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কাল বিচারে, ১৭৫০ সালের পর থেকে আধুনিক কালের সূচনা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে এই ভূখন্ডে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। বাংলাদেশের দেওয়ানী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। (১ পৃষ্ঠা-৫৬৮)। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই দেশে বাংলা ছাপাখানা স্থাপন করে। হালহেডের ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ (বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং) প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলায় ছাপা হয় আইনের বইয়ের সঙ্কলন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে স্থাপন করা হয় মিশন প্রেস এবং এই প্রেসে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ছাপা হয় ১৮০০-০৯ খৃষ্টাব্দে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্যে স্থাপন করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী বাংলা গদ্য বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সিভিলিয়ানদের ব্যবহার উপযোগী ভাষা শিক্ষার জন্যে গদ্য পুস্তকের প্রয়োজনে কেরীর সহকারী রামরাম বসু রচনা করেন রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। এটি বাংলা অক্ষরে ছাপা প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়ই বাংলায় গদ্য রচনা শুরু হয় এবং বাংলা সাহিত্যে Matter of Europe যুক্ত হয়। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভিত্তিতে যে বাংলা রচনার সূচনা হয় তাতে রচিত হত পাঠ্য পুস্তক এবং এই বাংলা পুস্তক গুলিও ছিল সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত। কারণ রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ যে সব লেখক ঐ সব বই লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সংস্কৃতে পন্ডিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাহিরে যিনি বাঙ্গালা ব্যবহারিক গদ্যের সৃষ্টি করিলেন তিনি হইলেন আধুনিক চিন্তার অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।..... রামমোহন আবরী-ফারসী পড়িয়াছিলেন, সে ভাষায় লিখিতেও পারিতেন।..... রামমোহন ফারসী ও ইংরেজী ভাষা খুব ভাল জানিতেন।........ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।.......ভারত বর্ষে তিনিই প্রথম ফারসী ভাষায় সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন (১৮২২)। পত্রটির নাম, "মীরাতুল আখবার।" তাহার একবছর আগে ইংরেজী- বাঙ্গালা দ্বিভাষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা অংশের নাম ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)। (২ পৃষ্ঠা-১৮৩-১৮৪ ও ১৮৫)। "এই প্রতিভাবান কর্মী মনীষী (রামমোহন) ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রদূত। ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, রাজনৈতিক আন্দোলন- সর্বত্রই রামমোহনের নেতৃত্ব বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষকে নব যুগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আধুনিককালে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বাংলাদেশে দার্শনিক জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন। (৫ পৃষ্ঠা-৩৬)।

উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনায় এবং পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এবং এখনো আছেন এমন সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রাধানাথ শিকদার (১৮১৬-১৮৭১), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৯), ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৯৪), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), তারাশংকর তর্করত্ন (১৮২৪-১৮৫৮), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪), রাম

নারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬), বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), বিহারী লাল (১৮৩৫-১৮৯৪), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৭), তারক নাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১),দ্বীজেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯২৬), নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪২-১৯০৯), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৮৮৬), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮-১৯১৯), রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪), দীনেশ চন্দ্র বসু (১৮৫১-১৮৯৯), ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫৩-১৮৯৮), ঈশাণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭), তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৯১), রমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), স্বর্ণকুমারী দেবী

www.pathagar.com

(১৮৫৫-১৯৩২), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩৬), মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৫৮-১৯১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), দীজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), করুনা নিধান বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), মোহিত লাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্র মোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত (১৮৮৭-১৯৪৩), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), যোগেশ চন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬), ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৮), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৪), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), আনন্দ চন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৪৭-১৯৫০), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার (১৮৬৭-১৯০৬), মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬), রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪), ইব্রাহিম খান (১৮৯৪-১৯৭৮), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৭), নওয়াব ফয়জুন্নেসা (১৮৫৮-১৯০৩), আনিস চৌধুরী (জন্ম ১৯১৯), গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৩৮), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), শেখ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), তরীকুল আলম (১৮৮৯-১৯৩২), নুরুন্নেসা খাতুন ((১৮৯৪-১৯৭৪), এস, ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৮), মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), শেখ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫), মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৬), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২), একরামুদ্দিন (১৮৮০-১৯৩৫), মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৩-১৯৮৭), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-১৯৮২), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৬), শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৯-১৯৬৪), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৫), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৮), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), জসীম উদ্দীন (১৯০২-১৯৭৭), আবু জাফর

www.pathagar.com

সামসুদ্দিন (১৯১১-১৯৮৮), সরদার জয়েন উদ্দিন (১৯২৩-১৯৮৬), সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৫-১৯৭১), আবু ইসহাক (জন্ম-১৯২৫), জহীর রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল গনি হাজারী, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অচিন্ত কুমার সেন গুপ্ত, আবদুল অদুদ, তারা শংকর বন্দোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমা চৌধুরী, রাজ শেখর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, মুনির্মল বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, মীরা রায়, বিনয় ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, রশীদ আল ফারুকী সহ আরো হাজার হাজার সাহিত্যক এবং এখনো যারা সাহিত্য চর্চা করছেন তাদের মধ্যে আছেন বেগম সুফিয়া কামাল (জন্ম ১৯১১), আবু রুশদ (জন্ম ১৯১৯) , শওকত ওসমান (জন্ম ১৯১৭-১৯৯৮), মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, কবির চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রশীদ করিম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, (জন্ম১৯৩২), আবদুল গাফফার চৌধুরী (জন্ম ১৯৩৪), সৈয়দ শামসুল হক জন্ম (১৯৩৫), রাবেয়া খাতুন (জন্ম ১৯৩৫), রিজিয়া রহমান (জন্ম ১৯৩৯), হাসান আজিজুল হক, নাজমুল আলম (জন্ম ১৯২৭), আবুল খায়ের মোসলেহ উদ্দিন (জন্ম ১৯৩৪), আবুল হাসনাত (১৯৩৬), আবদুস শাকুর (১৯৪১), রাহাত খান (১৯৪০), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫), হাসনাত আবদুল হাই, মনিরুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৯), ড. আনিসুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৭), নীলিমা ইব্রাহীম, ড. আহমদ শরীফ (জন্ম ১৯২১), শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অন্নদা শংকর রায়, শওকত আলী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, দিলওয়ার, ডঃ দিলোয়ার হোসেন প্রমুখসহ হাজার হাজার সাহিত্যিক।

আধুনিক যুগের সূচনায় যাঁরা সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ শুধু বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা করেন নি, সাময়িকপত্র প্রকাশ করে গদ্য সাহিত্যেকে সহজলভ্য করার জন্য বহুল প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কেহ কেহ এখনো সংবাদপত্রের সাথে জড়িত আছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হচ্ছে প্যারিচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) আলালের ঘরের দুলাল। আর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসগর সাধু ভাষায় বাংলা গদ্য রচনার পথিকৃত। এই পথ অনুসরণ করে বাংলায় কাব্য রচনাও অব্যাহত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। "ইংরেজীতে লিখিত আখ্যায়িকা-কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়াই বাংলা সাহিত্যে ইংরেজীর প্রভাব এবং সেই সূত্রে আধুনিকতা সর্বপ্রথম দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর

পঞ্চম দশকে ইংরেজী মুল অবলম্বনে বিবিধ নীতিগল্প এবং পারস্য-ইতিহাস ও আরব্য-উপন্যাস প্রভৃতি আখ্যায়িকা গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর খাশ ইংরেজী কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ হয়। এই ধরনের অন্যতম প্রথম বাঙ্গালা রচনা হইল মিল্টনের প্যারাইডজ লষ্ট এর অনুবাদ 'সুখদ-উদ্যান ভ্রষ্ট' কাব্য (১৮৫৪)।...... ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গলা কাব্যে যে আধুনিকতার বীজ বুনিলেন, তাহা তাঁহার সহকারী এবং মুখ্য শিষ্য রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) কবিতায় অঙ্কুরিত হইল।.... দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতা প্রিয়তা

রঙ্গলালের কাব্যের মুল সুর।.......রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি। (২ পৃষ্ঠা-২০০,২০১,২০২)।

www.pathagar.com

উল্লিখিত শত শত সহ হাজার হাজার সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন অজস্র কবিতা, ছড়া, কাব্য, মহাকাব্য ছাড়াও অগণিত উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, রস রচনা, সৃষ্টি করেছেন রম্য সাহিত্য, শিশুতোষ সাহিত্য। অর্থাৎ সাহিত্যের সকল শাখায় কাজ শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাই আজ দ্ব্যর্থহীন ভাবে দাবী করা যায় যে, আজকের বাংলা সাহিত্য আন্তর্জাতিক সাহিত্য এবং বাংলা ভাষা অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা। উল্লেখ্য যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের ভাষা দিবসকে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে 'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই এখন থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে এই দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হবে। সক্রেটিস, প্লুটো, দান্তে, ভলটেয়ার, সেকসপীয়র, তলস্তয়, ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, সাদী, কার্ল মার্কস, রুশো, লেনিন, মাও প্রমুখের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি আজ যেভাবে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পঠিত ও আলোচিত ঠিক সেভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও আজ সারা বিশ্বে পঠিত, আলোচিত ও সমাদৃত ভাষা ও সাহিত্য। এক্ষেত্রে চর্যাপদ থেকে শুরু করে, বড়ু চন্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, পরাগলী মহাভারত, ছুটি খানী মহাভারত, শাহ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা, সৈয়দ সুলতানের নবী বংশ, দৌলত উজীর বাহরাম খানের লায়লী-মজনু, সারবিদ খানের বিদ্যাসুন্দর, কাজী দৌলতের সতীময়না লোর চন্দ্রানী, আলাওলের পদ্মাবতী, ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল, মাইকেলের মেঘনাবধ কাব্য, কায়কোবাদের মহাশ্মশান, রবীন্দ্র নাথের সাগর সদৃশ সাহিত্য কর্ম, শরৎ চন্দ্রের কথা সাহিত্য, দীনবন্ধুর নাটক, ময়মনসিংহ গীতিকা, লালন শাহের গান, নজরুলের সঙ্গীত, তথা সূচনা থেকে আজপর্যন্ত যাঁরা লিখে যাচ্ছেন তাঁদের কারো অবদান খাটো করে দেখার মতো নয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সৃষ্ট সকল সাহিত্য কর্মই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আজকের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে হাঁ, আজকের বাংলা সাহিত্যের ভিত দিয়ে গেছেন বাংলায় মধ্য যুগের মুসলিম শাসক ও লেখকেরাই, এই সত্য তথ্য ভিত্তিতে প্রমাণিত।

তথ্য পঞ্জী

১। ডঃ সুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, অপরার্ধ, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা। ১৯৭৫

২। ডঃসুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের কথা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

৩। গোপাল হালদার- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খন্ড বাংলাদেশ সংস্করণ ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮০।

৪। ভারত চন্দ্র রায় কবিগুণাকর-মানসিংহঃ অন্নদা মঙ্গল। কবিতা সঙ্কলন, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। ডঃ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য-মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৫৬।

www.pathagar.com

বিংশ অধ্যায়

উপসংহার

মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সাহিত্য আজ বাংলার ভূমি পুত্রের হিন্দু মুসলমানের সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আজকের মর্যাদা অর্জনের পথে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে, বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে আসতে হয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালীদের ভাষা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ে রক্তও দিতে হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র যুগে যুগে চলে এসেছে। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম দুঃখ করে বলেছেন, "যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী-সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।" (১ প্রসঙ্গ কথা-পৃষ্ঠা-৫)। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নিশ্চিতভাবে হয়েছিল বলেই আবদুল হাকিম এরূপ রুঢ় কথা বলেছেন।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলায় বৃটিশ শাসনের সূচনায়। ইংরেজ বনিকেরা ষড়যন্ত্র করে এই দেশের শাসনদন্ড অধিকার করে মুসলিম শাসকদের হাত থেকে। রাজভাষা করা হয় ইংরেজী। ফারসী হয় বিতাড়িত। শাসনকাজ পরিচালনা তথা চাকুরী ক্ষেত্রে তখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এদেশের অমুসলিমরা প্রয়োজন উপলব্ধি করে ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক অদূরদর্শী মুসলিম নেতা ক্ষমতা হারিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে কাফের নসরা হয়ে যাবার অহেতুক ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ থেকে, যুগোপযোগী শিক্ষা নেয়া থেকে বিরত রাখে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সময় ইসলামী বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টিতেও উদ্যোগী হয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকরা মনে করেন যে, বাঙলা ভাষাকে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ দ্বারা কন্টকিত করলেই তা, মুসলমানী বাংলা বা ইসলামী বাঙলা হয়ে যাবে। অথচ বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলিম লেখক শাহ মোহাম্মদ সগীর ইউসুফ-জোলেখা কাব্য লিখে বাংলা সাহিত্যে Matter of Persia এবং Matter of Arab আমদানী করলেও এবং তাঁর কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করলেও দুর্বোধ্য করে তোলেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ফারসী-হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রচুর, কিন্তু তাও দুর্বোধ্য হয়নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইসলামী সাহিত্য স্রষ্টারা তাঁদের সাহিত্যকে ইসলাম বা মুসলমানের নামে, ইসলামী বা মুসলিম সাহিত্যের নামে কিরূপ দুবোর্ধ্য করে তোলেন তার একটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ-

"হল্‌কূমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।

www.pathagar.com

আসমান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে।" (২)।

উপরের ভাষাটি কি বাংলা? এটা কি চর্যাপদের ভাষার মতো সন্ধ্যা ভাষা নয়?

অষ্টাদশ শতাব্দে, বাংলাদেশে স্বাধীন নবাবী আমলেরও পূর্ব হইতে বাঙ্গালী মুসলমান লেখকেরা সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত হইতে থাকেন। (ঐ সময়ে) বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আরবী-ফারসী শব্দ চলিত ছিল।......(সেই সূত্রে তাঁদের সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যে) আরবী ফারসী শব্দের প্রবেশ প্রায় অবারিত ছিল।..... এ কারণে মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা সাধারণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে ইসলামী বাঙ্গালা বলিতে পারি না। ইংরেজ আমলের শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ ভাষাই যথার্থ ইসলামী বাঙ্গালা।....বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি পরান্মুখতার ফলে এই সাহিত্যভাষা উনবিংশ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত সঞ্চরমাণ ছিল। এ সাহিত্যের ভাষায় যাঁহারা গাঁথা-আখ্যায়িকা-গল্প (কেচছা) লিখিতেন তাঁহাদের সাধারণ সাধু ভাষায় যে অধিকার ছিল না এমন নয়। কিন্তু তাঁহারা যে ফারসী হিন্দুস্থানী-হিন্দী আকর হইতে বস্তু সংগ্রহ করিতেন সেই আকর হইতে শব্দ ও বাক্যাংশও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লইতে দ্বিধা করিতেন না। (তবে) ইসলামী বাঙ্গালায় লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, শিক্ষিত মুলসমান পাঠকের জন্যও নয়, বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকের অবসর বিনোদনের জন্য রচিত হতো। (৩পৃষ্ঠা-৫৪৯)। (এই জন্যে) আমির হামজা বা হাতেম তাইয়ের পুঁথি, কাসাসুল-আম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোন কালেই হয় নাই। (যদি তাহা হইত) তাহা হইলে আজ (তা) শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। (৪)।

কিছু সংখ্যক হিন্দু সাহিত্যিকও বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত বহুল শব্দে কন্টকিত করে সাহিত্যের স্বাভাবিক গতিপথে বধার সৃষ্টি করতে ইতস্ততঃ করেননি। তাঁদের কাছে বাংলা ভাষা মানে অনুস্বার বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত।

যেমন-
চমকি বিশ্ব নব-বীর্য-সূর্য নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয়-গিরি-কনক-মরু 'পরি গঞ্জি মঞ্জমনি বর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্য নিচয় সম, (বিষম যগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর-পতিত-রজনিকর যোদ্ধ নিকর উড়ু বৃন্দে। (২)।

একথা সর্বজন বিদিত যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন, সাহিত্য নয়। তবে যে ভাষা যতবেশী শক্তিশালী সে ভাষায় ততবেশী শক্তিশালী সাহিত্য রচনা সম্ভব। "সাহিত্য হচ্ছে জাতির

মুক্তি-সেতু বা কল্যাণের স্বর্ণ-সৌধ। (৫)। সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলা হয়। পারিপার্শ্বিক জীবনে যাই ইন্দ্রয়ানুভূত হয়, তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়।.... যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহা ঘটনা মাত্র। আর সাহিত্যিকের মন উহাকে ছাঁকিয়া সাহিত্যে যাহা প্রকাশ করে তাহাই সত্য। এই সত্যই প্রকৃত সাহিত্যের পরিচায়ক। (৬)। সাহিত্যের

www.pathagar.com

ভিতরের বস্তু এমন সরস, সতেজ ও প্রাণবন্ত হওয়া দরকার যে, তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাড় সমাজ-দেহ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে, হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়- এক অভূতপূর্ব প্রেরণার স্পন্দনে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, আলাদীনের প্রদীপ ঘর্ষণে দৈত্যের আবির্ভাবের ন্যায় হাজার হাজার সমাজ-সংস্কারক কর্মীর সৃষ্টি হয়ে সমাজকে চঞ্চল করে তোলে।....(তাই) সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা-তার অন্তরে জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়ে তার ভীরুতা, জড়তা ও মুর্খতার আবর্জনা পুড়িয়ে দেওয়া এবং তৎপরিবর্তে সৎসাহস, কর্মস্পৃহা ও দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করা। মানুষ যাতে খাঁটী মানুষ হয়, জ্ঞানে উন্নত, চরিত্রে আদর্শ, কর্মে সুপটু, পরহিতৈষণায় সুদক্ষ ও স্বজাতি-কল্যানে অকুণ্ঠিত চিত্ত হয়, তারই চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই অপরিহার্য কর্তব্য। (৫)। সমাজকে বর্তমান অপেক্ষা একটা বিরাটতর, উচ্চতর, মহত্তর, সুন্দরতর ভবিষ্যতের দিকে গতিশীল করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। (৭)।

"বাঙ্গালার হিন্দু-মোসলমানের মাতৃভাষা এক (বাংলা)।......... (কিন্তু) হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় জাতির ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কলাপ, আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় এমন একটা নিজস্ব ভঙ্গিমা আছে, যাহার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাষার গতি একটু স্বতন্ত্র এবং ভিন্নমুখী হইবেই। কিন্তু সেই পার্থক্য এমন কিছু ভয়ানক গরুতর বিষয় নয় যে, তাহার জন্য দুইটী স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিতে কিংবা মূল মাতৃভাষাটিই পরিবর্তণ করিয়া লইতে হইবে।..... ভাষা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক জাতিরই ভাব প্রকাশের এক স্বতন্ত্র ধারা আছে।

..... মোসলমানের নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় ঠিক ঐ শব্দ গুলিই লিখিতে হইবে। প্রার্থনা, উপবাস, তীর্থগমন বা দান লিখিলে চলিবেনা। কারণ প্রথমোক্ত শব্দ গুলির সহিত শেষোক্ত শব্দগুলির অর্থ, ভাব, ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা ও তাৎপর্যে আকাশ বাতাল পার্থক্য আছে। (৮)।

বাঙ্গালায় হস্তমুখ প্রক্ষালন বলিলে যাহা বুঝায় মুসলমানের ওজু তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। হিন্দুর উপাসনার আসন ও মুসলমানের 'জায়নামাজ' বিভিন্ন পদার্থ।.....মুসলমানের ঈমানের প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় অজ্ঞাত। বেহেস্ত ও দোজখের পরিবর্তে স্বর্গ ও নরক, হালালও হারামের পরিবর্তে বৈধ ও অবৈধ, গোছল ও খানার পরিবর্তে স্নান ও আহার অবশ্যই চলিতে পারে। (৯)।

বাঙ্গলা এই দেশে (বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গে) বহুকাল পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের

ব্যবহার ও স্থান আছে।..... এই ভাষায় আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি পুরুষানুক্রমে কথাবার্তা ও লেখাপড়া করিয়া আসিতেছি। কাগজ, কলম, কেতাব, আদালত, আরজী, ইনসাফ, কুরছি, মেজ, দোয়াত, সির, সির্নী, মগজ, বরতন, পেয়ালা, তস্তরী, পালং, তোষক, বালিশ, গয়রহ ইত্যাদি শব্দ আমরা উভয় সমাজে সর্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। (১০)।

বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান বহুদিন যাবৎ একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং ইহার ফলে সাধারণ মুসলিম কথা-বার্তায় যে সকল বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা সাধারণ হিন্দুর উপলব্ধি করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। (৬)।

www.pathagar.com

সৈয়দ এমদাদ আলীর ভাষায়, সকলের আগে ব্যবহার করিতে হইবে সেই সকল শব্দ, যাহা বাংলার মুসলমান সমাজে নিত্য-প্রচলিত এবং যাহা বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর কোনই কষ্ট হয় না। (১১)।

শব্দ প্রয়োগ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বলেছেন, 'শব্দ লিখিলেই হইবে না'; সুন্দর করিয়া লেখা চাই। সে শব্দ এরূপ বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহার এরূপ টান থাকা চাই যে শুনামাত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয় এবং মোহমুগ্ধ মন অজ্ঞাতসারে সে শব্দকে নিঃশেষে গ্রহণ করে, মন যেন অপরিচিত কোন কিছুর আভাষ পাইয়া কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়। (৯)।

বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যথোচিত সেবা ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। (৭)।

বঙ্গীয় মুসলমানগনের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তাহারা বাঙ্গালায় কথোপকথন করে, চিঠিপত্র, খাতা, দলিল-দস্তাবিজ, জমিদারী সেরেস্তার কার্যাদি সমস্তই বাঙ্গালাতে নির্বাহ করিয়া থাকে। মোসলমান আলমদারীতেও এ দেশে বাঙ্গালার প্রচলন ছিল।.....বাঙ্গালা বাঙ্গালাদেশের মাতৃভাষা। (১২)।

বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা মনে করিও না। যে ভাষায় তুমি মনের সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ কর, যে ভাষায় তুমি স্বপ্ন দেখ, যে ভাষায় তুমি মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রাণে শান্তি ও আরাম লাভ কর তাহা নিজের মাতৃভাষা। জগতের সমস্ত ভাষা অপেক্ষা তাহার গৌরবের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। মাতাকে ঘৃণা করিলে, তাহার সেবা শুশ্রুষা না করিলে যে পাপ, মাতৃভাষার সেবা না করিলে, তাহার যত্ন না করিলেও সেই পাপ। (১৩)।

"আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা-জননীর পীযুষধারা পান করিয়া বলিয়ান হইব।" (৪)।

বস্তুতঃ উপরোক্ত শ্লোগানে বিশ্বাসী সাহিত্যিকরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করে এই ভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক ভাষা ও সাহিত্যের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা তাঁদের রচনায় বিদেশী ভাব ও ভাষা এবং শব্দ সম্ভার দু'হাতে গ্রহণ করেছেন এবং নিজ ভাষায় তা প্রয়োগ করেছেন অকৃপণ হৃদয়ে। শাহ মোহাম্মদ সগীর, সাবরিদ খান, সৈয়দ সুলতান, বাহরাম খান থেকে কৃষ্ণরাম দাস, ভারত চন্দ্র, সত্যেন্দ্র নাথ, গিরিশ চন্দ্র সেন, রবীন্দ্র নাথ, নজরুল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আজকের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এই সব সাহিত্যিকরা নামে ও ধর্মে হিন্দু বা মুসলমান হলেও মনে প্রাণে বাঙ্গালী, বাংলার ভূমিপুত্র। তাঁদের হৃদয় তন্ত্রীতে বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের জন্যে ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁরা স্বদেশ প্রেমিক। তাই ডঃ মোহাম্মদ শহীদুলাহ বলেছেন, "বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় মিলন মন্দির।" (২)।

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতহাস আজ আমাদের সামনে এই সত্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করছে যে, মধ্যযুগের মুসলমান লেখকেরাই বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বহুজাতিক সাহিত্য সম্ভারে সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যে উন্নীত করেন এবং তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক, যাঁরা বাংলার ভূমিপুত্র হিসেবে সাহিত্য সাধনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ

www.pathagar.com

আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিছু কিছু সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কৃত কন্টকিত এবং অপর কিছু সাহিত্যিক উর্দু ফারসী, আরবী কন্টকিত করার চেষ্টা করলেও তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাই আজ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য শুধু মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য নয়, বাংলা ও বাংগালীর ভাষা ও সাহিত্য, আধুনিক যুগের উপযোগী আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্য। তবে এই সাহিত্যের স্থপতি মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও লেখকেরা। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেছেন, "সুলতানী আমলেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত গতিতে বিবর্তিত হইয়া আধুনিক ভাষার রূপ লাভ করে।.... মুসলিম অধিকারের পূর্বে দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, জাতি-হিসাবে বাঙালী এবং ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। সুলতানী আমলের শেষ পর্যায়ে এক দেশ এক জাতি এবং এক ভাষা নিশ্চিত রূপে চিহ্নিত হইয়া যায়। (১৪ ভূমিকা- পৃঃ কও খ)। সুতরাং 'বাংলাভাষা মুসলমানেরই ভাষা, এই দাবীও সঙ্গত।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা-সম্পাদক-রশীদ আল-ফারুকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১

২। সওগাত/বৈশাখ, ১৩৩৬ (ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র প্রবন্ধ-মুসলিম সাহিত্য সমাজ।

৩। ডঃসুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খন্ড-অপরার্ধ), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা।

৪। সাহিত্যিক/ফাল্গুন, ১৩৩৩/তসদ্দক আহমদের প্রবন্ধ-মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য (ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭)।

৫। সাহিত্যিক/আষাঢ়, ১৩৩৪/মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত। শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর প্রবন্ধ-মোসলেম বঙ্গ সাহিত্য।

৬। শিখা (দ্বিতীয় বর্ষ), ১৯২৮, (মৌঃ আবদুর রহমান খাঁ'র প্রবন্ধ-মুসলিম সাহিত্যের স্বরূপ।

৭। সওগাত/অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫/(মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধ-সাহিত্যে স্বাতন্ত্র কেন)।

৮। ইসলাম-দর্শন/আশ্বিন, ১৩২৮ (সম্পাদক-মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, সম্পাদকের প্রবন্ধ-বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা)।

৯। কোহিনুর/মাঘ, ১৩২২। (মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর প্রবন্ধ-বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য)।

১০। আল-এস্‌লাম/কার্ত্তিক, ১৩২১/ (খাদেমেল এসলাম বঙ্গবাসীর প্রবন্ধ-বাঙ্গালীর মাতৃভাষা)।

১১। মাসিক মোহাম্মদী/চৈত্র, ১৩৩৪/(সৈয়দ এমদাদ আলীর প্রবন্ধ-বাংলা ভাষা ও মোসলমান)।

১২। আল-এসলাম/আশ্বিন, ১৩২৪/(মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর প্রবন্ধ-বঙ্গীয় মুসলমান ও উর্দু সমস্যা)।

১৩। ইসলাম প্রচারক/পৌষ-মাঘ, ১৩০৮। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রবন্ধ-মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি)।

১৪। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো-বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬

www.pathagar.com

তথ্য নির্ঘন্ট

১। গোপাল হালদার- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথমখণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০।

২। দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস- মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা, ১৯৪৯ খৃঃ।

৩। ডঃ সুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সাহিত্য একাডেমীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৬৪ খৃঃ।

৪। ডঃ সুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ (সপ্তম সংস্করণ)।

৫। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়- বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৬। বড়ু চণ্ডীদাস লিখিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৩৮০।

৭। বাবর নামা- ইলিয়ট- সুশীল পাবলিকেশন্স। (Tr. by A. S. Beveridge), New Delhi, 1989.

৮। তাবাকাত-ই-আকবরী, তৃতীয় খণ্ড।

৯। Dr. A. Karim-Social History of the Muslims in Bengal (Down to 1538 AD), Baitussharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1988.

১০। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,) অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১ খৃঃ।

১১। Dr. Mohammad Shahidullah- The Influence of Urdu-Hindi on Bengali Language and Literature, Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol-VII, Chapter-1.

১২। কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ-সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৭১ খৃঃ।

১৩। ডঃ আবদুল করিম- বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪ খৃঃ।

১৪। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৯৬ খৃঃ।

১৫। ডঃ সুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮ খৃঃ।

১৬। ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৩ খৃঃ।

১৭। জিয়া-উদ-দীন বরনী- তারিখ-ই ফিরুজ শাহী, মূল ফার্সি।

www.pathagar.com

১৮। N. K. Bhattashali-Coins and Cronology of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge, 1922.

১৯। নগেন্দ্র নাথ বসু- বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড।

২০। J. N. Sarkar (Editor) History of Bengal, Vol-II, Dhaka University, 1948.

২১। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো- বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬।

২২। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ- বাংলা সাহিত্যের কথা- মধ্যযুগ, ঢাকা ১৩৭৯।

২৩। Dinesh Chandra Sen- History of the Bengali Language and Literature, Calcutta, 1904. .....

২৪। সুখময় মুখোপধ্যায়–বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৬ খৃঃ।....

২৫। তরকাত-ই-নাসিরী, মুল ফার্সি- লাহোর থেকে প্রকাশিত।

২৬। Dr. Abdul Karim- Corpus of the Muslim Coins of Bengal, Dhaka, 1960.

২৭। Dr. R. C. Majúmdar (Editor) History of Bengal, Vol-1, Dhaka, 1943.

২৮। Journal of Bihar Research Society, Vol-XII, part-II, 1956.

২৯। Bengal, Past and Present, Vol-LXVII, Part I, 1948.

৩০। Dr. Suniti Bhusan Kanungo- A History of Chittagong, Vol-I, Signet Library, Chittagong, 1988.

৩১। ডঃ এম. এ. রহিম- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ খৃঃ।

৩২। সাহিত্য পত্রিকা- ১ম খণ্ড, ১৩৬৪ সাল।

৩৩। ডঃ এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য। ঢাকা, ১৯৫৫।

৩৪। গৌরীনাথ শাস্ত্রী- সম্পাদক- কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত।

৩৫। জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত-সম্পাদক- বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭।

৩৬। ডঃ সুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯১।....

৩৭। ডঃ আবদুল করিম- বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল।

৩৮। Dr. Abdul Karim- Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal.

৩৯। Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol-XIV No 2, 1969.

www.pathagar.com

৪০। পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড।
৪১। ডঃ আহমদ শরীফ–বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩।
৪২। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং ৩৭১০ ও ৪১২৪। ......
৪৩। সাহিত্য, অগ্রহায়ন, ১৩০১।
৪৪। Journal of the Bihar Research Society, 1955.
৪৫। Catalogue of the Coins in the Indian Musium, Vol-II.
৪৬। Charles Rieu- Catalogue of Persian Manuscrpits in the British Museum-Vol-II
৪৭। Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol-V, Part.1 Nos. 130-132.
৪৮। Indian Historical Quarterly, Vol-XXXII.
৪৯। ডঃ এনামুল হক- বঙ্গে সুফী প্রভাব।
৫০। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড- অপরার্ধ, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫।
৫১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-চৈতন্য চরিতামৃত। বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।
৫২। শাহ মোহাম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ- জোলেখা, সম্পাদক-মুহাম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫৩। S. A. Ashraf- Muslim Tradtions in Bengali Literature.
৫৪। নওবাহার, ৪র্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।
৫৫। সাহিত্যিকী, শরৎ সংখ্যা, ১৯৭৬ বঙ্গাব্দ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৫৬। E. G. Brown-Literary History of Persia, Vol-III.
৫৭। ডঃ আহমদ শরীফ- সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২।
৫৮। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (মুসলিম কবির বিদ্যাসুন্দর প্রবন্ধ), ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২৫ বাংলা।
৫৯। পুথি পরিচিতি, আবদুল করিম সাহিত্য বিশরাদ সঙ্কলিত ও আহামদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।
৬০। সৈয়দ সুলতান- ওফাত-ই-রসুল। সম্পাদক-আলী আহমদ, ১৩৫৫ বাংলা।
৬১। মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৯।
৬২। আব্দুল হক চৌধুরী–চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, ১৯৭৯।
৬৩। ডঃ আবদুল করিম- চট্টগ্রামে ইসলাম। ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮১।
৬৪। সাহিত্য পত্রিকা- বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, শীত সংখ্যা, ১৩৬৯।

www.pathagar.com

৬৫। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ- বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ- ১-১, ১৯, ১-২।
৬৬। জমির আহমেদ- ফেনীর ইতিহাস। সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম। ১৯৯০।
৬৭। দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত লায়লী-মজনু। ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৬৮। Baharisthan-i-Gaibl of Hamidullah Khan, edited by Mirza Nathan, Vol-I.
৬৮। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XV, 1882.
৭০। সাধক কবি হাজী মুহাম্মদ- বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ন, ১৩৬৭।
৭১। মুসলিম কবির পদ সাহিত্য।
৭২। মুক্তারাম সেন-সারদা মঙ্গল- সম্পাদক- আবদুল করিম। সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৪।
৭২। দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল- আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭) প্রকাশিত।
৭৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩, ৪, ৬, ৫, ৯, ৩৩, ৩৯।
৭৪। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ- বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।
৭৫। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত শরীয়ত নামার পাণ্ডুলিপি (পাণ্ডুলিপি ক্রমিক নং ২৫৪)।
৭৬। S. M. Ali-History of Chittagong, Standard Publishers, Dhaka.
৭৭। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বাবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষা, ১৩৮৬ বাংলা।
৭৮। মাসিক কলম, ঢাকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮৫।
৭৯। আদ্য পরিচয়- মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, রাজশাহী, ১৯৯৪।
৮০। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত পদ্মাবতী। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
৮১। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য। ....
৮২। আবদুল হক চৌধুরী- চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৮।
৮৩। ডঃ আহমদ শরীফ- আলাউল বিরচিত সিকান্দর নামা।
৮৪। বিশুদ্ধ কাশীদাসী মহাভারত, সম্পাদক -সুবোধ চন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৬৩।
৮৫। ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪১।
৮৬। পাক্ষিক সমালোচক, ভাদ্র, ১২৯১।
৮৭। বাংলা সাহিত্য পরিচয়।
৮৮। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২।
৮৯। আজকাল, ১১ই ডিসেম্বর ও ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯২।

www.pathagar.com

৯০। ধ্বংস স্তুপে আলো- বাবরী মসজিদ রাম মন্দির বিবাদ- অরুণ সেন ও মফিদুল হক সম্পাদিত। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
৯১। পুথি পরিচয়, ২য় খণ্ড, সম্পাদক- পঞ্চানন মণ্ডল।
৯২। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল- এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক (১৯৬৮) প্রকাশিত।
৯৩। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর- আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, ১৯১৫।
৯৪। জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২।
৯৫। রূপরামের ধর্মমঙ্গল। ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫১।
৯৬। ডঃ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-১/২।
৯৭। অক্ষয় কুমার কয়াল, সম্পাদক- রূপরামের ধর্মমঙ্গল।
৯৮। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৬ এবং ১৩৫৪।
৯৯। সেক শুভোদয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৩।
১০০। দীনবন্ধু মিত্র- জামাই বারিক (নাটক)।
১০১। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর- মানসিংহ ঃ অন্নদামঙ্গল। বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১০২। প্রবন্ধ কোষ- শ্রী জিন বিজয়ী সম্পাদিত, ১৯৩৫।
১০৩। রহস্য সন্দর্ভ, ১ম পর্ব, একাদশ খণ্ড।
১০৪। বলরাম চক্রবর্তী কবি শেখরের কালিকামঙ্গল। সম্পাদক- চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৭।
১০৫। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ- ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।
১০৬। রাজমালা, ১৯৬৭ সংস্করণ। শিক্ষা অধিকার। ত্রিপুরা সরকার।
১০৭। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলার ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২য় সংস্করণ।
১০৮। সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়- ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা।
১০৯। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-১।
১১০। বিদ্যাপতি- খগেন্দ্র নাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত।
১১১। Sunnya Puran-Ed. C.C. Bondopadya, Calcutta BS 1336.
১১২। রামপ্রসাদ শর্মা- দ্বারসায়েরের কবিতা (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম খণ্ড)।
১১৩। ডঃ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য- মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৫৬।
১১৪। বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা- সম্পাদক- রশীদ আল ফারুকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১।
১১৫। সওগাত, বৈশাখ, ১৩৩৬, অগ্রহায়ন, ১৩৩৫।
১১৬। সাহিত্যিক, ফাল্গুন, ১৩৩৩, আষাঢ়, ১৩৩৪।
১১৭। শিক্ষা-২য় বর্ষ, ১৯২৮।
১১৮। ইসলাম দর্শন, আশ্বিন, ১৩২৮।
১১৯। আল এসলাম, কার্ত্তিক, ১৩২১, আশ্বিন, ১৩২৪।
১২০। কোহিনুর, মাঘ, ১৩২২।
১২১। মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র, ১৩৩৪।
১২২। ইসলাম প্রচারক, পৌষ-মাঘ, ১৩০৮।

www.pathagar.com

লেখক নির্ঘন্ট

(এই গ্রন্থে যে সব লেখকের লেখা উধৃত ও আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে যাঁদের নাম এসেছে, তাঁদেরই নির্ঘন্ট। আধুনিক যুগের, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পরবর্তী সময়কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (বৃটিশ যুগের বিদ্রোহী কবি), শরৎ চন্দ্র, মাইকেলসহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের একটি সীমিত তালিকা ঊনবিংশ অধ্যায়ে রয়েছে বিধায় এখানে সংযোজন করা হল না এবং তাঁদের সাহিত্য কর্ম অবশ্য আমার এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ও নয়)।

লেখকের নাম (বর্ণমালা অনুযায়ী) পৃষ্ঠা

অ

অকিঞ্চন মিশ্র (চক্রবর্তী)-২১৩,

অক্ষয় কুমার কয়াল-২১৬,

অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী-৭৩,৭৪,

অনাথ ফকির-২৪৩, ২৪৪,

ডঃ অমর নাথ লাহিড়ী-২৬৭,

অন্নদা শংকর রায়-১৯৮।

আ

আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়-২১৬,

আচার্য যদুনাথ সরকার-২১, ২৮, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ২১৫, ২১৬।

আজদেব-৪

অধ্যাপক আলী আহমদ-৯৩, ১৪৫,

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৮, ১০০, ১০৭, থেকে ১১১, ১১৫, ১৩২ থেকে ১৩৭, ১৪১, ১৪৭, ১৫৬, ১৬০, ১৯০,

আবু তালেব-১৪৭,

আবদুর রহমান খাঁ-২৯৪,

আলী রাজা-১৪১, ২১০,

আবদুল হাকিম-১৩৮, ২৯১,

ডঃ আবদুলকরিম-৯, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৯, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮০, ১৪৭, ১৫৭, ২৭৫, ২৭৬,

আবদুর করিম খোন্দকার-১৩৪,

আলাওল-১৬৩ থেকে ১৭৮,

আরিফ-২৩৭ থেকে ২৪২,

আনন্দরাম চক্রবর্তী-২০৮,

আবদুল হক চৌধুরী-১০২, ১৫৮, ১৫৯,

ডঃ আহমদ শরীফ-৫০, ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০।

ই

ই, জি, ব্রাউন-৭৯,

উ

উমাপতি ধর (সংস্কৃত)-৮,

এ

ডঃ এনামুল হক-৬৭, ৭০, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ১৩২, ১৩৩, ১৪৬, ১৪৭, ২৩৭, ২৭৫, ২৭৬,

এ, এস, বেবারীজ-৮, ৯,

ডঃ এ, বি, এম, হাবিবউল্লাহ-৪৫,

ডঃ এ, রহিম-৫৮, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮০, ২৮৪।

ক.

কঙ্কন-৪,

কবি কর্নপুর-২০৮,

কবি রামগঙ্গাবিশারদ-২০৮,

কবি কালীপদ দাস-২০৮,

কালী চরণ ভট্ট-১৪১,

কালী প্রসন্ন সিংহ-১৪৫, ১৮৩,

কবি কালিদাস-২০৮,

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী-১৩৩,

কবি হাজী মোহাম্মদ-১৩৩,

কবিবল্লভ রসিক মিশ্র-২০৮,

www.pathagar.com

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন- ২৫২,
কবীন্দ্র চক্রবর্তী-২৪৬, ২৫
কবি চন্দ্রপতি-২০৮,
কবিরত্ন নিধিরাম আচার্য-২৫
কৃষ্ণরাম দাস-২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ও ২৩০।
কৃষ্ণানন্দ-২০৮,
কৃষ্ণদাস পন্ডিত-১৯২,
কাশীনাথ সেন-২০৮,
কৃষ্ণদাস-১৪৩, ১৮০,
কৃষ্ণদাস ভট্ট-১৪১,
কাশীরাম দাস-১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ২৮৫।
কাশী বিলাস বন্দোপাধ্যায়-১৯৩,
কেতকা দাস (ক্ষেমানন্দ নন) ২০৩,
কানা হরি দত্ত-২০২,
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস-৪৪, ৪২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮,
কৃত্তিবাস ওঝা-১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪,
কৈলাস চন্দ্র সিংহ-২৫৮, ২৫৯,
কৃষ্ণদাস কবিরাজ-৭১,৭২,৭৫,
কাহ্ন-৪
কাজী রুকন উদ্দিন সমরকন্দী (ফার্সী)-৭৭,
কৃষ্ণ কান্ত-১৯৪,
কোরেশী মাগন ঠাকুর-১৭৬,
কৃষ্ণ হরি দাস-২৩৫,২৩৬,
খ
খেলারাম-২১৪, ২১৫,
ক্ষেমানন্দ (কেতকাদাস নন)-১৮১, ২০৪, ২০৫, ২০৮,
ক্ষীণ দেবী দাস-১৪১,
খাদেমুল ইসলাম বঙ্গবাসী-২৯৩,
খগেন্দ্রনাথ মিত্র- ২৭৮

www.pathagar.com

গ

গদাধর দাস-১৪১, ১৮০, ১৮১, ১৮৮,

গঙ্গারাম দাস-১৪১, ২১০,

গুরুদাস গুপ্ত-১৪১,

গোপাল হালদার-১, ১৮, ৩৭, ৫৯, ৬৯, ৮৩, ৮৬, ৯১, [illegible], ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৭, ২০৯, ২১৩, ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৫২, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৯১, ২৯৪।

গুণানন্দ খান-২০৮,

গরীবুল্লাহ-১৪৪, ১৪৫,

গঙ্গাদাস সেন-২০৮,

গোরক্ষ নাথ-২১৭, ২১৮,

গুণাকর রূপ নারায়ন-২০৮,

গঙ্গাধর সেন-১৮৩,

গোবিন্দ দাস-২৫৬,

গৌরিশংকর ভট্টাচার্য-১৮৩, ১৮৪,

গৌরিনাথ শাস্ত্রী-৫৩, ৫৪, ৫৫,

ঘ

ঘনরাম চক্রবর্তী-২১৯,

চ

চন্দ্রাবতী (চক্রবর্তী)-১৯১, ১৯২, ১৯৩,

চন্দ্র শংকর চক্রবর্তী-১৯২,

চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-৯, ১০,

চার্লেস রিউ-৬৫,

চম্পা গাজী-১৩৪,

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-২৫৫,

জ

জয়নন্দী-৪,

জয়দেব (সংস্কৃত)-৮,

জগন্নাথ বৈদ্য-২০৮,

জমির আহমেদ-১১৮,

www.pathagar.com

জেনুদ্দিন-১৪০, ২১০,
জগৎজীবন ঘোষাল-২০৮,
জিতরাম-১৮১, ১৮৪,
জয়ানন্দ-১৮৯,
জীনকৃষ্ণ মৈত্রেয়-২০৮,
জগৎরাম রায়-১৯৩,
জিয়া-উদ-দীন বরনী-২০,
জয়নারায়ন সেন-২১৩,
ত
তনুরাম ভট্ট-১৪১,
তুলসী দাস-১৯৮,
তাড়ক-৪,
তসদ্দক আহমদ-২৯২, ২৯৪,
দ
দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ-৬, ৮, ৩৫, ৩৯।
দেবী দাস শর্মা- ১৪২, ২১০।
দক্ষিণা রঞ্জন মজুমদার-২০২।
দীন ভবানন্দ-২০৮,
দৌলৎ কাজী- ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩,
দীন দয়াল দাস-১৪১, ২১০,
দীন বন্ধু মিত্র- ২৪৩,
দুর্গামনি উজির- ২৬৮,
দুর্লভেন্দ্র চোন্তাই-২৬৩,
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন- ৬, ১০, ১৩, ২৪, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪।
অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য- ২৬৬,
দ্বিজ কবি চন্দ্র-২০৮
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র-১৪২,
দ্বিজ রামদেব-১৪২, ২১০,
দ্বিজ বলরাম-২০৮,

www.pathagar.com

দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ-১৪১, ২১০,
দ্বিজ রঘুনাথ-১৪২,
দ্বিজ জয়রায়-২০৮,
দ্বিজ রতিদেব-১৪৩, ২১০,
দ্বিজ রামচন্দ্র-১৪১,
দ্বিজ গোপীদাশগুপ্ত-২০৮,
দ্বিজ শ্রীলক্ষণ- ১৯১,
দ্বিজ সীতাসূত-১৯৩,
দ্বিজ ত্রিলোচন-২০৮,
দ্বিজ হরিরাম-২১৩,
দ্বিজ মাধব-২১৩,
দ্বিজ শ্রীধর-৬৬, ৬৭,
দ্বিজ কমললোচন-২১৩,
দ্বিজ জনার্দন-২১৩,
ন
নরোত্তম কেরানী-১৪১, ২১০,
নিধিরাম আচার্য-১৪৩, ২১০,
নিত্যপদ বৈদ্য-১৪৩,
নসরুল্লাহ খোন্দকার-১৪৮, ১৪৯, ১৫০,১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭,
নন্দরাম দাস-১৮০, ১৮১, ১৮২,
নিত্যানন্দ আচার্য-১৮৯,
নগেন্দ্র নাথ বসু-২১৫, ২৭৩,
নিধিরাম চক্রবর্তী-২১৫,
নবরাজ মজলিস-১৫৮, ১৫৯,
নারায়ন পন্ডিত-২১৯,
নিজামুদ্দিন আহমদ বখশী --৯,
ডঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী-২০, ২১৬,
প
পেতাগাজী (হাসান আলী)-১৩৭,
ডঃ পঞ্চানন মন্ডল-২১২, ২১৫,
প্রাণরাম চক্রবর্তী কবিবল্লভ-২০৮,

www.pathagar.com

প্রমথ চৌধুরী-২৫৬,
পুন্ডরিক বিদ্যানিধি-১৪৪,
পীতাম্বর দাস-৫১,
ফ
ফকির রাম কবিরাজ-
ফরষ্টার-২৯৪
ফৈজুল্লা-২৩৭, ২৩৮,
ব
বাবর-৮, ৯,
বিষ্ণু পাল-২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮,
বাহরাম খান-১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৭৬,
বৈদ্য হরিদাশ-২০৮,
বড়ু চন্ডীদাস -৫, ৬, ৭,
ব্রজলাল সেন-১৪২,
বর্ধমান দাস-২০৮,
বিজয়ানন্দ-১৮৯,
বংশীদাস চক্রবর্তী- ১৯০, ১৯৩, ২০৮,
বিপ্রজানকী নাথ-২০৮,
বিজয় গুপ্ত-৪৪, ১৪৩,
বিশ্বনাথ-২০৮,
বিপ্রদাস-৩৮, ৩৯, ৪০, ২৮৯,
বিশ্বাস নারায়ণ-২৫৮,
বিদ্যাপতি (মিথিলার কবি)-২৩৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০,
বসন্ত রঞ্জণ বিদ্বদ্বল্লভ-৫, ৬, ৭,
বসন্ত রঞ্জণ রায়-২০৪,
বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়-২১৫,
বাসুদেব দত্ত-১৪৪,
বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর-২৫৫,
বৃন্দাবন দাস-৭৩, ৭৪, ৭৫,
বিমান বিহারী মজুমদার-২৭৮

www.pathagar.com

বানেশ্বর-২৬৩, ২৬৪,
বৈদ্য ভানুদাস-২০৮,
ভ
ভুসুকু-৪, ৫,
ভক্তরাম দাস-১৪১,
ভবানী শঙ্কর দাস-১৪২,
ভারতচন্দ্র (রায়গুনাকর)- ২৫২, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫।
ভবানী নাথ-১৯১,
ম
মানিক দত্ত-২১১,
মির্জা নাথান-১২১,
মাধব আচার্য-২১১,
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী-২১১, ২১২, ২১৩, ২৫২,
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী-২৯৪,
ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ-১২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৬৫, ২০০, ২৯১, ২৯২, ২৯৪,
মধু সুদন দৈ- (দৈবক)-১৪৪,
মধুসুদন-২০৮,
মুহাম্মদ কবির-১৪৫, ১৪৬,
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই-১০০,
অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার-৬৬,
ময়ুর ভট্ট-২১৩, ২১৪,
মুক্তারাম সেন-১৪২, ২১০, ২১৩,
মানিক গাঙ্গুলী-২১৯,
মুহাম্মদ হেয়াৎ-২৩০, ২৩১,
মোহাম্মদ খান-১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৭৭,
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী- ২৯৩, ২৯৪,
মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী- ১৪৬, ১৪৭,
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম- ২৯৫,
মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)- ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৮৯,
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী- ২৯৩, ২৯৪,

www.pathagar.com

মর্দন- ১৪১, ২১০,
মুকুন্দ দত্ত-১৪৪,
মোহাম্মদ রাজা-১৪০,
মঙ্গল চাঁদ-১৩২,
মুহাম্মদ মুকিম-১৩৪, ১৩৫, ১৩৬,
মোহাম্মদ আলী- ১৩৬,
মুরারী মিশ্র-২০৮,
য
যশোরাজ খান-৫১,
যদুনাথ- ২১৫,
র
রাম দেব-২১৩,
রামদাস আদক-২১৯,
রামতনু ভট্টাচার্য-২১০,
রামেশ্বর ভট্টাচার্য-২৩৭,
রাধাকান্ত মিশ্র-২৪৬, ২৫২,
রাজ শেখর সুরী (জৈন কবি)-২৪৭,
রাম নারায়ন দেব-২৪৭,
রামই পণ্ডিত- ৯, ১০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪,
রাম প্রাসাদ-১৯৩, ১৯৪, ১৯৫,
রামতনু আচার্য-১৪১,
রামজীবন বিদ্যাভূষণ-১৪২, ২০৮, ২১০,
রাধাচরণ রক্ষিত-১৪৪, ২১০,
রমাকান্ত বসু-১৮২,
রাজেন্দ্র দাস-১৮৩,
রামশংকর দত্ত-১৯০,
রতিদেব সেন-২০৮,
রামানন্দ যতি-১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫,
রামানন্দ ঘোষ-১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫,
রামেশ্বর নন্দী-২০৮,
রমাকান্ত দাস (বসু)-১৮৩,

www.pathagar.com

রাম দেব-২১৩,
রূপরাম চক্রবর্তী- ২১৫, ২১৬, ২১৭,
ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার-২৭,২৬৭।
রশীদ আল ফারুকী-২৯৫,
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর-২, ২৫৬,
ল
লুই-৪,
শ
শিব নারায়ণ-১৪২,
শ্রীধর বানিয়া-১৪১, ১৪৩,
শ্রী রামবিনোদ-১৪৪, ২০৮,
শেখ জাহিদ-১৪৬, ১৪৭, ১৪৮,
শাহ মোহাম্মদ সগীর-৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ ও ১৭৬,
শামসের আলী-১৭৬,
শিবরাম ঘোষ-১৮২, ১৮৩,
শেখ পরাণ-১৩২,
শিবদাস ভট্টাচার্য-১৯৪, ১৯৫,
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-১৯৮,
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যয়-১৯৭, ১৯৮,
শেখ মহদ্দি-২৬৮,
শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী-২৯২, ২৯৩,
শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র-৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০,
শেখ কুৎবন- (অধবী ভাষার কবি)-৬৩, ৬৪, ৬৫,
শ্রীকর নন্দী-৬০, ৬১, ৬২,
ডঃ শিবনাথ-৬৩,
শুক্রেশ্বর-২৬৩, ২৬৪,
শিবানন্দ-১৮৯,
শ্রী কবিবল্লভ-২৩৪, ২৩৫, ২৩৬,
শ্রী জিনবিজয়ী-২৫৩,
শাহ মোহাম্মদ শফী-১৩২, ১৩৩,
শেখ মুতালিব-১৩৩,

www.pathagar.com

শেখ মনসুর-১৩৪,

শরীফ শাহ-১৩৪,

শেররাজ চৌধুরী-১৩৬, ১৩৭,

শেখ মনোহর-১৩৭, ১৩৮,

শেখ চাঁদ-১৩৮,

শেখ সাদী-১৩৮,

ষ

ষষ্ঠিবর-১৮৩,

ষষ্ঠিবর দত্ত (সেন)-২০৮,

স

ডঃ সুকুমার সেন-৩, ৪, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৫২, ৬৪, ৬৯, ৭০, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ১০১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৯০, ১৯১, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২৫, ২২৯, ২৩০,২৩১, ২৩৬, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৮৮, ২৯৬, ২৯৮।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-৫

ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো-২০, ২১, ২৮, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬৭, ৮৪, ৩০০।

সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর-২২৯,

সিদ্ধান্ত স্বরস্বতী-২৬৮,

সৈয়দ এমদাদ আলী-২৯৪,

সৈয়দ হামজা-১৪৫,

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ১৪৫, ২১৫, ২১৬, ২৩৮, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৮, ২৮১, ২৮২, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১,

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী-২৯৪,

সীতারাম দাস-২১৮, ২১৯,

সুবোধ চন্দ্র মজুমদার-১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯।

সারবিদ খান-৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯,

www.pathagar.com

সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়-২৫৯,
সৈয়দ আলী আহসান-১০০, ১৪৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১।
এস, এম, আলী-১৫৪,
এস, এ, আশরাফ-৮০,
সৈয়দ মীর আলাওয়ী (ফার্সী)-৬৫,
সৈয়দ নাসির-১৩৬,
সৈয়দ সুলতান-৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১৩৮,
হ.
হরিপদ ভট্টাচার্য-১৯৮,
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-৪, ৫, ২৫২,
হারাধন দত্ত-২১৫, ২২৯,
হামিদুল্লাহ খান-২২১,
হামিদুল্লাহ-১৪০, ২১০,
হরিসুত নন্দলাল-২০৮,
হালহেড-২৯৪,
হেয়াৎ মাহমুদ-২৩০, ২৩১, ২৪৪,
হরিহর দত্ত-২০৮।

www.pathagar.com

প্রমাদ প্রসঙ্গে

মুদ্রণে, বিশেষ করে এই গ্রন্থে যে সব কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে বেশ কিছু বানান ভুল পরিদৃষ্ট হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় কাজী দৌলতকে সতীময়না রচনার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে'। এই লাইনটি ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরাধ, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫ এর ৩০৯ পৃষ্ঠায় ঠিক এরূপই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চৌপাইয়া' শব্দটি হবে 'ছোপাইয়া' এবং 'সাধনে' শব্দটি হবে 'সদনে'। একই বই এর ৩৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতার ত্রয়োদশ লাইনের শেষাংশে, যা বর্তমান বই এর ১৬২ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ লাইনের শেষাংশে উদ্ধৃত 'মতি ভোর তোর সাঞি' রয়েছে। 'সাঞি' শব্দটির পাঠ হবে আসলে 'ছাঞি'। এই বই এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় উপসংহারে কবি বলেন শীর্ষক কবিতার প্রথম লাইন হচ্ছে- 'যদি মোর কাব্যরসে সুখ লাগে মনে' রয়েছে। কিন্তু সুকুমার সেনের আলোচ্য গ্রন্থের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে 'যদি মোর কবি রসে সুখ লাগে মনে'। আসলে এ শব্দটি হবে 'কাব্যরস' কবি রস নয়।

এই ভুল মুদ্রণ প্রমাদ নয়। মূল লেখক কিংবা ডঃ সুকুমার সেনেরও নয়। লিপিকার এর কারণেই গ্রন্থে এই ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, প্রমাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের একটি বক্তব্য উল্লেখ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, বর্তমান গ্রন্থের প্রমাদগুলো মুদ্রণ প্রমাদ নয়। গোপাল হালদার তাঁর বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০ এর ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "………. যুগের পর যুগ গায়েনের মুখে মুখে কৃত্তিবাসের পাঁচালী কীর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া লিপিকাররাও নকল করার সময় যা কৃত্তিবাসে ছিল না, অন্য কবির এমন অনেক লেখা এই রামায়ণে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ….. পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার খৃঃ ১৮৩০-৩৪ এর সংস্করণে কৃত্তিবাসের পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে একেবারে নতুন করে দিলেন, লোকে তা পরম আনন্দে পাঠ করতে লাগল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলতে এই তর্কালংকারী ভাষাই এখন বাজারে চলছে। কৃত্তিবাসের মূলোদ্ধার এখন দুঃসাধ্য। ……"

বস্তুতঃ প্রমাদগুলো এ কারণে, ইচ্ছাকৃত নয়।

www.pathagar.com

এই লেখকের

প্রকাশের অপেক্ষায়

১। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা।
১ম খণ্ড তত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ড-প্রয়োগ।
২। বৃটিশ যুগে বাংলাদেশের সংবাদ ও সাময়িকপত্র।
(১৮৪৭-১৯৪৭)।
৩। চট্টগ্রামে সংবাদপত্রের ১২০ বছর।
(১৮৭৮-১৯৭১)।
৪। বাংলার মুক্তি সংগ্রাম।
(প্রথম খণ্ড, ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত)।
৫। রুনু ফিরে এসেছে মায়ের কোলে (সত্য ঘটনা ভিত্তিক উপন্যাস)।
৬। মরণোত্তর পদোন্নতি (গল্প সঙ্কলন)।
৭। স্মৃতিতে অমলিন একাত্তরের অবরুদ্ধ দিনগুলো।
৮। সেমিনার (বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ সঙ্কলন)।
৯। গণতন্ত্র (প্রবন্ধ সঙ্কলন)।
১০। ছড়া ও ছবিতে বর্ণমালা (বাংলা দুটি, ইংরেজী একটি)।

প্রকাশিত হয়েছে

১। জনসংযোগ ও সাংবাদিকতা, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা-চট্টগ্রাম।
২। বক্তৃতা শিক্ষা (Dale Carnegi এর How to Influence Man in Business এর অনুবাদ), আবসার ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।
৩। কার্ল মার্কস এর দেশে- ভ্রমণ কাহিনী- মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৭৫।
৪ বিশ্ব ইতিহাসে লেলিন- শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা-চট্টগ্রাম। ১৯৭০।

www.pathagar.com

কাজী জাফরুল ইসলাম

কাজী জাফরুল ইসলাম পেশায় সাংবাদিক। তিনি সাংবাদিকতা একটি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি বাংলা ভাষায় 'সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা' এবং 'জনসংযোগ' এর তত্ত্ব চর্চারও পথিকৃৎ। 'সাংবাদিকতা একটি বিজ্ঞান', শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধে তিনি তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপন করে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি যেমন সমাজ বিজ্ঞান, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতাও সমাজ বিজ্ঞান। অনুরূপভাবে তাঁর প্রকাশিত 'জনসংযোগ ও সাংবাদিকতা' বইতে তিনি জনসংযোগকেও সমাজবিজ্ঞান বলে প্রমাণ করেছেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা এবং জনসংযোগ বিষয়ক প্রবন্ধাদির সংগৃহীত কপি পাঠ করে কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ এই লেখাকে 'অবিসন্দর্ভ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর তত্ত্বমূলক বই 'সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা', পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হলেও 'Calcutta Institute of Journalism'এ পাঠ্যসূচিভূক্ত হয়েছে।

তিনি বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতীয় সংবাদপত্র শিল্পনীতি ঘোষণা এবং সংসদে আইন প্রণয়ন পূর্বক সে নীতি যথাযথ বাস্তবায়নের দাবীতে সোচ্চার। তিনি চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন, জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন খেলাঘর এর চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগরী শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে প্রায় ২০ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য।

তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে স্কুল ছাত্র হিসেবে অংশ নেন, ১৯৬৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে চট্টগ্রাম কলেজে চট্টগ্রামের প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন, ১৯৭০ এর নির্বাচনী আন্দোলন এবং মুক্তি যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

জনাব জাফরুল ইলসামের জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার উত্তর হাইতকান্দি গ্রামে। ১৯৫৮ সালে বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ কালে তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে ১৯৬২ সালের সূচনায় জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি এক পুত্র ও দু-কন্যার জনক।

তাঁর ৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরী রয়েছে।

জনাব জাফরুল ইসলাম পাকিস্তান, ইরাক, জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন।